সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য

সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য

অলোক রায়
সম্পাদিত

সা হি ত্য লো ক
৩২/৭ বি ড ন স্ট্রী ট । ক ল কা তা ৬

অতিলৌকিক উপাদান—দ্র. রোমান্স।

অপরাধমূলক উপন্যাস—দ্র. গোয়েন্দা কাহিনী।

অর্গানিক প্লট—দ্র. প্লট।

আখ্যায়িকা ও কথা : সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যরচনা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত। এক আখ্যায়িকা, অপর কথা। আখ্যায়িকা ছিল ঐতিহাসিক অথবা পুরাগত কাহিনী, আর কথা ছিল কল্পিত কাহিনী। আখ্যায়িকা বড় গল্প, কথা ছোট গল্প। ভামহ তাঁর 'কাব্যালঙ্কার'-এ কথা ও আখ্যায়িকার পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এভাবে—

প্রকৃতানুকূলশ্রব্যশব্দার্থপদবৃত্তিনা। / গদ্যেন যুক্তোদাত্তার্থা সোচ্ছ্বাসাখ্যায়িকা মতা॥
বৃত্তমাখ্যায়তে তস্যাং নায়কেন স্বচেষ্টিতম্। / বক্ত্রং চাপরবক্ত্রং চ কালে ভাব্যর্থশংসি চ॥
কবেরভিপ্রায়কৃতৈঃ কথনৈঃ কৈশ্চিদঙ্কিতা। / কন্যাহরণসংগ্রামবিপ্রলম্ভোদয়ান্বিতা॥
ন বক্ত্রাপরবক্ত্রাভ্যাং যুক্তা নোচ্ছ্বাসবত্যপি। / সংস্কৃতং সংস্কৃতাচেষ্টাপভ্রংশভাক্ তথা॥
অন্যৈঃ স্বচরিতং তস্যাং নায়কেন তু নোচ্যতে। / স্বগুণাবিষ্কৃতিং কুর্যাদভিজাতঃ কথং জনঃ॥

'আখ্যায়িকা' গদ্যে লেখা হবে, উচ্ছ্বাসে (অধ্যায়বিশেষ) বিভক্ত হবে, মাঝে মাঝে বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে লেখা শ্লোক থাকবে, নায়ক দ্বারা স্বীয় অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণিত হবে এবং তাতে কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিরহাদির বর্ণনা থাকবে। 'আখ্যায়িকা' সংস্কৃতে রচিত হবে। আর 'কথা'-তে এসব প্রযোজ্য নয়। এতে বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে লেখা শ্লোক থাকবে না, উচ্ছ্বাসেও বিভক্ত হবে না। নায়ক ভিন্ন অন্য কেউ এর বক্তা হবেন। সংস্কৃত বা অপভ্রংশে রচিত হতে পারে। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' যথাক্রমে 'আখ্যায়িকা' ও 'কথা'র দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনধর্মের অন্তর্গত সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত কথা-সাহিত্যে অমূল্য বৈভব সঞ্চিত আছে।

নরেশচন্দ্র জানা

আঞ্চলিক উপন্যাস : বাংলা সাহিত্যে সম্প্রতিকালে একটি বিশেষ শ্রেণীর উপন্যাস নানা লক্ষণ-স্বাতন্ত্র্যে আঞ্চলিক নামে অভিহিত হচ্ছে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রায় শেষদিকে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠির দেশ'-এ সাঁওতাল-কোল-মুণ্ডা প্রভৃতিদের ঐ দেশাঞ্চলের প্রভাব-পুষ্ট জীবনযাত্রার

পরিচয়ে প্রথম এই ধারার স্থচনা। তারপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, স্থবোধ ঘোষ, সমরেশ বস্থ, প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের কিছু কিছু উপন্যাস আঞ্চলিকতার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে বিশিষ্টতালাভ করেছে। অবশ্য বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কিছু পরে ষাটের দশক থেকেই এই বিশেষ ধরনের উপন্যাসকে 'আঞ্চলিক' নামে অভিহিত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে এবং এর সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণের প্রচেষ্টা সেই থেকে সমালোচক-মহলে চলছে। পাশ্চাত্যেও যে এই জাতের উপন্যাস রচিত না হয়েছে, এমন নয়। সেখানে উপন্যাসের নানা প্রকারের মধ্যে 'Novel of the local color' বা 'Novel of the soil'-এর কথা পাই। এই শ্রেণীটিকেই 'Regional Novel' (আঞ্চলিক উপন্যাস) নামে কেউ কেউ আখ্যাত করেছেন। অঞ্চল-বিশেষের রঙে রঞ্জিত বা বিশেষ অঞ্চলের মৃত্তিকার সঙ্গে আত্মিক যোগে যুক্ত মানব-জীবনের কাহিনী-সম্বলিত এই ধরনের উপন্যাস সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে যে এই শ্রেণীর পূর্ববর্তী উপন্যাসে প্রেক্ষাপটের স্থান ছিল পশ্চাতে। কিন্তু ন্যাচারালিজম্ বা অতিবাস্তববাদের প্রবল প্রভাবে ঐ পটভূমিকা স্থানলাভ করেছে উপন্যাসের একেবারে সম্মুখভাগে। আর উপন্যাসের চরিত্রগুলি সম্মুখস্থিত ঐ প্রতিবেশেরই হয়ে উঠেছে সন্তান-সন্ততি (…"the characters themselves are viewed as the creatures of their environment")। এখানে যে প্রতিবেশ স্থান পায়, তা মনুষ্যসৃষ্ট অর্থনৈতিক নিয়মকানুনের ফল নয়, এ পরিমণ্ডল সভ্য-মানুষ-অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে কিছু দূরবর্তী শুষ্ক, অনুর্বর অথবা জীবিকার পক্ষে অতিশয় কষ্টসাধ্য আদিম জনগোষ্ঠীর অঞ্চল।

'আঞ্চলিক উপন্যাস' নামেই বোঝা যায়, এ হল কোন অঞ্চলবিশেষের মানব-জীবনাশ্রয়ী এক বিশিষ্ট স্বাদের উপন্যাস। ঐ অঞ্চলের সর্বাত্মক প্রভাবে সেখানকার মানব-জীবনও বিশিষ্ট। সেই অঞ্চলের বিশিষ্ট ভূ-সংস্থান, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মৃত্তিকা—সেখানকার অধিবাসীদের জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই সে-অঞ্চলের মানুষের দৈহিক গঠন, ভাষার উচ্চারণ, কথা বলার ভঙ্গি, জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, আশা-বিশ্বাস-সংস্কার, বাংলা-ভাষাভাষী অন্যান্য অঞ্চলের মানুষদের থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। বিশেষ করে ঐ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর গোষ্ঠীবদ্ধ কৌম-সমাজে ঐ প্রভাব যতখানি

আত্মিক হয়, সেই অঞ্চলে বসবাসকারী শিষ্টজনের মধ্যে ততখানি অন্তরঙ্গ হয় না। ঐ অঞ্চল যদি পর্বতসংকুল, নদী-প্রধান, রুক্ষ-শুষ্ক-অনুর্বর হয়, তাহলে সেখানকার মানুষদের মধ্যে কষ্টসহিষ্ণুতা, শ্রম-দক্ষতা এবং দুঃসাহস অধিকমাত্রায় দেখা যায়। একই অঞ্চলের শিষ্টজনেরা সভ্যমানুষদের সংস্পর্শে কিংবা নিজ নিজ পারিবারিক সুসংস্কৃত ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল আনুগত্যে। পুরোপুরি ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাঁদের ঐ সর্বাত্মক প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত রাখে। তাই নিম্নশ্রেণীর গোষ্ঠীচেতনামুখ্য মানব-সমাজেই আঞ্চলিকতার লক্ষণ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়। ইংরেজি সাহিত্যে এমিলি ব্রন্টের 'উদারিং হাইটস' এবং হার্ডির বেশ কিছু উপন্যাস আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সার্থক। হার্ডির ওয়েসেক্স উপন্যাসগুলিতে অর্থাৎ *Under the Greenwood Tree*, *Far From the Madding Crowd*, *The Return of the Native* প্রভৃতিতে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে গোষ্ঠীচেতনার সূত্রে কেমন রহস্যময়। জনহীন প্রান্তর ও স্তব্ধ বনভূমির প্রতি এখানকার মানুষের কী আশ্চর্য আকর্ষণ! অদৃশ্য দৈব প্রভাবে মানুষের জীবনের ছন্দ এখানে স্থিরীকৃত। পাহাড়ের মতোই এখানকার মানুষ যেন অচল, প্রান্তরের মতোই চেতনাহীন।

তাই সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। তথাপি একটা সংজ্ঞা না দিলেও চলে না। এর সংজ্ঞা এবং মূল কতকগুলি লক্ষণ এইভাবে সূত্রাকারে নির্দেশ করা যায়। কোন ঔপন্যাসিক যখন কোন বিশেষ দেশাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সমাজ-প্রেক্ষিত ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে এমনভাবে তাঁর রচনায় রূপ দেন যাতে ঐ অঞ্চল যেন সেখানকার মানুষদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মিক যোগে একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে ওঠে এবং সেখানকার জনজীবনে তার সর্বাত্মক প্রভাবের মধ্য দিয়েও সর্বজনীন রসাবেদনে পৌঁছায়—তখনই তাঁর রচনাকে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' বলা যেতে পারে। সূত্রাকারে এর লক্ষণগুলি এইরূপ : ১. এই উপন্যাস বিশেষ একটি স্বাতন্ত্র্যযুক্ত ভূখণ্ডকে মুখ্যরূপে আশ্রয় করবে। ২. এই ভূখণ্ড ঐ অঞ্চলের বিশেষ একটি সম্প্রদায় বা জনজীবনে সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে তার বৈশিষ্ট্য ও রঙে তাদের অনুরঞ্জিত করবে। ৩. এই ভূখণ্ড ঐ জনজীবনের সঙ্গে আত্মিক যোগে যুক্ত হয়েও একটি স্বতন্ত্র চরিত্ররূপে দেখা দেবে। ৪. ঐ জনসমাজ গোষ্ঠীবদ্ধ, শিক্ষাদীক্ষা-

বর্জিত, সরল, নানারূপ অপ্রাকৃত সংস্কারে বিশ্বাসী ও নিম্নশ্রেণীর হবে। ৫. ঐ অঞ্চল উপন্যাস থেকে বর্জিত হলে এর আঞ্চলিক আখ্যা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হবে। ৬. এখানকার জনসমাজের সকল ক্রিয়াকর্ম, ধ্যান-ধারণা, আশা-বিশ্বাসের মধ্যেও অঞ্চল-বিশেষের নিগূঢ় প্রভাব ক্রিয়াশীল থাকবে। ৭ এরা বাংলা ভাষা-ভাষী হলেও ঐ ভূ-প্রকৃতির জলবায়ুর প্রভাবে এদের বাক্‌যন্ত্র বিশিষ্টতা লাভ করায় এদের ভাষায় এবং শব্দের উচ্চারণে স্বাতন্ত্র্য থাকবে। ৮. আঞ্চলিকতার সমস্ত লক্ষণ বহন করেও এবং অঞ্চলবিশেষের অভিনব স্বাদ পরিবেষণ করেও এই উপন্যাস একটি সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করবে। ঐ জনগোষ্ঠীর সমস্ত বাহ্য-আচরণ-অনুষ্ঠান, সমস্ত বিশ্বাস-সংস্কার ও জীবনযাত্রার ভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের জীবনকাহিনী সহৃদয়-সামাজিকের চিত্তকে নাড়া দেবে। তাদের কান্না ও প্রেম, জীবনযুদ্ধে তাদের সৈনিকব্রত, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ভাষা-ভঙ্গি ভিন্ন হলেও জীবনের মৌল বৃত্তিরই তা বিচিত্র প্রকাশ। আর এই কারণেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতা সম্ভব। সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ ইত্যাদি বিভিন্ন রস স্বাদবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েও যেমন পরিণামে সেই একই অখণ্ড ও অবিভাজ্য রসেরই অন্তর্গত, তেমনি ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক, আঞ্চলিক প্রভৃতি উপন্যাসও শেষ পর্যন্ত সেই রস বা আত্মচৈতন্য-আস্বাদনেরই রকমফের মাত্র। ৯. আঞ্চলিক উপন্যাস যিনি রচনা করবেন তাঁকে সেই অঞ্চল সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অবহিত হতে হবে এবং সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে যদি তিনি মেলামেশার সুযোগ পান, তবেই তাঁর উপন্যাস সার্থকতালাভ করবে। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাও যদি এইরূপ হন, তাহলে রসাবেদন যে আরো গভীর হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই।

আঞ্চলিক উপন্যাসের ঐ সংজ্ঞা ও লক্ষণগুলিকে যদি কতকটা শিথিল-ভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে ডিকেন্স ও থ্যাকারের উপন্যাসে লণ্ডনের বস্তি ও অভিজাত সমাজের কথা, ব্রণ্টে-ভগিনীদ্বয়ের ইয়র্কশায়ারের প্রাকৃতিক পরিবেশে মানব-জীবনের কাহিনী, কনরাডের সমুদ্র-জীবন ও হার্ডির এগ্‌ডন হীথ অঞ্চলের জীবনকথা সংবলিত উপন্যাস আঞ্চলিক আখ্যা পেতে পারে। কিন্তু কঠোরভাবে প্রয়োগ করলে ব্রণ্টে ও হার্ডি ছাড়া অন্যদের অনেক উপন্যাসই সার্থক নয়।

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শৈলজানন্দ এই ধারাটির সূচনা করলেও তাঁর

'কয়লাকুঠির দেশ' ঠিক সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। প্রকৃতি এখানে প্রেক্ষাপটে থেকেও চরিত্রগুলির উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি এবং স্বয়ং একটি চরিত্র হয়েও দেখা দেয়নি। এদিক থেকে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বীরভূমের একটি অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রকৃতি উপন্যাস-বর্ণিত নিম্নশ্রেণীর কাহারদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। ব্যক্তি-বিশেষের নয়, হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণের এক সমাজের সংস্কৃতির কথাই এখানে মুখ্য। এখানকার সকল অধিবাসীই এক অদৃশ্য দৈবশক্তির হাতের পুতুল মাত্র। বনোয়ারি করালী সুচঁাদ পাখী নসুবালা কালাবৌ পরম প্রভৃতি চরিত্রকে নিয়ে আকাশচারী কালারুদ্র ও কর্তাবাবা যদৃচ্ছ খেলা করেছেন, আর ঐ বিশিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতির প্রতীক চরিত্র হয়ে উঠেছে তারা। প্রেক্ষাপট ও জনগোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ যোগে উপন্যাসটি সার্থক। এতে একদিকে বনোয়ারির মধ্য দিয়ে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর জীবনাদর্শ এবং অন্যদিকে করালীর মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগ-প্রবৃত্তি উঁকি দিয়েছে। বীরভূমের রূঢ় রুক্ষ প্রান্তর, ময়ূরাক্ষীর হড়পা বান, আখড়াই-এর দীঘির অন্ধকার, গৈরিক মৃত্তিকা, ছাতিফাটার মাঠ—প্রভৃতির কথা তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে থাকলেও সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের দাবি বহু উপন্যাসেরই নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী' ও 'সোমলতা', অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (চারটি খণ্ড), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' ও 'কেয়াপাতার নৌকা' (দুই খণ্ড), সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া' প্রভৃতি কতকটা ব্যাপক অর্থে আঞ্চলিক উপন্যাস। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে সেখানকার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ঐ নদীরই প্রভাবে। নদীর অস্থিরতা ও বেগ ঐ সম্প্রদায়ের জীবনে যাযাবরত্ব ও গতি এনে দিয়েছে। তথাপি এখানে গোষ্ঠী-চেতনা প্রবল হতে পারেনি। হোসেন মিঞার কুতুবদিয়া দ্বীপের মায়াময় আকর্ষণ এখানকার অধিবাসীদের আর এক রাজ্যে আহ্বান করেছে। বীরভূম-মুর্শিদাবাদের ময়ূরাক্ষী নদীলালিত অঞ্চলের প্রকৃতির সঙ্গে সরোজকুমারের উপন্যাস তিনটির বৈষ্ণব পাত্রপাত্রীর নিবিড় সংযোগ। বিনোদিনী ও হারানের জীবন ঐ প্রকৃতির জীবনছন্দে একই সুরে বাঁধা। কুমিল্লা জেলার তিতাস নামে এক অখ্যাত নদীতীরের বাসিন্দা মালোদের জীবনকথা চারখণ্ডে সমাপ্ত 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ চিত্রিত। অবশ্য এদের জীবনের উপর নদীর প্রভাব আত্মিক

নয়। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনের সঙ্গে গঙ্গার আবর্ত ও জোয়ার-ভাঁটার টানের অনিশ্চয়তা ও বিপদের যোগ আছে। বিহারের মানভূম অঞ্চলের আদিম নরগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বিস্তারিত পরিচয়বহ উপন্যাস সুবোধ ঘোষের 'শতকিয়া'। মানভূমের ভূপ্রকৃতি—মধুকুপির মূক প্রকৃতি কাহিনীর প্রধান চরিত্র দাশু ঘরামির জীবনকে শতপাকে বেষ্টন করেছে। একদিকে দাশুকে আশ্রয় করে ঐ অঞ্চল-প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তার স্ত্রীর পরপর দুই খ্রীষ্টধর্মী পুরুষকে বিবাহের মধ্য দিয়ে সে শুনতে পেয়েছে তার সযত্নলালিত সংস্কৃতির সর্বনাশ-সংকেত। তিনটি পর্বে সমাপ্ত সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'ও একখানি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। বিহারের তাৎমাটুলির, শিক্ষা-দীক্ষাহীন সরল গ্রাম-জীবনের ছবি এখানে অঙ্কিত। বিহারের এই অঞ্চল তার সকল বিশ্বাস-সংস্কার নিয়ে ঢোঁড়াই-এর চরিত্রকে গড়ে তুলেছে। অন্যান্য চরিত্রেও অঞ্চলের প্রভাব সর্বাত্মক। প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' এবং 'কেয়াপাতার নৌকা'য় যথাক্রমে নাগাভূমি অঞ্চল ও পূর্ববাংলার একটি বিশেষ অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন মানব-জীবনের চিত্র উপস্থাপিত। উপন্যাসের এই অভিনব ধারাটির গতি বর্তমানেও অব্যাহত।

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আত্মকথন রীতি : উপন্যাসের কাহিনী কে বলবেন—সর্বদর্শী লেখক না উপন্যাসের কোনো চরিত্র? কোন্ রীতিতে বলা হবে জীবনের নিগূঢ় রহস্যের দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের কথা—প্রথমপুরুষের বাচনে লেখক নিজেই বলে যাবেন, না উত্তমপুরুষের কথন-ভঙ্গি গ্রহণ করে উপন্যাসের চরিত্র বক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন? দৃষ্টিকোণের এই সমস্যা লেখককে যখনই ভাবিয়ে তুলেছে তখনই তিনি বহুপরিচিত ভঙ্গির পরিবর্তন করে নতুন রীতিতে পাঠককে কাহিনী শুনিয়েছেন। জীবনধর্মী উপন্যাসকে আরও বেশি পরিমাণে জীবনানুগ করে তোলার ইচ্ছা নিয়েই উপন্যাস-রচয়িতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের ব্যবহার করে থাকেন। সর্বজ্ঞ লেখকের প্রত্যক্ষ রীতি (direct method) পৃথিবীর অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের কাছে প্রিয়। এখানে লেখক নিজেই কাহিনী বর্ণনা করেন নিরাসক্তভাবে। আড়ালে থাকলেও তিনিই সর্বনিয়ন্তা, এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রথমপুরুষে ঘটনা বর্ণনার সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করে লেখক অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। তিনি নিজের পছন্দমতো ঘটনা, চরিত্র, উপ-

কাহিনীর দ্বারা জীবনের বিচিত্র গতিপ্রকৃতির স্বরূপ তুলে ধরতে পারেন। এ ছাড়া, আরও একটি রীতি উনবিংশ শতাব্দী থেকেই উপন্যাসে কম বেশি স্বীকৃতি লাভ করেছে—লেখক নিজে কাহিনী বর্ণনা না করে উপন্যাসের কোনো পাত্র-পাত্রীর মুখে উত্তমপুরুষের ব্যবহার করে থাকেন। ইংরেজিতে এই শ্রেণীর উপন্যাসকে First person novel বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। উপন্যাসের কথক-চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র বিশ্লেষিত হওয়ার স্বাদ স্বভাবতই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। এই দুটি পদ্ধতি ছাড়াও আর একভাবে লেখক কাহিনী শোনান। এক্ষেত্রে সাধারণত প্রামাণ্য তথ্য, ডায়েরি, পত্র ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রামাণিক বা ডক্যুমেণ্টারি রীতির প্রয়োগ উপন্যাসের বাস্তব সচেতন ভূমিকার সমর্থনেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ডায়েরি বা আত্মকথার সাহায্যে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর উত্তমপুরুষের বাচনকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে কথক-চরিত্র শ্রীবিলাস শচীশের ডায়েরির সাহায্য নিয়েছে। স্বভাবতই এখানে মিশ্র রীতির ব্যবহার ঘটেছে মূল বক্তব্যের প্রতীতি জাগাবার প্রয়োজনে।

উপন্যাস যেহেতু গভীর জীবনবোধের সার্থক শিল্পরূপ তাই একই লেখককে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। 'গোরা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নিজেই উপন্যাসের বক্তা বা ন্যারেটর। প্রথমপুরুষে, সংলাপ, বর্ণনা, বিশ্লেষণ ইত্যাদির সাহায্যে কাহিনী, ঘটনা, চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু সেই রীতি গ্রহণ করে তৃপ্ত থাকতে পারেননি বলেই 'চতুরঙ্গ'র সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনাধর্মী অবয়বের কথকরূপে শ্রীবিলাসের মতো একটি নিরপেক্ষ সাধারণ চরিত্রকে বেছে নিয়ে আত্মকথনমূলক রীতিতে সমগ্র কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য উপন্যাসে হেনরি জেম্‌সও শুধু লেখকের সর্বদর্শী ভূমিকায় নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। তিনি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে উত্তমপুরুষের কথনরীতিকে সমর্থন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আগেই বাংলা উপন্যাসে আত্মকথনরীতির প্রয়োগ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ইন্দিরা' (১৮৭৩, ১৮৯৩) উপন্যাসে। 'ইন্দিরা' উপন্যাসে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সরিয়ে রেখে ইন্দিরার জবানীতে লঘু সরসভঙ্গিতে কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসে বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর মুখে বহুকৌণিক দৃষ্টিকোণের ব্যবহারও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

আত্মকথনমূলক রীতিতে লেখা উপন্যাসে স্বয়ং লেখক নিজে উপন্যাসের চরিত্র রূপে উপস্থিত হয়ে কাহিনী বর্ণনা করে থাকেন। এই চরিত্রটি কেন্দ্রীয় বা নায়ক চরিত্রও হতে পারে। সাধারণত ভ্রমণমূলক উপন্যাসে 'আমি' রূপে লেখক চারপাশের দেখা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, ভ্রমণবৃত্তান্তের সঙ্গে গড়ে ওঠা জীবনদর্শন বর্ণনা করে থাকেন। এখানে বক্তার ভূমিকা পর্যবেক্ষকের। অনুভূতি-প্রখর মন ও কৌতূহলী দৃষ্টির প্রকাশ সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। কালকূটের এবং নবনীতা দেবসেনের ভ্রমণমূলক উপন্যাসে এক নিরাসক্ত 'পথিক আমি'র চলমান জীবনের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে লেখক উত্তমপুরুষের কথনরীতির প্রয়োগ ঘটাবার সার্থক সুযোগ পান অনেক বেশি পরিমাণে। মোপাসাঁর অনেক ছোটগল্পই এই রীতিতে লেখা। রবীন্দ্রনাথও অসংখ্য ছোটগল্পে উত্তমপুরুষের দৃষ্টি-কোণ ব্যবহার করেছেন। প্রমথ চৌধুরীও একইভাবে নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে কথক-লেখকরূপে গল্প শুনিয়েছেন।

এই রীতিতে অনেকসময় বক্তা-চরিত্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ ক'রে তার নিজের জীবনকাহিনী বর্ণনা করে। কথক চরিত্রই সেখানে নায়ক। তাকে কেন্দ্র করে, বা তার জীবনের অনুষঙ্গে অসংখ্য ঘটনা ও চরিত্রের উপস্থিতি ঘটে থাকে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যক, সন্তোষকুমার ঘোষের শেষ নমস্কার ও শ্রীচরণেষু মাকে প্রভৃতি উপন্যাসের নায়ক জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষীরূপে উপস্থিত হয়ে আত্মকথন রীতিতে সেগুলি বিবৃত করেছে। এই ধরনের রচনায় অনেকে আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাসের লক্ষণ দেখতে পান। আসলে লেখক কথক-চরিত্রের মাধ্যমে নিজের জীবনের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও ভাবনার সমাবেশ ঘটিয়ে থাকেন। তাছাড়া আন্তরিকতার নিবিড় স্পর্শও আত্মজৈবনিক স্বাদুতা আনে। 'আমি' চরিত্রের আত্মমগ্ন সূক্ষ্ম অনুভূতিময়তা পাঠককে প্রথম থেকেই অভিভূত করে রাখে। তবে 'আমি'র প্রতি লেখকের সচেতন দুর্বলতা ভ্রমণমূলক উপন্যাসে যে পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়, এখানে তার সম্ভাবনা কম। ভ্রমণমূলক উপন্যাসে দ্রষ্টা ও কথক 'আমি'র সঙ্গে উপন্যাসের অন্য চরিত্রের স্বভাব-দূরত্ব লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত ভ্রমণমূলক রচনায় 'আমি' চরিত্রের কোনো দ্বান্দ্বিক বিবর্তন নেই বললেই চলে। কিন্তু 'শ্রীকান্ত' বা 'আরণ্যকে' ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ কথা হয়ে থাকেনি।

তা লেখকের ও কথকের আত্মকাহিনীর অংশবিশেষ মাত্র। শ্রীকান্ত নিজেকে যতটা পেরেছে আড়াল করে রেখে অন্য চরিত্রগুলিকে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। বক্তার আন্তরিক সাহচর্যে উপন্যাসের অন্য চরিত্রগুলির ভালোমন্দ দিক বেশি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। তবে 'আমি'র দ্বারা বর্ণিত কাহিনীতে একধরনের শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ কথক অন্য চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে কিছুটা সীমাবদ্ধ মনোভঙ্গি ব্যক্ত করতে বাধ্য। তার নিজের বিশ্লেষণীভঙ্গি দিয়েই অন্য চরিত্রের কার্যবিধি, মানসিকতা, কার্যকারণ জনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে থাকে। উত্তমপুরুষের বর্ণনার ফলে কাহিনীর বাস্তবতা সৃষ্টিতেও সীমাবদ্ধতা ঘটবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ কথক চরিত্র শুধু তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবার সুযোগ পায়। যা সে প্রত্যক্ষ করেনি, সে কথা বলতে গেলে তাকে অন্যের স্মৃতিচারণা, ডায়েরি বা পত্র ইত্যাদির সাহায্যে প্রত্যক্ষতার স্বাদ আনতে হবে।

আত্মকথনমূলক রীতিতে লেখা আর এক শ্রেণীর উপন্যাসে এমন একটি চরিত্রকে কথক নির্বাচিত করা হয়, যে উপন্যাসে মূল ঘটনার কেন্দ্রে অবস্থিত নয়, শুধুমাত্র ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী-চরিত্র। বলা বাহুল্য, সে নিজের কথা বলে না। নিজেকে যতটা পারে কেন্দ্রীয় সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে প্রধান বা নায়ক-নায়িকা চরিত্রের জীবনবৃত্ত বর্ণনা করে। এই রীতিতে কথক চরিত্র মূল চরিত্র-গুলির বহির্ঘটনাসঞ্জাত দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গতিবিধি নিজের মতো করে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে। তার পক্ষে চরিত্রের অন্তরের 'গোপন আমি'র নিগূঢ় রহস্যের উদ্‌ঘাটন ও বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বাইরে থেকে অপর একটি চরিত্রকে নিজের অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস দিয়ে যতটা দেখা যায় ততটাই কথক চরিত্র বর্ণনা করতে পারে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে কথক শ্রীবিলাস তার আত্মকথনে নিরপেক্ষভাব বজায় রেখে শচীশ-দামিনী সম্পর্কের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে—'এই নাট্যের মুখপাত্র যে দুটি তাদের অভিনয় আগাগোড়াই আত্মগত—আমি আছি প্রকাশ্যে তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ।' অবশ্য 'চতুরঙ্গ'র প্রথম অংশে শ্রীবিলাস পাঠকের সমতলে নেমে এসে নিরপেক্ষ-কথক ভঙ্গিতে শচীশের জীবনকে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি দিয়ে বিবৃত করেছে। শেষ অংশে কিন্তু সে মূল স্রোতের থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেনি। কাহিনীবৃত্তে তারও একটা ভূমিকা দেখা গিয়েছে। শচীশ ও দামিনী, বিশেষত দামিনীর সঙ্গে নিজেকে

জড়িয়ে ফেলে দামিনীর দৃষ্টিতে সেও 'অসাধারণ' 'আমি'তে পরিণত হয়েছে। যে ঘটনা তার সামনে ঘটেনি তার বর্ণনাও শ্রীবিলাস দিয়েছে। ঝড়ের উন্মাদনাদৃশ্যে শচীশের অন্তরের আলোড়ন শ্রীবিলাস প্রত্যক্ষ করেনি। শচীশের সেই চিত্তচাঞ্চল্যের পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে দামিনীর উপর নির্ভর করতে হয়েছে: 'আমি দামিনীর কাছে, আগাগোড়া সকল কথা শুনিয়াছি, কিন্তু সেদিন কিছুই জানিতাম না'। এ ছাড়া, শচীশের ডায়েরি তাকে ব্যবহার করতে হয়েছে। 'চতুরঙ্গে' শ্রীবিলাস স্মৃতিকথনে সর্বজ্ঞ লেখকের মতো অবজেকটিভ ভঙ্গি বা নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করতে চেয়েছে কিন্তু তার মনোভঙ্গি সর্বদাই সাবজেকটিভ। এর ফলে অতীতচারণ করলেও তাতে চিরবর্তমানের সুর ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ'র একক আত্মস্মৃতিকথন ভঙ্গির ত্রুটি কাটাবার জন্য পরবর্তী উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে'তে উত্তমপুরুষের বাচনে তিনটি চরিত্রের মুখে তাদের আত্মজিজ্ঞাসার কাহিনী বিবৃত করেছেন। শ্রীবিলাসের পক্ষে দামিনী বা শচীশের অন্তঃসত্তার গভীর গোপন দ্বান্দ্বিক রহস্য ও চরিত্র দুটির মানসিক বিবর্তন বিশ্লেষণে যে সীমাবদ্ধতা ঘটেছিল তা অনেকটা দূর হয়েছে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে। এখানে চরিত্রগুলির মুখে উত্তমপুরুষের বাচনভঙ্গি প্রয়োগ করে বহুকৌণিক রীতিতে আত্মস্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। আত্মকথা ও আত্ম-জিজ্ঞাসার মেলবন্ধন ঘটেছে উত্তমপুরুষের বাচনিক রীতির ব্যবহারে। এর আগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসে ও পরে সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহরীতি রক্ষা করতে গিয়ে পর্যায়ক্রমে চারটি চরিত্র লেখকের বক্তব্যের বাহক হয়েছে।

স্বস্তি মণ্ডল

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস : অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় তো আমরা প্রায়শই পেয়ে থাকি সাহিত্যসাধকদের সাহিত্যকীর্তিতে, কিন্তু পাঠক-দের পিপাসা কিছুতেই মিটতে চায় না, আমরা ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে জেনে নিতে চাই এই সামান্য লোকজগতে ঐ অলৌকিক প্রতিভার কতখানি অধিকার। ঐ শিল্পসাধকের নিরালাকেও অবারিত করতে চাই আমরা। যা কিছু গোপন-ধন—কিছু তো গোপনই থাকে—সেখানেও আমাদের লোভাতুর মন খানিকটা কাঙালপনাকেই প্রশ্রয় দেয়। না হলে, সাহিত্য-শিল্পে কবিকল্প তো মনের ছবিই

আঁকেন, উপহার দেন তাঁদের মর্মের গোপন কথাগুলিকে। কখনও ঘন-বুনোট গল্পে স্তর-পরম্পরায় কোনো উপলব্ধিতে পৌঁছে তাঁদের ভাবনাকে তাঁদের প্রত্যয় করে তোলেন, সর্বজনীন বিশ্বাসে সেগুলো উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কখনও দেখি চরিত্র-চিত্রে শিথিল ভঙ্গিতে তাঁর ভাবনা বিস্তৃত হয়। আর মাঝে মাঝে ঘটনা-চরিত্রের গাঢ়-সংগমে এক অশরীরী ছায়া কাঁপতে থাকে—আমরা উদ্বেল হয়ে উঠি। ঘটনা নয়, চরিত্রও নয়—উপন্যাসের সে আবেশ খরদীপ্তিতে ক্ষুরধার বেগে আমাদের বিমূঢ় করে দেয়। এমন সব ক্ষেত্রেই উত্তরণের সমীপে এক অপরিচয়ের আলো ঝিলমিল করে। উপন্যাসের রূপচর্চায় এদের সব পারিভাষিক নাম আছে—**ঘটনাপ্রধান উপন্যাস, চরিত্রপ্রধান উপন্যাস, নাট্যগতিসম্পন্ন উপন্যাস**। কিন্তু ব্যক্তিত্বের এই ব্যাপ্ত চলতাধর্মে যখন আমরা তৃপ্ত নই, তখনই খোঁজ পড়ে কোথায় কোন্ অকিঞ্চনের মোহ জড়ানো আছে। উৎসাহভরে তাঁদের জীবনকাহিনী পেতে চাই। মিলিয়ে নিতে চাই লোক-অভিজ্ঞতায় ঔপন্যাসিকেরা আমাদের কত কাছাকাছি। কারো খবর পাই, কারো সন্ধান মেলে না। জাগতিক কোন্ অভিজ্ঞতা কার সাধনায় কতটা গ্রন্থিমোচনে সহায়ক হয়েছে, কেউ তার হিসেব রেখে যান, কারো মন হিসেব মেলাতে রাজী হয় না। যাঁরা পরম মমতায় হারানো দিনগুলোকে ধরে রাখেন, সনির্বন্ধ পরিচয় করেন পাঠকের সঙ্গে, তাঁদের উপন্যাসগুলিরও একটি নাম-পরিচয় আছে—আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাস। এইসব উপন্যাসে তাঁদের মত্ত ব্যাকুলতার সঙ্গেই আমাদের পরিচয় ঘটে, স্মৃতিবিহ্বলতার মৌসুমী গন্ধ বইতে থাকে এই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে।

আসলে কোনো মহৎ ঔপন্যাসিককেই দেখতে পাইনি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে তাঁর কিছু আগ্রহ আছে। কেন? হয়ত জীবনের সব কথার আগল ভেঙে দেওয়ায় কোথাও কিছু সংকোচ আছে; কিংবা প্রত্যয়ে-উপলব্ধিতে নিজস্ব পাদপীঠই যাঁর আয়ত্তে, নিজত্বের বিশেষধর্মে তাঁর প্রলুব্ধ হবার কারণ নেই। কিন্তু যাঁরা মমত্বে দুর্বল, হয়তো বা কোমলও খানিকটা, সঞ্চয় যাঁদের সামান্যই সেখানে সব-হারানোয় লজ্জা আছে, আছে কিছু সংকোচ। তাই পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে বেচাকেনাতেই তাঁদের এত সাধ। এই ভীরুতা উপন্যাসে এসে এক স্বচ্ছ আবরণ পেয়ে যায়—আমাদের চোখে স্ফূর্তি পায় তাঁদের সেই লাজনম্র ছবি। স্বচ্ছ আবরণ আমাদের মনে কুহকের সৃষ্টি করে। এই ব্যবধানটুকুকে লালন

করেই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের কাহিনীকারেরা জীবনী আর উপন্যাসের দুটি কক্ষে ইতস্তত বিচরণশীল। ঐ মুহূর্তকে ছিন্ন করে নিয়েছেন তাঁরা মহাকালের কাছ থেকে, কিংবা এ তাঁদের গৌরবময় ঋণ, আর ঐ দুটি কক্ষ তো স্বতঃই বিচ্ছিন্ন মহাবিশ্ব থেকে। একাকিত্বের ঐ ঐকান্তিক আস্বাদনে কিছু আতুরতা আছে। ঐ আতুরতার উৎস তাঁদের অতি তীক্ষ্ণ আত্মসচেতনতা। জীবনীতে থাকে তাদের দৈন্যের অকৃত্রিম স্বীকৃতি আর তার বিশ্লেষণ, তাই-ই যখন কথাসাহিত্যে কাহিনী হয়ে ওঠে, তখন শুনি ঔপন্যাসিকের করুণ-কম্প্র কণ্ঠ; এই আত্ম-অপচয়ের অভিমানী কৈফিয়ত।

এদিক থেকে ভেবে দেখলে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখেননি টলস্টয় কিংবা ডস্টয়েভ্স্কি, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথও লেখেননি। ভিক্টর হুগো লিখেছিলেন? দাবিটা বিতর্কমূলক। রবিনসন ক্রুশো হয়ত খানিক পরিমাণে নির্জনতার undisputed monarch ডিফো-কে স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু লিখেছেন ডিকেন্স, লিখেছেন শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর। কিন্তু ডেভিড কপারফিল্ড যদি ডিকেন্সের প্রতিনিধিত্ব করে, কিংবা শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রেরই অকৃত্রিম রূপ বলে মনে হয়, শিবনাথের মধ্যে যদি তারাশঙ্কর উদ্ভাসিত হয়ে থাকেন, তাহলে কে বলবে Nekhlyudov (রেজারেকশান)-এর উপলব্ধি টলস্টয়ের উপলব্ধি নয়, Raskolnikov (ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট)-এর ভাবনার সঙ্গে ডস্টয়েভ্স্কির ভাবনার মিল নেই; অমরনাথের (রজনী) চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রই মগ্ন নন কিংবা গোরার (গোরা) উদার উজ্জীবন রবীন্দ্রনাথেরই বিশ্বাসে বিন্যস্ত নয়? অপু (পথের পাঁচালী) অথবা সত্যচরণ (আরণ্যক)—এরা তো বিভূতিভূষণের মতোই সৌন্দর্যমাখা চোখে স্বপ্নলীন হয়ে আছে। (আসলে বিভূতিভূষণকে নিয়ে সমস্যা একটু গভীর। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের প্রায় সব প্রাথমিক শর্ত বিভূতিভূষণ মেনে নিয়েছেন, কিন্তু উল্লিখিত চরিত্রাবলী বিভূতিভূষণের হাতে যেন নির্বিশেষ রূপকল্প—বিশেষ সত্তায় চিহ্নিত হবার পক্ষে বিভূতিভূষণের কল্পনাই তাঁর প্রবল অন্তরায়; তাঁর হাতে গড়া যুগান্তরের 'মশালচী'রা আলোর ঝরনায় স্নান সমাপন করে 'কিন্নরদল'-এর মতোই অতীন্দ্রিয়ের নিবিড়তায় নিশ্বাসক্ত হয়ে আছে। সুতরাং 'স্মৃতির রেখায়' যতই ধরা দিন বিভূতিভূষণ, বিশেষের অঙ্গীকারে এরা মোটেই মূর্ত নয়। অথচ, এদের বিভূতিভূষণের সগোত্র বলে চিনতে পারা যায় অনায়াসে। ভাবতে গিয়ে আমাদের বিচারের মানদণ্ডটা যায়

গুঁড়িয়ে, স্থির নিরিখের আর উদ্দেশ মেলে না। এটা বোধহয় খুব বড় রকমের একটা 'প্যারাডক্স'। কিংবা ভাবা চলতে পারে, যদিও সত্যচরণের একটি ক্রম-পরিণতি আছে, কিন্তু তা অত্যন্ত অন্তঃস্থিত আর উত্তরপুরুষের অপুকে নিশ্চিন্দিপুরে ডেকে এনে বিভূতিভূষণ রামধনুর দুটি প্রান্তকে কল্পনার ছিলাতে সন্নিহিত করে দিয়েছেন। বলা যেতে পারে বিভূতিভূষণই তো একটি স্বপ্নের নাম। নিশ্চিন্দিপুরে প্রত্যাবর্তনে সেই স্বপ্নবৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং আমাদের কোন সংজ্ঞাই তাঁর পক্ষে সম্যকভাবে প্রযোজ্য নয়।) তা হলে দেখা যাচ্ছে বিশ্বাসকে ভাবের স্বর্গে পৌঁছে দিলে কিংবা সর্বজনীন উপলব্ধির অবারিত আলিঙ্গনের মধ্যে কোথায় যেন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের মুঠিম বিস্তৃতিটা হারিয়ে যাচ্ছে। মহাকাল-মহাবিশ্ব থেকে সযত্নে সরিয়ে এনে গভীরে লালন করা ঐ মুহূর্তটুকু, ঐ ব্যাপ্তিটুকুই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসেব বিচরণশীলতার জগৎ। যদি কেড়ে নেওয়া হয় এদের ঐ স্বাধিকারের পীঠস্থানটুকু, মুছে দেওয়া হয় ঐ ছিন্ন মুহূর্তগুলির অর্জিত অধিকারকে, তখন বৃহতের পটভূমিতে সবই তো আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাস : "বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তার আবাল্যদীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ, হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন।"

উপন্যাসের পক্ষে গল্পাংশ কতটা জরুরি জল্পনা চলতে পারে সে বিষয়ে, যদিও উপন্যাসের প্রথম পর্বে আখ্যায়িকাই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু চরিত্র নিয়ে খেলা করেছিলেন প্রুস্ত, আর জয়েস তাতে পুষ্টি এনে দিয়েছেন। মাঝখানে এই গল্পাংশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আধুনিক কালের উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণই তো মুখ্য দায়িত্ব হিসেবে দেখা দিয়েছে। শুধু কি তাই? একালের চরিত্ররা সংলাপের বদলে স্বগতোক্তিতেই বেশি অভ্যস্ত; একালে ঔপন্যাসিকেরা. এমনকি ছোটগল্প-রচয়িতারাও চরিত্রকে অবলম্বন করে ডুব দিচ্ছেন নিজেদেরই গভীরে। ধরে দিচ্ছেন তাঁদের কাছে স্মরণীয় কিছু মুহূর্তকে। এই গভীরচারণা প্রকাশ পাচ্ছে অনেক পরিমাণে কাব্যের দ্যোতনায়। বর্ণনা বা বিবৃতি দীর্ঘ হয়ে আসছে। হয়ত এই সুবাদেই আসছে **মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস**। ব্যক্তি-সমাজের পারস্পরিক সংবাদের বদলে আমরা নিভৃত চৈতন্যের একটি রশ্মিরেখাতেই আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করতে বাধ্য হচ্ছি। গল্প তো হারাচ্ছেই, বোধকরি চরিত্রের সম্পূর্ণতাও আর দেখা যাচ্ছে না। চরিত্রের roundness হয়ত বাড়িয়ে দিচ্ছে তারা, কিন্তু এরা তো চরিত্র নয়—এরা তো কতকগুলি অনুভূতির প্রতীক, কিছু অভিজ্ঞতার

রূপকল্প। তাই এই জটিলতা। এক্ষেত্রেও ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা বিপরীত প্রান্ত থেকে নির্বিশেষকেই স্তুতি করে চলেছে। হারিয়ে যাচ্ছে চরিত্রও, শুধু গল্পই নয়। **চেতনা প্রবাহের** অন্তঃস্রোত বিশ্ব-ধারণার কেন্দ্রে সাড়া জাগাচ্ছে। কিন্তু আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাস এরাও নয়। স্থান-কালের দাবিকে অবহেলা করেই এদের সূত্রপাত। সুতরাং ব্যক্তিত্বও নয়, 'নিজত্ব'টুকুই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের পরম উপজীব্য। এই 'নিজত্ব'টুকু স্মৃতির আবেশে বিহ্বল, অনুষঙ্গের মন্থরতায় ভরা; এরা ব্যর্থতার করুণ সাক্ষী, প্রত্যাশার উদ্দামতায় চঞ্চল। সর্বোপরি এরা লৌকিক অভিজ্ঞতার ফসল। এইটুকুই দায় তাদের: "To render the truth of experience." 'শ্রীকান্ত', 'নিকোলাস নিক্‌লবি', 'ধাত্রী-দেবতা'—প্রথমটিতে শরৎচন্দ্র যেন অনেক আয়াসে ক্রন্দনের বেগটাকে সামলে নিয়েছেন, যদিও জল শুকিয়ে যায়নি, দ্বিতীয়টিতে ডিকেন্স ঠিক আশাবাদী নন—প্রত্যাশামুখর, তৃতীয়টিতে উপলব্ধির একটি তত্ত্বরূপের প্রলেপ দাহকে জুড়িয়ে দিয়েছে।

'নিজত্ব' বলতে কী বলতে চেয়েছি, এই নির্দেশ কত অমোঘ, তার একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। Georgi Markov-এর আত্মজীবনীর উপাদান-সমৃদ্ধ উপন্যাস *Father and Son*-এ Alyoshka স্মরণ করছে তার পিতার মৃত্যুকে : "Alyoshka continued to stand next to Skobeyev, looking silently at the river, the banks, the sky. Here on the Vasyugan, childhood memories, dimmed by time and events, were fanned to life like coals in a fire are fanned by gusts of wind. A succession of pictures floated before his mind's eye, pictures of a life which he had not quite understood and comprehended in all its details at the time and were now, when he had come to understand the real meaning of those distant events, only too painfully obvious." কালের নিরিখ থেকে এটুকু ছিনিয়ে নিয়েছে Alyoshka,—এ তার আপনার সামগ্রী। ঘটনা, বিষণ্ণতায় মিশে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়েছে এখানে। কিন্তু অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা-ই—ব্যাপ্তি পর্যাপ্ত নয়, উপলব্ধিও কিছু গভীরে আলোড়ন তোলে না। তথাপি এর একটি দুর্জয় আকর্ষণশক্তি আছে। কারণ, অভিজ্ঞতাটি ক্ষতচিহ্ন-অলংকার-লাঞ্ছিত

হয়েই আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। এই যে অব্যবহিত স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাসে, এরাই লেখকের নিজস্বতার পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। যদিও এত সম্ভার সত্ত্বেও লেখক একে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলেননি, কারণ—"Its scope is greater than that of a single life and single fate." উপন্যাসটির শেষে এই ব্যক্তিমন সমাজমনকে স্তুতি জানিয়েছে। তাহলে বিশ্বাসে উত্তরণই একে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হতে দিল না। যদিও উপন্যাসের ঘটনাপঞ্জী প্রায় ঠিক-ঠিক মিলে যাবে Markov-এর ব্যক্তিজীবনের ঘটনার সঙ্গে। ঠিক এই কারণে 'ধাত্রীদেবতা'ও কিছু পরিমাণে লঙ্ঘন করে গিয়েছে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের শর্তকে। কেন্দ্রীয় কোন সূত্রের অভাবে আত্মজীবনী-মূলক উপন্যাসকে হতে হয় কেন্দ্রচ্যুত, বৃত্তটা আর সম্পূর্ণ হয় না কিছুতেই। সরল, বক্র, কুটিল যেমন রেখাই টানি—মিলবে না তারা কোনখানে, কোনমতে। তাই উপন্যাস হিসেবেও যেন এরা সম্পূর্ণ হয় না ; কিংবা হওয়া সংগত নয়, তাই হওয়া উচিতও নয়।

কথাটা ব্যাখ্যা করা ভালো। লেখককে, তাঁর নিজস্বতাকে আমরা দেখব কেমন করে ? বিশ্বের অংশ, অথবা সমাজের অংশ, অথবা আত্মানুভূতির সমষ্টি কিংবা সমাজ এবং ব্যক্তির নিয়ত সংঘর্ষের ক্রমপ্রকাশশীল অস্তিত্ব হিসেবে ? শেষ অনুজ্ঞাটিকেই প্রয়োগ করব আমরা। কারণ, যে ভীরুতা এর মর্মে নিরুচ্চার অথচ সজীব, তাকে পরিণত প্রত্যয়ে পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব। কারণ, সংকোচের সঙ্গে সন্ধি করে না কোন নিরঙ্কুশ প্রত্যয়। আর গ্রহণক্ষমতাই যার সীমিত, উপলব্ধির অপরিমিতি তার কাম্য হতে পারে না, পারে না নিয়ত সংঘাতের চঞ্চলতায় কোন ফলবান খণ্ডকে মহৎ দুঃখে জয় করে নিতে। সুতরাং পাঠকের কাছে সে তার ভীরু মিনতির বার্তা পাঠায়—যদি তাকে মনে রাখে পাঠক। অতঃপর roundness এ-চরিত্রের লক্ষণ হতে পারে না, তাকে flat হতে হবে। ঐ সংকোচ, ঐ আত্মদৈন্যই এই flatness-এর কারণ।

সব মিলিয়ে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস আমাদের সামনে কোন্ কোন্ বিশিষ্টতা নিয়ে মূর্তি পরিগ্রহ করে ? প্রথমত, আমরা দেখি ব্যক্তিজীবনের ঘটনাপঞ্জী কী কী ভাবে উপন্যাসটিকে প্রভাবিত করেছে। আরও দেখি, সেই প্রধান ঘটনাবলীকে যারা উপন্যাসে গ্রন্থিমোচনের সহায়ক হয়ে উঠেছে নায়করূপী লেখকের। দ্বিতীয়ত, দেখতে চাই লৌকিক ঘটনায় লেখকের অধিকার

কতখানি। মনে রাখব স্মৃতির ভূমিকা যখন এ-জাতীয় উপন্যাসে বলিষ্ঠ ভূমিকা পেয়ে থাকে, তখন সে ঘটনাবলী transposed হোক ক্ষতি নেই কিন্তু transcendental হবে না কোনমতেই। কারণ, অভিজ্ঞতার elemental প্রয়োগই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে শোভন। সুতরাং অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গবাহী বিন্যাসই এদের পক্ষে প্রশস্ত। তৃতীয়ত, আমাদের কাছে ধরা পড়ে লেখকের সসংকোচ ভীরুমন, যাকে তিনি আড়াল দিয়েই রাখতে চান ; সেখানে অনেক হিজিবিজি, অনেকখানি অপূর্ণতার সমারোহ। অথচ, নিজেকে সম্পূর্ণ শুদ্ধরূপে উজাড় করবার আবেগে তিনি থরথর। চতুর্থত, ঐ দ্বিধাই তাকে নিরঙ্কুশ হতে দেয় না কালের প্রেক্ষাপটে। মহাবিশ্বে অধিকার সে পাবে না কখনই। ঘটনাস্থল হিসেবে কাহিনীর বিস্তার যেমনই ঘটুক না কেন, লেখকের নিরিখে তার সসীম রূপই আমাদের চোখে পড়ে। লেখকের দিক থেকে বলা যাবে, এগুলি তার ছিন্ন কালের ফসল। আর তার আন্তরিক বিঘ্নই বিপুলকে বন্দনা জানাবার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় এসব ক্ষেত্রে। পঞ্চমত, ঠিক এইজন্যেই এগুলি কোন বিশেষ ব্যক্তির নিজস্বতার ছবি, ছায়া সূর্যে ম্লান হয়ে আছে। আবেগের উষ্ণতায় কথাকার অস্থির। তাই সেন্টিমেণ্ট প্রবল হয়ে ওঠে। স্মরণীয় আবেগমণ্ডিত স্মৃতিখণ্ডগুলিতে কাব্যসৌন্দর্যের ছোপ লাগে তাই। কোথাও কোথাও তা হয়ত কবিতাই হয়ে ওঠে। মনন-নিরপেক্ষ প্রাণের কান্না তো এমনিতেই সেন্টিমেণ্ট বা ইমোশন-নির্ভর হয়ে কবিতায় স্ফূর্তি পেয়েছে। ষষ্ঠত, সমাপ্তিতে এসে ঐ 'একক'-এর প্রতীতিই হবে সুনিশ্চিত, যদিও তা পরিণতির পূর্ণ আলেখ্য হবে না। কারণ, এসব উপন্যাসের নায়কচরিত্রে বিকাশের একটি ক্রম থাকে ঠিকই, কিন্তু তারা জীবন-সন্ধিৎসু হয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় না। সপ্তমত, ফলে মূল চরিত্রটি হয়ে পড়ে flat—স্বভাবতই গঠনের দিক থেকে শৈথিল্য দেখা দেয়। ভীরু মানুষের ক্ষীণ আশা, দীন বিশ্বাসের কোন কেন্দ্রীয় স্থিতিমূল্য নেই,—থাকে না। সর্বোপরি ঐ কেন্দ্রাতিগ ধর্মই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে সুডৌল বৃত্ত গড়তে দেয় না। কাহিনীর ঘটনাবলী ছড়িয়ে থাকে দ্বীপপুঞ্জের আকারে। সবশেষে তা হলে প্রশ্ন করা যায়—উপন্যাস হিসাবে এরা কতটা সাফল্যের দাবি করে? হয়ত সেই দাবির অভিমান এদের খুব বেশি নেই। জীবনের ঘটনার তথ্যভারকে কিছু পরিমাণে আপ্লুত করে আনুষঙ্গিক হৃদয়াবেগের নিখুঁত অনুবৃত্তিতে। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসপাঠের বিশেষ স্বাদটুকুকে ধরে দেওয়া যাবে না ; প্রয়াসী হলে, বড়

জোর বলা যাবে, প্রায়-জনহীন এক দ্বীপপুঞ্জের বনসৌন্দর্যের মতোই এদের elemental দিকটি আমাদের আচ্ছন্ন করে।

সরোজ দত্ত

অ্যাটমোস্‌ফিয়ার—দ্র. পটভূমি; আঞ্চলিক উপন্যাস।

অ্যানাক্রনিজ্‌ম—দ্র. কালানৌচিত্য দোষ।

অ্যাবসার্ড নভেল: সাহিত্য পরিভাষায় 'অ্যাবসার্ড' শব্দটির প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় আলবেয়ার কাম্যুর 'দি মিথ অব সিসিফাস' প্রবন্ধে (১৯৪২)। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন 'Sisyphus is the absurd hero'। সারাদিনের অক্লান্ত চেষ্টাসত্ত্বেও সিসিফাস পাথরখণ্ডকে পাহাড়চূড়ায় ঠেলে নিয়ে যেতে পারে-নি। এই ব্যর্থতা, এই নিঃসঙ্গতা ও নির্বেদের মধ্যে কাম্যু তাঁর অ্যাবসার্ড তত্ত্বকে খুঁজে পেয়েছেন। জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে চেয়ে শেষপর্যন্ত অর্থহীনতায় আক্রান্ত হওয়া সব মানুষের পরিণতি ভেবেই, কাম্যু প্রশ্ন রেখেছেন—'That life is not worth living'. কী এই অ্যাবসার্ড? বোঝাতে গিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, 'This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitutes the feeling of absurdity.' কাম্যু যাকে divorce বলেন, মার্ক্‌স তাকেই বিচ্ছিন্নতা বা অ্যালিয়েনেশন্ বলবেন। কিন্তু মার্ক্‌স তাঁর তত্ত্বকে শ্রম ও মুনাফার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আর কাম্যু সার্বিক শোচনা ও পরাজয়কে খুঁজেছেন মানুষের অস্তিত্বে, আচরণে।

আয়ানেস্কো মনে করেন, অ্যাবসার্ড সমস্তরকম 'উদ্দেশ্যবিযুক্ত' ব্যাপার। অর্থাৎ 'cut off from his religious, metaphysical and transcendental roots, man is lost.' এক চরম অর্থহীনতায় ডুবে যাওয়াই অ্যাবসার্ড তত্ত্ব। এক নিরাবলম্ব শূন্যতা, অমূর্ততাই এর লক্ষ্য। কিন্তু যে অর্থে অস্তিত্ববাদ একটি আন্দোলন, অ্যাবসার্ডবাদ তা নয়। সার্ত্র বা কাম্যু অস্তিত্ববাদের ভূমিতে দাঁড়িয়েই অ্যাবসার্ডবাদের কাছাকাছি পৌঁছেছেন। তাঁদের কাছে জীবন বাঁচার পক্ষে উপযুক্ত নয়; সর্বত্র উদ্দেশ্যহীনতা ও অনন্বয় প্রকট। তাই কাম্যুর 'দি স্ট্রেঞ্জার' বা 'আউটসাইডার' এক নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত মানুষ। নায়ক মরসো মায়ের মৃত্যুতে, কাউকে খুন ক'রে বা প্রেক্ষাগৃহে সঙ্গিনীর শরীরীউষ্ণতা নিয়েও আলাদা কোনো বোধে, অনুভবে আলোড়িত নয়। অ্যাবসার্ডবাদ কোনো তত্ত্বে,

আদর্শে বা যুক্তিতেও বিশ্বাসী নয়। সার্ত্র-র 'নসিয়া' উপন্যাসের নায়কের বমির উদ্রেকে তাই বস্তুজগৎ মুছে যায়। কাফ্কার 'মেটামরফসিস'-এর নায়ক নিজেই পোকা হয়ে এক অনস্তিত্বময়তায় ভোগে। কিয়ের্কগার্ড, হাইডেগার বা সার্ত্র প্রমুখ অস্তিত্ববাদীদের কাছে জীবন বা অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। সেই বিপন্নতা কারো কাছে ঈশ্বরের মুখোমুখি হবার অজানা শঙ্কা, কারো কাছে তা মৃত্যু। কেউ বা নেতিবাদী। প্রাত্যহিকতার দাসত্বে তাঁদের অনীহা ; স্বাধীনসত্তা তাঁদের কাম্য। অ্যাবসার্ডবাদীরা এমন স্থির বিষয়ের প্রত্যয়ে যেতে চান না। এইজন্য অ্যাবসার্ড-বাদের কথা বলেও কামু্য-র সিসিফাস শেষপর্যন্ত 'সুখী' রূপে কল্পিত (One must imagine Sisyphus happy.) ; সুখ ও অ্যাবসার্ড তাঁর কাছে এই পৃথিবীর সোদর সন্তান। যে সুখ অর্জিত হয় অবিরাম কর্মের মধ্যে, ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধের মধ্যে, অর্থহীনতার মধ্যে, অর্থ খোঁজার মধ্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই অস্তিত্ববাদের পাশে অ্যাবসার্ডবাদ প্রাধান্য পেয়েছে দেখা গেছে। মুখ্যত নাটকে এর প্রয়োগ ঘটলেও, উপন্যাসেও তার প্রভাব পড়েছে। আসলে যে দেশে, যে সমাজে, যে পরিবারে আমরা বাস করি, সেখানে গড়ে তুলতে চাই পরিচ্ছন্ন সংযোগ ও হার্দ্য আত্মীয়তা। চাই 'লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ'। কিন্তু দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ মানুষের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও সম্পর্ককে ভেঙে দিল। মানুষ হয়ে উঠল জটিল, কুটিল, আত্মকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যৌথ, ও তাও ভেঙে দু'জনের সংসার গড়ে উঠল। অতিনৈকট্য নরনারীর মধ্যেকার রহস্য, মাধুর্য, দূরত্বকে ধ্বংস ক'রে নিয়ে এলো অতিচেনার যন্ত্রণা। কল্পনার স্থান না থাকায় জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে উঠল—অনেকটা সিসিফাসের পাথর ঠেলার মতো। উপন্যাসে মূলত এই সমস্যার, সংকটের গভীরে ঢুকতে চাইলেন ঔপন্যাসিকরা। জগৎ, জীবন ও মানুষকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে গিয়ে উপলব্ধি করলেন, তা পেঁয়াজের মতো ; খোসা ছাড়ানোই সার, শূন্যতাই শেষ পরিণতি। এর ফলে এলো ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুক ; এলো ফ্যান্টাসি, অসম্ভব স্বপ্নকল্পনা। অতিবাস্তব, অধিবাস্তব, অবাস্তব মিলেমিশে রচিত হলো অ্যাবসার্ড জগৎ। যাকে কেউ কেউ বলেছেন 'উদ্ভট'। কেননা এখানে সবই 'যুক্তিছুট বুদ্ধিছুট কিম্ভুত ব্যাপার' (দ্র. বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা—সত্যেন্দ্রনাথ রায়)। তবু মনে হয় 'উদ্ভট' অপেক্ষা 'অমূর্তবাদ' শব্দটি এখানে অধিকতর সুপ্রযোজ্য। যে-অস্তিত্ব বিপন্ন, যাকে প্রতিষ্ঠা করা দরকার কিন্তু পারা

যাচ্ছে না—সেই অনিরূপণ, সেই অসেতুসম্ভব ইচ্ছা-বাসনার ব্যর্থতা ও বেদনাই 'অমূর্তবাদ'। জীবনানন্দ দাশের "আটবছর আগের একদিন" কবিতার নায়ক এমনই এক 'বিপন্ন বিস্ময়'-স্পৃষ্ট হয়ে পরিপূর্ণ জীবনকে আত্মহননে বিসর্জন দিয়েছিল। আমেরিকায় জন পিন্‌চন 'V' উপন্যাসে, জন বার্থ *The Sot-weed Factor*, জেমস্ প্যাডি *Malcolm*, কুর্ট ফন্নেগুট *Siren of Titan* ইত্যাদি উপন্যাসে প্যারডির মাধ্যমে অ্যাবসার্ডবাদকে ব্যক্ত করেছেন। নিখুঁত অ্যাবসার্ড নভেল এগুলি নয় এইজন্যই যে, এঁরা নতুনত্বের জন্য এই তত্ত্ব ও ভঙ্গি নিলেও জীবনকে শেষপর্যন্ত অর্থহীন ভাবেননি। বরং অ্যান্টি-নভেল বা নুভো রোমঁ্যার অনুকরণে আমাদের দেশে হাংরি জেনারেশন বা শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারেরা 'ছাঁচ ভেঙে ফেলো' আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু সে-ও ছিল নতুন কিছু করার চমক মাত্র, তাই ভঙ্গিই এক্ষেত্রে বড় হয়ে উঠেছে এবং গণসমর্থন লাভ করেনি। সমরেশ বসু "বিবর"-এ খানিকটা অ্যাবসার্ড উপন্যাসের আদল আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনো বাঙালী লেখকই তাঁদের লেখায় অ্যাবসার্ড-তত্ত্বকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি। না-পারার পিছনে আছে ভারতীয় ঐতিহ্য, অধ্যাত্মচেতনার অলক্ষ্য প্রভাব। বিদেশী লেখকরা অবশ্য অস্তিত্ববাদের সীমা লঙ্ঘন করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। অর্থাৎ তাঁদের কাছে জীবন ও জগৎ শেষপর্যন্ত স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে। প্রকৃত অ্যাবসার্ড নভেল তাই এখনো কোনো শক্তিমান লেখকের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষমাণ।

তরুণ মুখোপাধ্যায়

উদ্দেশ্যমূলকতা (উপন্যাসে) : মানুষের বাস্তব ও কল্পনার জগৎকে কেন্দ্র ক'রেই উপন্যাস রচিত হয়। মানুষের জীবনধারা, সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত, আদর্শ, উদ্দেশ্য, প্রত্যয়—সমস্ত ব্যাপারই উপন্যাসের পটভূমিকায় কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে, কখনও-বা পরোক্ষে নানা ধরনের রং-রস-ভাব সৃষ্টি করে। একদা মহাকাব্য মানুষের গল্প-আখ্যানের তৃষ্ণা মিটিয়েছে। নীতিকথা, উদ্ভট কাহিনী, বীরত্ব ও প্রেম এবং সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গ নিয়ে প্রাচীন যুগেও নানা ধরনের কথা, কাহিনী ও আখ্যান রচিত হয়েছে—যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মানুষ ও তার প্রতিদিনের জীবনযাত্রা। কিন্তু উপন্যাস বলতে যে শিল্পপ্রকরণটি নির্দেশ করা হয়, তার কায়া ও কান্তি গত দু'শ বছর ধরে বিকাশলাভ করেছে। অবশ্য খ্রীঃ সহস্রাব্দে আবির্ভূত জাপানী মহিলা ঔপন্যাসিক শিকিবু মুরাসানির প্রণয়ঘটিত উপন্যাসে

(*The Tale of Genji*) সর্বপ্রথম উপন্যাসের শিল্পকলাগত রূপ ফুটে উঠেছিল। বোকাচিওর (১৩১৩—১৩৭৫) *The Decameron*-এ প্রেমপ্রণয়ের বাস্তবঘেঁষা উত্তপ্ত কাহিনী ঠাঁই পেয়েছিল। কিন্তু বাস্তব পটভূমিকায় গড়ে-ওঠা আধুনিক উপন্যাসের সঙ্গে তার গোত্রগত যোগ থাকলেও অঙ্গাঙ্গি যোগ নেই। আধুনিক যুগে, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি, সামাজিক সমস্যা, রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদির ফলে মানুষের বাস্তবজীবন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জমা হয়েছে। এই সময় থেকে উপন্যাসে সেই প্রশ্নজর্জর মানুষের এমন একটা মূর্তি ফুটে উঠল যে, নাটক-মহাকাব্যে তার স্থান সংকুলান হলো না ; নতুন ধরনের গদ্যকাহিনী 'উপন্যাস' নামে গড়ে উঠল—যার মূল উপাদান হলো মানুষের বাস্তব জীবন, তার নানা সমস্যা, সংশয়, নানা ভাব, কল্পনা ও আদর্শের বিচিত্র সমারোহ।

আধুনিক যুগে উপন্যাস রচনার প্রথম পর্ব থেকেই উপন্যাসের তাৎপর্য, ফলশ্রুতি এবং মানবজীবনে তার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার তরঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে পাঠক, লেখক ও সমালোচকের মনে একটি প্রধান প্রশ্নের উৎপত্তি হয়েছিল। বস্তুত উপন্যাস কি শুধুই চিত্তবিনোদনের সামগ্রী ? গল্পবুভুক্ষু পাঠকের মানসিক ক্ষুধা পরিতৃপ্তির স্থূলতম উপায় মাত্র ? অথবা এর পিছনে কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য আছে ? ঔপন্যাসিক কি শুধু কাল্পনিক গল্প নিয়ে মশগুল থাকবেন, না তাঁর একটা জীবনপ্রত্যয়, একটা সূক্ষ্ম মানসিক উদ্দেশ্য উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠবে ? অর্থাৎ তিনি কি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য, নীতিপ্রচার, সামাজিক-রাজনৈতিক তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা, মনোবিজ্ঞানের সূত্রানুসন্ধান প্রভৃতি মানুষের প্রশ্নসংকুল তত্ত্বকথাকেই উপন্যাসে প্রাধান্য দেবেন ? উপন্যাস কোনো প্রকার মতপ্রচারের বাহন, কোনো আদর্শ ও নীতির নকিব হবে কিনা, এ প্রশ্ন সে যুগের লেখক-পাঠক-সমালোচক সকলকে যেমন উতলা করেছিল, তেমনি আধুনিক যুগেও উপন্যাসের উদ্দেশ্যমূলকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

মধ্যযুগের গদ্যকাহিনীতে নীতি ও তত্ত্বকথা স্থূলভাবেই বলা হতো। বস্তুত বিশেষ ধরনের নীতিকথা ও উপদেশকে মানবসমাজে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সে যুগের প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে গল্পকথা, উপকাহিনী ও প্যারাবেলের সাহায্য নেওয়া হতো। আবার নীতিসম্পর্কহীন প্রেম, রোমান্স ও দুঃসাহসিকতার গল্পও পাঠক ও শ্রোতৃসমাজে খুব প্রচলিত ছিল। গ্রীক-রোমান নীতি-আখ্যান ও

রোমান্স, সংস্কৃতে রচিত হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, দশকুমার চরিত, কথাসরিৎসাগর, পালি জাতক প্রভৃতিতে গল্প-উপন্যাসের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যাকে আধুনিক শিল্পতত্ত্বে উপন্যাস বলে, সেকালের গল্প-আখ্যানে তার বিশেষ রূপটি ফুটে ওঠেনি। য়ুরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপন্যাসের জন্মলগ্নে রোমান্টিক কাহিনী, নীতিমূলক আখ্যান এবং বাস্তব জীবন—গল্প-উপন্যাসের উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯—১৭৬১) তাঁর *Pamela* (১৭৪০) উপন্যাসে নারীর আদর্শ ও পবিত্র চরিত্রাদর্শের নীতিমূলক চিত্র এঁকেছিলেন ; ডিকেন্স (১৮১২—৭০) তাঁর *A Tale of Two Cities* (১৮৫৯), *Oliver Twist* (১৮৩৮), *Nicholas Nickleby* (১৮৩৯), *David Copperfield* (১৮৫০) প্রভৃতি উপন্যাসে বিশেষ ধরনের নীতিকথা ও আদর্শের ব্যঞ্জনা দিয়েছিলেন। তবে তাঁর লেখার সহজ প্রসন্নতা ও সরসতা নীতিপ্রচারের উগ্রতাকে সব সময়ে সংযত ও প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে। হেন্‌রি ফিল্ডিং (১৭০৭—৫৪) রিচার্ডসনের নীতিপ্রধান আখ্যানকে ব্যঙ্গ করলেও তাঁর *Tom Jones* (১৭৪৯) এবং *Amelia* (১৭৫২)-তে চরিত্রনীতি ও সৎজীবনের প্রতি স্পষ্টই প্রবণতা ঘোষিত হয়েছে। অবশ্য নীতিপ্রচার ও অন্যান্য উদ্দেশ্যের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেবার জন্য কেউ কেউ শিল্প হিসেবে উপন্যাসের জাত নষ্ট করেছেন। যেমন গোল্ডস্মিথের (১৭২৮—১৭৭৪) *The Vicar of Wakefield* (১৭৬৬) উপন্যাসটি। ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর (১৮০২—১৮৮৫) *Notre-Dame de Paris* (১৮৩১), *Les Misérables* (১৮৬২) প্রভৃতি উপন্যাসে মানুষের দুঃখবেদনার প্রতি এক ধরনের আদর্শায়িত সহানুভূতি ও মানবপ্রেম অপূর্ব দীপ্তিতে ফুটে উঠেছে।

ফরাসী উপন্যাসের গৌরবের কালে সে যুগের ফরাসীদেশের দরিদ্র ও অবহেলিত সমাজের মর্মন্তুদ অবস্থাকে ভিত্তি করে যে সমস্ত বাস্তববাদী (realistic) এবং প্রাকৃতবাদী (naturalistic) উপন্যাস রচিত হয়েছে, তাতে অত্যন্ত উৎকটরূপে বাস্তব জীবনের স্থূল ও পীড়াদায়ক দিকটি উপস্থিত করা হয়েছে। বালজাক (১৭৯৯—১৮৫০), ফ্লোবেয়র (১৮২১—১৮৮০), এমিল জোলা (১৮৪০—১৯০২)—এঁরা সকলেই বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তদানীন্তন ফরাসীদেশের সমাজ ও চরিত্রের অধঃপতন ও নীচতাকে ফুটিয়ে তুললেও, উপন্যাস থেকে রোমান্টিকতা ও আদর্শায়িত তত্ত্ববাদকে সম্পূর্ণরূপে ছেঁটে বাদ দিতে পারেননি।

জোলা প্রধানত বালজাক ও ফ্লোবেয়রের দৃষ্টিভঙ্গিকে মূলমন্ত্র করলেও শেষ-জীবনের কোন কোন উপন্যাসে (*Les Quatre Evangiles*) নির্জলা তত্ত্বকথা ও নীতিউপদেশ প্রচার করতে কুণ্ঠিত হননি। অবশ্য সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে বাস্তববাদী ও প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকেরাও সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন বস্তুগতভাবে উপন্যাস রচনায় সব সময়ে সিদ্ধিলাভ করেননি। তাঁরাও এযুগের সমাজজীবন ও চরিত্রনীতির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, কখনও রোমাণ্টিকতা, কখনও-বা নীতি, আদর্শ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে এঁরা সকলের উপরে ছিলেন শিল্পী ; উপন্যাস রচনার পিছনে এঁদের মনোগত কোনো বিশেষ নীতি-তত্ত্ব থাক আর নাই থাক, এঁরা সর্বদা শিল্পীর প্রেরণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

আধুনিক যুগে রুশদেশের বিখ্যাত ঔপন্যাসিকেরা কখনও চরিত্রনীতি, কখনও সমাজনীতি, কখনও রাষ্ট্রনীতি, কখনও-বা অর্থনীতিকে ভিত্তি করে কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করেছেন—যার পিছনে আর্টের চেয়ে উদ্দেশ্যটাই প্রকট হয়ে উঠেছে। টলস্টয় (১৮২৮—১৯১০) মূলত চারিত্রনীতি এবং সজ্জীবনের অপাপবিদ্ধ আদর্শকে কেন্দ্র করে *War and Peace* (১৮৬২—৬৯), *Anna Karenina* (১৮৭৫—৭৭), *Resurrection* (১৯০০) প্রভৃতি উপন্যাসে মানবজীবনের মহৎ পরিণামের প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করে গেছেন ; ডস্টয়ভ্স্কির (১৮২১-৮১) *Crime and Punishment* (১৮৬৬), *Brothers Karamazov* (১৮৮০) প্রভৃতি উপন্যাসে মানবজীবনের প্রতি নির্যাতন থেকে করুণা ও প্রেমের মহত্তম বিকাশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পরবর্তী কালে রুশ-বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে যিনি বিপ্লবকে ভিত্তি করে উপন্যাসে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন তিনি হলেন ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮—১৯৩৬), যিনি তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নির্যাতিত মানবসঙ্ঘের মুক্তির বাণী ঘোষণা করেছেন। ইদানীং সমগ্র য়ুরোপ ও আমেরিকার ঔপন্যাসিকেরা, কেউ নির্জলা কামচেতনা ও অবচেতনার গূঢ় সংকেত ফুটিয়ে তুলবার জন্য উপন্যাস লিখছেন, কেউ অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীদ্বন্দ্বে জর্জরিত সমাজের নূতন চিত্র পরিকল্পনা করছেন, কেউ সূক্ষ্ম ব্যক্তিগত চৈতন্যের গভীর তমোগহ্বরে নেমে গিয়ে (যেমন অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী ফরাসী লেখকগোষ্ঠী) চেতনার অলক্ষ্যগোচর প্রবাহকে উপন্যাসে প্রতীকতার মাধ্যমে ব্যঞ্জিত করতে চাইছেন। উদ্দেশ্যমূলকতা

উপন্যাসকে দু'শ বছর আগে প্রভাবিত করেছিল। ইদানীং সমাজব্যবস্থা ও মানব-সভ্যতার নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও ঔপন্যাসিকেরা শুধু বস্তুগত ও ব্যক্তিচৈতন্যাতীত নিস্পৃহ রূপকল্পকে সব সময়ে অবধারণ করতে পারছেন না। দেশ, সমাজ, নীতি, আদর্শের দ্বারা তাঁরা কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও-বা পরোক্ষভাবে, প্রভাবিত হচ্ছেন, কেউ কেউ উদ্দেশ্যকে সরাসরি স্বীকার করে উপন্যাস রচনায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। তাঁদের উপন্যাসে উপদেশ, নীতি, তত্ত্ব, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অতি-প্রকটতার ফলে যে অল্পাধিক ক্ষতি হচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ সাময়িক উত্তেজনা শিল্পীর মনোজগতে বেশি প্রভাব বিস্তার করলে শিল্পী সৃষ্টির সাত্ত্বিকতাকে হারিয়ে সাহিত্য ছেড়ে মতপ্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 'প্রোপাগ্যাণ্ডা' অনেক সময়ে উপন্যাসের জাতিনাশ করে, গত অর্ধশতাব্দীর য়ুরোপীয় উপন্যাসের পরিণাম বিচার করলেই সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আমাদের বাংলা দেশেও উপন্যাসের গোড়ার দিকে প্রায় তাবৎ ঔপন্যাসিক বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও নৈতিক উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়েই উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে প্রমথনাথ শর্মা (১৭৮৭—১৮৪৮) যে কয়টি রঙ্গমূলক আখ্যান রচনা করেছিলেন ('নববাবু বিলাস' ১৮২৫; 'দূতীবিলাস' ১৮২৫; 'নববিবি বিলাস' ১৮৩১), তাতে নির্বাধ ব্যঙ্গবিদ্রূপ থাকলেও মূলত সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তিনি কলম ধরেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪—১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) প্রভৃতি আখ্যান ও উপন্যাসে সমাজ-হিতৈষণার প্রবল স্বর ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮—১৮৯৪), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৭—১৯০৯) এবং বঙ্কিম-শিষ্যেরা বিশেষ বিশেষ নীতি ও আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরেই বাংলা উপন্যাসে দেশাত্মবোধ ও সমাজ-সংক্রান্ত আদর্শের প্রচুর প্রভাব পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু উপন্যাসে নয়, বাঙালীর চিন্তার রাজ্যে নূতন আদর্শ স্থাপনের ব্রত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে উদ্দেশ্যমূলক নীতিবাদের জয়ঘোষণা উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। 'বিষ-বৃক্ষে'র (১৮৭৩) সমাপ্তিতে তিনি বলেছেন, "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।" তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' (১৮৭৮) বিধবা রমণীর অন্য পুরুষে আসক্তি নির্মমভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে।

'আনন্দমঠে' (১৮৮২) দেশাত্মবোধের প্রবল সুর, 'দেবীচৌধুরাণী'তে (১৮৮৪) নিষ্কামধর্মের পটভূমিকায় বাঙালী রমণীর গার্হস্থ্য আদর্শ, 'চন্দ্রশেখরে' (১৮৭৫) দ্বিচারিণী রমণীর কঠোর মানসিক প্রায়শ্চিত্ত, 'সীতারামে' (১৮৮৭) রূপান্ধ পুরুষের চিত্তবিভ্রমের চূড়ান্ত অধঃপতন খুব চড়া রঙেই আঁকা হয়েছে। এ সমস্ত উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ ও ব্যক্তি-চরিত্র পরিশোধনের ব্রত নিয়েছিলেন, কোথাও-বা আদর্শায়িত দেশপ্রেম ও মহত্তর জীবনকেই ফোটাবার জন্য লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। 'আনন্দমঠে'র প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই উপন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লিখেছিলেন, "বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।" 'দেবীচৌধুরাণী'র শেষাংশেও বঙ্কিমচন্দ্র আবেগকম্পিত কণ্ঠে আদর্শবাদের জয়ঘোষণা করে প্রফুল্লের মধ্য দিয়ে, শুধু নারীর নয়, সমগ্র জাতির নব-উজ্জীবন মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, "এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"—ইত্যাদি। 'চন্দ্রশেখরে' মৃত প্রতাপকে সম্বোধন করে বঙ্কিমচন্দ্রের বেদনাদীর্ণ কণ্ঠ প্রবল আবেগে অনুরণিত হয়েছে, "তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই সেইখানে যাও।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমস্ত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের অলংকারস্বরূপ। কিন্তু এর পিছনে তাঁর বিশেষ ধরনের উদ্দেশ্য ছিল, তা তিনি কখনও অস্বীকার করেননি। নিছক আর্ট সৃষ্টির জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি, একথা বঙ্কিমচন্দ্র মানতেন না। আবার জোলার মতো মানুষের প্রাকৃতজীবনকেই শিল্পের একমাত্র উপাদান বলেও গ্রহণ করেননি। উপন্যাসের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে নৈতিক ও সামাজিক নীতি-আদর্শের দ্বারা পরিশুদ্ধ করে তিনি মানুষের চিত্তবিশুদ্ধির দিকে অঙ্গুলিসংকেত করেছেন। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে উপন্যাস রচনায় প্রস্তুত হয়েও নিছক নীতি প্রচারকে তিনি শিল্পের শেষ পরিণাম বলে মানতে পারেননি। শিল্পের সঙ্গে উদ্দেশ্যের সম্পর্ক বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "কাব্যের উদ্দেশ্য

নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" (বিবিধ প্রবন্ধ ১ম, 'উত্তরচরিত') তাঁর 'চিত্তশুদ্ধি' এবং আরিস্টটলের 'ক্যাথারসিস্' প্রায় একই প্রকার। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবশিষ্য রমেশচন্দ্রও 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজে' (১৮৯৪) বিশুদ্ধ সামাজিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বঙ্কিম শিষ্যানুশিষ্যেরা তো সমসাময়িক নব্য হিন্দুধর্ম ও আচার-আচরণের পুনরুজ্জীবনের অভিপ্রায়ে রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি নিজস্ব আদর্শকে সামনে রেখে উপন্যাসের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। 'চোখের বালি'তে (১৯০৩) তিনি বিধবা নারীর অন্তরের কামনাকে সহৃদয়তার সঙ্গেই উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু কোনোও রূপ উগ্র মত বা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে শিল্পের অমর্যাদা করেননি। 'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) এবং 'চার অধ্যায়ে' (১৯৩৪) কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যের স্পষ্ট স্পর্শ পাওয়া যাবে। 'গোরা'-তে সংকীর্ণখাতে বহমান প্রধর্ষী জাতিপ্রেমের পরাজয় ও উদার মানবধর্মের উদ্বোধন, 'ঘরে-বাইরে'-তে উগ্র স্বাদেশিকতার পরিণাম এবং 'চার অধ্যায়ে' সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত আন্দোলনের ফলে মানবসম্পর্কের শোচনীয় পরিণতি দেখানো হয়েছে। 'গোরা' উপন্যাসের পরিশিষ্টে পরাভূত কিন্তু নব আদর্শে উদ্বুদ্ধ গোরা আনন্দময়ীর চরণ স্পর্শ করে আবেগোত্তপ্ত কণ্ঠে বলেছে, "মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।" এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার মূল কথা, আর সে কথাটি 'গোরা'র মধ্য দিয়ে অপূর্ব পরিণামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সমস্ত উপন্যাস শিল্প হিসেবে অতি মূল্যবান, কিন্তু এর পশ্চাদ্‌পটে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ধরনের নীতিপ্রাণতা অর্থাৎ উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল হয়েছিল তা স্বীকার করতে বাধা নেই।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক কালে শরৎচন্দ্র উপন্যাস রচনায় সম্পূর্ণ ভিন্নপথে যাত্রা করলেও বিশেষ ধরনের আদর্শায়িত মনোভাবকে ছাড়তে পারেননি। তাঁর

রচনার পশ্চাতেও উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা কোন শ্রমসাধ্য ব্যাপার নয়। তিনি ওয়াল্ট হুইটম্যান (১৮১৯—১৮৯২) বা ডস্টয়ভস্কির মতো সামাজিক দিক থেকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখবেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর উপন্যাসের পিছনে যে প্রবল রকমের নীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্য রয়েছে, তা তিনি নিজেও অস্বীকার করেননি, সমালোচকও অস্বীকার করতে পারেন না। ভ্রষ্টা নারীর নিষ্ঠা, দুষ্ক্রিয়াসক্তের আত্মত্যাগ ইত্যাদি সংক্রান্ত চরিত্রাদর্শের প্রবল সুর তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের মূল কথা। অবশ্য তাঁর শিল্পসৃষ্টির পশ্চাতে নীতি, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকলেও তিনি মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও মমতার জয়ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যেখানে তিনি নিছক উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়েছেন ('পথের দাবী', 'বিপ্রদাস'), সেখানে উপন্যাসের কলাশিল্প অল্পাধিক ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। তিনি প্রায় সব সময়ে উপন্যাসের যথার্থ আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং আদর্শ বা উদ্দেশ্যের পক্ষ নিয়ে ঘোষণা করে-ছিলেন, "এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুষ-সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্যসাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।" ('সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি')

এঁদের পরবর্তী যুগে কেউ কেউ (শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত) বিশুদ্ধ বাস্তব জীবনের বিষণ্ণ কাহিনীকে উপন্যাসে প্রাধান্য দিলেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা বিশেষ আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন, অবশ্য তাতে উপন্যাসের শিল্পকলা ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রচারধর্ম এত প্রভাব বিস্তার করছে যে, উপন্যাস শিল্পবস্তু না হয়ে অনেক স্থলেই সমাজের শ্রেণীবৈষম্য দূরীকরণের হাতিয়ারস্বরূপ হতে চলেছে। উদ্দেশ্য ও প্রচারধর্ম এতে প্রধান হয়ে উঠেছে বলে এর মধ্যে চির-কালীন মানবজীবনের সুরটি ঠিক বেজে উঠতে পারছে না।

উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বিশেষ তত্ত্ববাদ, জীবনদর্শন, প্রত্যয়, প্রত্যাশা নিশ্চয় থাকবে। বৈজ্ঞানিকসুলভ নিস্পৃহতা, নিজ সৃষ্টির প্রতি অনাসক্ত উদাসীনতা—এ ব্যাপার শিল্পসাহিত্যে যথার্থ শিল্পত্বলাভ করতে পারে কিনা সন্দেহের বিষয়।

উদ্দেশ্য শিল্পকে দাবিয়ে রাখলে উপন্যাসের কলাগত অপমৃত্যু অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমসাময়িক সমাজপরিপ্রেক্ষিত ও রাষ্ট্রনৈতিক উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে যাঁরা সেই আদর্শে উপন্যাস রচনা করেন, যুগের পরিবর্তনে এবং সমস্যার রূপান্তর ঘটলে এই ধরনের 'প্রোপাগ্যাণ্ডা'-ধর্মী উপন্যাসেরও মূল্যাবনয়ন ঘটতে পারে। একদা অতিশয় জনপ্রিয় 'বেস্ট সেলার' উপন্যাসও পরবর্তী কালে সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে, এরকম দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। সমসাময়িকতা ও উদ্দেশ্যমূলকতার প্রকট প্রচারধর্মিতা ছাড়িয়ে উঠতে না পারলে উপন্যাস কালজয়ীও হতে পারে না, সার্থক শিল্পবস্তুও হতে পারে না। অবশ্য ঔপন্যাসিকও সামাজিক জীব, রাষ্ট্রিক ব্যক্তি। তিনি সব সময়ে তাঁর সমকালীন দেশ-কাল-পাত্রকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেন না, বাঞ্ছনীয়ও নয়। তবে উপন্যাসের মূলে উদ্দেশ্য থাকলেও তা যদি স্থূল উদ্দেশ্যকে সংযত করে রাখতে পারে, তা হলে সে উপন্যাস শিল্প হিসাবে সব-যুগেই জনবল্লভ হবে। ফুলের মালার ডোরটি থাকে অলক্ষ্যে, ঔপন্যাসিকের বিশেষ নীতি, তত্ত্ব বা উদ্দেশ্য সেইভাবে প্রচ্ছন্ন হয়েই থাকবে।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উপকাহিনী : 'উপকাহিনী'র সাধারণ অর্থ ছোট কাহিনী। 'উপকথা' ও 'উপকাহিনী' এই শব্দ দুটির অর্থগত সাদৃশ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এরা ভিন্ন। বস্তুত 'উপকাহিনী' অর্থে একটি বিশেষ রীতি বা রূপবন্ধ বোঝায় এবং তা ইংরেজী subplot রীতিটির সমার্থক। উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রে উপকাহিনী বিশিষ্ট অর্থে যুক্ত। মূল কাহিনীর (plot) সঙ্গে উপকাহিনীর (subplot) সম্পর্ক উপন্যাসের মৌলিকশক্তির উপর নির্ভর করে। গোষ্ঠী বা একাধিক-ব্যক্তিপ্রধান উপন্যাসে উপকাহিনীর স্থান প্রায়-নির্দিষ্ট। কেননা, উপকাহিনী সাধারণত একটি কাহিনীকে ঘটনা, পরিবেশ ও সমস্যা অনুযায়ী বিকশিত করে তোলে। ঘটনাপ্রধান উপন্যাসগুলিতে যেহেতু চরিত্রগুলি বিশেষ ক্রিয়াশীল সেহেতু তাদের কাহিনীনির্মাণের সুযোগও অধিক। কিন্তু বর্ণনাধর্মী উপন্যাসে ক্রিয়াশীলতা এবং ঘটনার বিবর্তন স্বল্প বলেই সেখানে উপকাহিনীও তেমন সৃষ্ট হয় না। যেমন 'শেষের কবিতা'র লিলি-কেতকী-অমিতের কাহিনী।

উপকাহিনীর মৌল দায়িত্ব প্রধান কাহিনীটিকে শিল্প-পরিণতি দেওয়া। মূল কাহিনীটির সূত্রপাতের পর তাকে বিভিন্ন ঘটনাস্রোত ও বিচিত্র পরিবেশে উপস্থিত করে বিশেষ একটি বা কয়েকটি মানুষের জীবনের পরিচয় দেওয়া উপ-

কাহিনীর মুখ্যকাজ। এই পরাশ্রিত ভিত্তির ফলে উপকাহিনী অধিকাংশ স্থলে অসম্পূর্ণ থাকে। কোথাও এই অসম্পূর্ণতার কারণ লেখকের ঔদাসীন্য, কোথাও অনিবার্য শিল্প-পরিণতির সতর্ক প্রয়াস। অবশ্য কোথাও কোথাও উপকাহিনী সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আবেদনের ক্ষেত্রে মূল কাহিনীর চেয়ে বেশি আকর্ষণ করে এমনকি উপকাহিনী তার সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেও মৌল কাহিনীর পাশে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের 'আয়েষা' ও 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের 'মতিবিবি'র কাহিনী একথার উদাহরণ। আবার 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখী-কুন্দ-নগেন্দ্র-কাহিনীর পাশে হীরার ভালোবাসার কাহিনী উপন্যাসের সব দায়িত্ব পালন করেও অনিবার্য শিল্প-পরিণতি পায়নি।

কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর পার্থক্য পরিমাণ ও পরিসরগত। বস্তুত কাহিনী ও উপকাহিনী সপ্রকৃতিক ও সজাতীয়। স্বভাবতই কাহিনী সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাগুলি উপকাহিনীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পাঠকের দিক থেকে এ আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক যে উপকাহিনীটি গল্প হিসাবে পরিবেশিত হবার অধিকারী কিনা এবং এই প্রশ্ন থেকে নূতন জিজ্ঞাসা জাগতে পারে যে মূল কাহিনীকে পরিণতি দেবার সুযোগ ও অবসর সেই কাহিনীতে কতখানি আছে। এই সঙ্গে উপকাহিনীটি যেন যুক্তিসিদ্ধ ঘটনাপরম্পরায় বিধৃত হয়। উপকাহিনীর সমস্ত ঘটনাগুলি যেন বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়ে শুধু নবত্বই নয়—পাঠকের রসচৈতন্যকে জাগ্রত করতে পারে।

উপকাহিনী শিথিল হতে পারে কিংবা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। অবশ্য তা নির্ভর করে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনা-কৌশলের উপর। মূলকাহিনীর শিথিলতা বা জটিলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকাহিনীর উপর নির্ভরশীল। মৌল কাহিনীটি যদি স্বভাবের দিক থেকে সরল বা জটিল হয়, সেই সরলতা এবং জটিলতার পরিণতি অনুযায়ী উপকাহিনী তার নিজস্ব স্বভাবের রূপ পরিবর্তন করে। অবশ্য সমস্ত কাহিনীই ঘটনানির্ভর এবং ঘটনার গুরুত্ব ও জটিলতা অনুযায়ী কাহিনীর গ্রন্থি কোথাও শিথিল কোথাও ঘনবদ্ধ, কোথাও-বা অসংলগ্ন। উপকাহিনীও তাই মূলকাহিনীর গুরুত্ব ও জটিলতা অনুযায়ী বিশিষ্টতার অধিকারী।

কাহিনীর ঐক্য যেমন একটি ঘটনা বা চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয় না—উপকাহিনীরও তেমনি। একাধিক ঘটনা ও চরিত্রের সূত্রে গ্রথিত হয়ে

বিবর্তিত ও রূপময় হয়ে ওঠে একটি ঘটনা বা চরিত্র এবং সেই ঘটনাগুলি ও চরিত্রগুলির সমন্বয়েই কাহিনীর ঐক্য। উপকাহিনী শুধু এই ঘটনামালার অনিবার্য সূত্রই নয় তারও নিজস্ব একটি গতি ও রূপ আছে।

মিহিরকুমার দাশ

উপন্যাস ও কবিতা—দ্র. কবিতা ও উপন্যাস।

উপন্যাস ও ছোটগল্প : ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে এড্গার অ্যালেন পো বলেন, ছোটগল্প হলো গদ্যে লেখা এমন কাহিনী যা পড়তে আধঘণ্টা থেকে এক বা দু'ঘণ্টা সময় লাগে। অর্থাৎ আর একটু ঘুরিয়ে বলা চলে যে, সেই গল্পই ছোটগল্প যা এক বৈঠকে বসে পড়ে ফেলা চলে। এ তো গেল দৈর্ঘ্যের কথা। গল্পের বিষয়বস্তু কি হবে ?

নিঃসন্দেহে তা জীবন। ছোটগল্প জীবনের খণ্ডচিত্র ? জীবনের কোন বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে অভিজ্ঞতার এক-একটি মোড়ক যখন হঠাৎই উন্মুক্ত হয়, গল্পকারের মনের দিগন্তে জীবনের কোন দিক কিংবা অংশ যখন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আকস্মিক ঝলসে ওঠে তখনই সেই অস্পষ্টালোকের প্রায়ান্ধকারে জন্ম নেয় ছোটগল্প। বিষয়বস্তুর নির্বাচন তো তাৎক্ষণিক। এখন প্রয়োজন শুধু বস্তুকে ছাঁদে (plot) ফেলে শিল্পরসে মণ্ডিত করে ঘনসংবদ্ধ এক অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া।

ছোটগল্প শুধুমাত্র যে জীবনেরই খণ্ডরূপ, কেবলমাত্র জীবনেরই খণ্ডচিত্রের প্রকাশক তাই-ই নয়, যা কিছু জীবনের তথা অভিজ্ঞতার প্রান্তসীমায় ধরা পড়ে, তাই ছোটগল্পের উপজীব্য বিষয়।

কিন্তু ছোটগল্পে বিষয়বস্তু কি এক বা একাধিক ? এ বিষয়ে স্থির বক্তব্য, গল্পকার গল্পে শুধু একটিমাত্র ঘটনাকে সুসমঞ্জস পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। হথর্ন এবং পো, যাঁদের হাতে আধুনিক ছোটগল্প পরিচ্ছন্ন শিল্পরূপ ধারণ করেছে তাঁদের পূর্বে একটিমাত্র ঘটনার সুসমঞ্জস পরিণতি যেসব গল্পে আমরা লক্ষ্য করি তন্মধ্যে ডিফো-র 'The Apparition of Mrs. Veal', অ্যাডিসন্-এর 'The Vision of Mirza', অস্টেন-এর 'Peter Rugg', 'The Missing Man' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু আধুনিক ছোটগল্প শুধুমাত্র প্রতীতিগত ঐক্যসর্বস্বই নয়। তার মধ্যে

শব্দের মিতব্যয়িতা, প্রয়োগপদ্ধতির একনিষ্ঠতা, বক্তব্য বিষয়ের বাহুল্যহীনতা, গল্পের সামগ্রিক সুরের একতা, উপযুক্ত পটভূমির ব্যবহার, চরিত্রচিত্রণে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ইত্যাদিও দেখা যায়।

অন্যদিকে দেখি, গল্প যেমন জীবনের বা অভিজ্ঞতার খণ্ডচিত্রের প্রকাশক, উপন্যাস তেমনি জীবনের বা অভিজ্ঞতার সামগ্রিকরূপকে প্রকাশ করে। সর্বযুগে সর্বকালে আবেগ ও প্রবৃত্তিতাড়িত থরোথরো জীবন ও কর্মের পশ্চাদ্‌পটে পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি দুর্নিবার কৌতূহল ও মিলনের আকূতি উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। তাই উপন্যাসের পরিসরের ব্যাপ্তি জীবনের ব্যাপ্তিও সূচনা করে। এই বৃহৎ পরিসরে চরিত্রের মানসিক জটিলতা, দ্বন্দ্ব, প্রেম, হিংসা, ঘৃণা, লোভ, ক্রূরতা, নীচতা ইত্যাদি পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করে ধরেন ঔপন্যাসিক এবং তাতে জীবনের প্রচণ্ড সম্ভাবনা ও ক্ষয়ের প্রতি ইঙ্গিতও থাকে সুস্পষ্ট।

উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্য তবে কি শুধু এই? নিঃসন্দেহেই তা নয়। উপন্যাস ও গল্পের বিষয়বস্তু ও শিল্পরূপের আলোচনায় যে পার্থক্যগুলি বিশেষ করে চোখে পড়ে তা হলো—

১. গল্পের একটা নিজস্ব ছক আছে। নাটক সম্পর্কে যেমন, গল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি আরিস্টটল-এর বক্তব্য প্রযোজ্য। তাঁর মতানুসারে বলা চলে গল্পেরও আদি-মধ্য-অন্ত অবশ্যই থাকতে হবে। আধুনিক সমালোচনার ভাষায় একে বলা চলে 'Preliminary situation, the complication of the threads of the plot & the Resolution of the complexity i.e., the solution of the problem the writer has set up'. কিন্তু এই ধরাবাঁধা ছাঁদের সীমিত গণ্ডীর বাইরে যাবার একটা প্রবণতা আধুনিক গল্পকারদের মধ্যে দেখা যায়। গুচ্ছগল্প (story sequence) লেখার চেষ্টা এই গণ্ডি অতিক্রম-অভিলাষেরই ফল। স্টিভেনসন্-এর *New Arabian Nights* এবং কনান্ ডয়েল-এর *Sherlock Holmes* এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এ ছাড়া গল্প রচনার সময়ে যে প্রধান উপাদানগুলি অনিবার্যভাবে প্রয়োজন হয় তা হলো, প্লট বা ছাঁদ, চরিত্র, সংলাপ, সময় ও ঘটনাস্থল, পরিবেশ (atmosphere) ও গল্পের সামগ্রিক সুর (বিয়োগান্ত বা মিলনান্ত) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। এর সঙ্গে মিশে থাকে গল্পকারের জীবন সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি।

মোটামুটিভাবে উপন্যাসেও এ নিয়ম ও উপাদানগুলি লক্ষ্য করা যায়।

২. বিষয়বস্তুর দিক থেকে বলা যায়, গল্পে মানব চরিত্রই একমাত্র উপজীব্য বিষয় নাও হতে পারে। হয়ত-বা কোথাও কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের কিংবা নিয়তির অমোঘ শক্তির প্রকাশ দেখানো হয়, কখনও মানব জীবনের প্রবৃত্তি-বিশেষের চিত্র যেমন, ঘৃণা, ভয়, ঈর্ষা, কুসংস্কার, কর্তব্যপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদির চিত্র অঙ্কন করা হয়, আবার কোথাও-বা প্রাণীজগতের প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ থেকে জন্ম নেয় গল্প। এক কথায় গল্পের কোনো ধরাবাঁধা বিষয় নেই। গল্পকারের সৃষ্টির প্রেরণা-মুহূর্তে যে-কোনো বিষয় অলৌকিক সৌন্দর্য ও নিগূঢ় অর্থ বহন করে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে কবির ভাষায় 'a local habitation and a name' গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু উপন্যাসে মানব চরিত্রের বিশ্লেষণই মুখ্য। অন্যান্য বিষয় যতদূর এই বিশ্লেষণের কিংবা চরিত্রের গূঢ় জটিলতা উদ্ঘাটনের সহায়ক ততদূর পর্যন্তই গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষ্য এখানে স্থির অনির্বাণ শিখার মতো প্রজ্জ্বলিত অর্থাৎ প্রবৃত্তির সংঘাতে বিক্ষুব্ধ, অস্থির, অতি জটিল মানব মনের উদ্ঘাটন।

৩. গল্প দেহের একটা নির্দিষ্ট কাঠামো আছে, এ কথা আগেই বলেছি। এই নির্দিষ্ট কাঠামো বা ছাঁদ থাকার ফলে গল্পে গল্পকারের স্বাধীনতা কম। স্বল্প-পরিসরে নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করতে হয় বলে সামগ্রিক জীবন গল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে না। একটি মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গ কিংবা অভিজ্ঞতার দ্যুতি থেকে গল্প জন্ম নেয়।

অন্যদিকে ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতা অপরিসীম। উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে জীবনের সামগ্রিক রূপকে ফুটিয়ে তোলা সহজ। তদুপরি এক্ষেত্রে বাঁধাধরা নির্দিষ্ট কোন ছক না থাকায় ঔপন্যাসিকের গতি স্বচ্ছন্দ এবং সহজ।

৪. ছোটগল্পে থাকে একটিমাত্র প্রতীতি বা বিষয়ের অভিব্যক্তি। বহু বিষয়ের বা বহুতর উপাদানের সমাবেশ এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। কিন্তু উপন্যাসে বহুতর উপাদানের সমাবেশই লক্ষণীয়। ঔপন্যাসিক এইসব বিভিন্ন উপাদানকে একসঙ্গে গ্রথিত করে একটা সামগ্রিক ঐক্য দান করেন। ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাস অনেক জটিল। এখানে বহুতর মানুষ বহুতর অভিজ্ঞতার রংমশাল জ্বালিয়ে পথ চলে এবং ঔপন্যাসিক এই 'বহুত্ব'কে আশ্চর্য কলানৈপুণ্যে ঐক্য দান করেন। জীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমাবেশ সত্ত্বেও উপন্যাসে এই বর্ণসংকর মিছিল

অসংলগ্ন কয়েকটি অংশে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি সংবদ্ধ রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

জর্জ এলিঅটের 'সাইলাস মারনার'-এ দেখি কেমন করে একজন মানুষ তার প্রায়-হারানো হৃদয়কে একটি শিশুর অনাবিল স্নিগ্ধ প্রভাবের সান্নিধ্যে এসে ফিরে পেতে পারে, আত্মাকে বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এই একই বিষয় নিয়ে ব্রেট হার্ট তাঁর 'দি লাক্ অফ রোরিং ক্যাম্প' গল্পটি লিখেছেন। কিন্তু যেহেতু গল্পকারকে 'ইমপ্রেসনিস্ট' হতে হবে, সেই কারণেই দেখি ব্রেট হার্ট এখানে চূড়ান্ত পর্বের কাছাকাছি দু' একটি ঘটনাকে বেছে নিয়ে এবং বাকি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিতে আভাস দিয়ে অতি দ্রুত তাঁর বক্তব্য বিষয়ে সত্যের প্রত্যয়-নিষ্ঠ ধারণায় পৌঁছেছেন।

৫. ছোটগল্পের স্বল্পপরিসরে জীবনের ব্যাপ্তিকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এর ফলে চরিত্রচিত্রণও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। চরিত্রের শুধুমাত্র একটি বিশেষ দিক বা প্রবণতা উদ্ঘাটিত হয়। কিন্তু উপন্যাসের বিস্তারই পূর্ণাঙ্গ চরিত্রচিত্রণের সহায়ক। ফলে চরিত্রচিত্রণ উপন্যাসে যত ব্যাপক, ছোটগল্পে তার সুযোগ ততই সীমিত। ছোটগল্পে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটি চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যতটুকু প্রকাশ ঘটতে পারে গল্পকার তাই আমাদের দেখান। উপন্যাসে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখানো হয় চরিত্রের বিবর্তন, আর ছোটগল্পে চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি চরিত্রকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় তারই চিত্র উপস্থাপন।

৬. ছোটগল্পে প্লট থাকে একটিই। কিন্তু উপন্যাসে প্রধান প্লট ছাড়াও আরও এক বা একাধিক প্লট প্রধান প্লটের সমান্তরালে চলতে পারে কিংবা প্রধান প্লটের বৈপরীত্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে পারে। এইসব অপ্রধান প্লটের এক বা একাধিক চরিত্র আবার প্রধান প্লটেও অংশগ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে প্রধান প্লটের সঙ্গে অন্যান্য প্লটের ঐক্যবদ্ধ যোগসূত্র স্থাপনে সাহায্য করে।

৭. উপন্যাস ও ছোটগল্পে উৎসের ঐক্য, ঘটনার ঐক্য, এবং ভাবের ঐক্য লক্ষ্য করি। কিন্তু ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে এখানে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ছোটগল্পে বিষয়বাহুল্য নেই। একটিমাত্র বিষয়েই গল্পকার নিবদ্ধ-দৃষ্টি এবং এই একটিমাত্র বক্তব্য বিষয়কে তিনি সম্পূর্ণ গল্পের ভিতর দিয়ে যুক্তিপূর্ণ উপসংহারে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত গল্পকারের লক্ষ্যও এখানে প্রয়োগপদ্ধতির নিভুল রূপায়ণে স্থির, অচঞ্চল। সকল শ্রেষ্ঠ গল্পেই ঐক্যের এই অনিবার্যতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে এত বিভিন্ন উপাদান এক-

সঙ্গে গ্রথিত করা চলে যে অনেক সময় সেখানে প্রধান কেন্দ্রীয় ঐক্যের সুরকে সহজে ধরাই যায় না, বিশেষত বিশ্লেষণান্তে যখন কখনো কখনো সুস্পষ্টরূপে দুই বা ততোধিক আকর্ষণীশক্তি ধরা পড়ে। কিন্তু ছোটগল্পে স্থির লক্ষ্যের এ জাতীয় অসংলগ্নতা দেখা যায় না।

৮. ছোটগল্প যেহেতু আকারে সংক্ষিপ্ত সেজন্য শব্দের মিতব্যয়িতা অবশ্য পালনীয়। উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে এ জাতীয় শব্দের মিতব্যয়িতা রক্ষার প্রয়োজন স্বল্প। এছাড়া গল্পকারকে রচনাকালে বর্ণনায় কিংবা অন্য যে কোন আলোচনায় বিস্তারিত বাহুল্য বর্জন করতে হয়। যা কিছু অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক মনে হবে, গল্পকারকে তাহ নির্মমভাবে বাদ দিতে হবে, গল্পের পরিপ্রেক্ষিতটুকুকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে, গল্পের ক্রম-অগ্রসরমান ধাপগুলোকে যথোপযুক্ত মূল্য ও গুরুত্ব দিতে হবে, এবং বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে অতি সতর্কতার সঙ্গে সমগ্র গল্পের মূল বিষয় ও সুরের মধ্যে মিলিয়ে দিতে হবে। উপন্যাসে একাধিক কাহিনীর বিস্তারে এবং বিরুদ্ধভাবের সম্মিলনে অনেক অনাবশ্যকও সহজে স্থান করে নেয়।

অভিথ ভট্টাচার্য

উপন্যাস ও নাটক : সাহিত্যে নাটকের আবির্ভাব উপন্যাসের পূর্ববর্তী, উভয়ের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, সেজন্য উপন্যাসের আবির্ভাবের পর নাটক যে কোনদিক দিয়ে জনপ্রিয়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তা নয়। তবে নাটক আর উপন্যাস উভয়ের ভিত্তি বাস্তব-জীবন, উভয় ক্ষেত্রেই কল্পনার আতিশয্য বর্জনীয়। উভয়ই সামগ্রিক জীবন-ভিত্তিক কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হয়ে থাকে, উভয়ই বিয়োগান্তক এবং মিলনাত্মক দুই-ই হতে পারে। তবে নাটকের কাহিনী এবং উপন্যাসের কাহিনী পরিবেশনে পার্থক্য আছে। নাটকের মধ্যে কাহিনীর যেমন একটা দ্রুতসঞ্চারী গতি লাভ ক'রে স্থান, কাল ও উদ্দেশ্যগত এক অখণ্ড ঐক্য রক্ষা করবার প্রয়োজন হয়, উপন্যাসে তার প্রয়োজন হয় না, উপন্যাসের কাহিনী ধীর মন্থরগামিনী হতে পারে, আবার দ্রুত সঞ্চারিত গতিও লাভ করতে পারে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনীতে যে নাটকীয় গতি অনুভব করা যায়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে তার অভাব বোধ হয় ; কিন্তু তার জন্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসকে দোষাবহ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে বিশেষ গুণ-সম্পন্ন বলে কিছুতেই নির্দেশ করতে পারা যায় না।

স্বাধীন সাহিত্যরূপে নাটকের একটা প্রধান ত্রুটি এই যে, নাটক হলো মঞ্চ-নিয়মের অধীন, অভিনয়ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে নাটকের পরিপূর্ণ সাফল্য প্রকাশ পেয়ে থাকে, অভিনয় ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সাহিত্যের বিষয় হিসাবে নাটক গণ্য হতে পারে না। সাম্প্রতিক কালে নাটককে উপন্যাসের মত কেবলমাত্র পাঠ্য করবার জন্য উপন্যাসের নিয়মে কোন কোন দেশে রচিত হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মঞ্চের সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে নাটক রচিত হয় না। যেদিন নাটক মঞ্চনিরপেক্ষ হয়ে রচিত হবে, তা আর নাটক থাকবে না, তা সম্পূর্ণই উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত হবে। সুতরাং নাটককে মঞ্চব্যবস্থা, অভিনয়ক্রিয়া, মঞ্চোপকরণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিশেষ প্রতিভার দ্বারা নাটক মঞ্চে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, এদের সে গুণ না থাকলে উৎকৃষ্ট নাটকও দর্শকের কাছে কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু উপন্যাসে এই প্রকার কোন বহির্মুখী উপকরণ বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবার প্রয়োজন হয় না। উপন্যাস সম্পূর্ণ স্বাধীন রচনা, কোন বহির্মুখী বিষয়েরই মুখাপেক্ষী রচনা নয়। বিশ্বজগতের বিচিত্র জীবন-লীলা এর অঙ্গীভূত। এমন কি নাটকের জগৎটি এর মধ্যে থেকে বাদ যায় না। কেউ-কেউ উপন্যাসকে 'Pocket theatre' বলেছেন ; কারণ এর মধ্যে কেবলমাত্র যে বিষয়বস্তু এবং অভিনেতাই আছে, তা-ই নয়, এতে নাটক পরিবেশন করবার জন্য যেসব-উপকরণ আবশ্যক, যেমন, দৃশ্যপট, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সবই আছে। নাটক যেমন কেবলমাত্র মঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ, উপন্যাস তেমন কোন গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সমগ্র পৃথিবী এর ঘটনা-স্থল, বিস্তৃত মনুষ্য-জীবনে এর লীলাভিনয়, জীবনের অপ্রত্যক্ষ এবং নিগূঢ় রহস্যপথেও এর নিঃশঙ্ক অভিসার ; এর পথ পদে পদে সঙ্কুচিত নয়, দ্বিধাগ্রস্ত নয়, এর যাঁরা রচয়িতা, তাঁরা সব বিষয়েই স্বাধীনতার উল্লাস উপভোগ করে থাকেন।

নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ-করবার সুযোগ পাই, উপন্যাসে তা পাই না ; সেজন্য নাটক যতখানি জীবন্ত বলে মনে হয়, উপন্যাস তত হয় না। উপন্যাসে সেই জীবন্তভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্য বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, বর্ণনার সরসতা এবং বাস্তবগুণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের ঘটনা এবং চরিত্রও জীবন্ত বলে বোধ হয়। অনেকে মনে করেন, উপন্যাসের মধ্যে এই গুণ যতই সার্থকভাবে বিকশিত হতে থাকবে, ততই নাটক সম্পর্কে

আমাদের কৌতূহল দূর হয়ে গিয়ে তা উপন্যাসের উপর ন্যস্ত হবে। অনেকে এমনও মনে করেছেন যে, ইতিমধ্যে উপন্যাস বহুলাংশে নাটকের স্থান অধিকার করে নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও নেবে। কিন্তু এই দাবি বিচারসাপেক্ষ। নাটকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে তার জায়গায় উপন্যাস জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, অথবা অন্য কোন কারণে উপন্যাসের জনপ্রীতি বাড়ছে, তা গভীরভাবে বিচার করে দেখা আবশ্যক। এখানে তার অবকাশ নেই, কিন্তু সংক্ষেপে এখানে একথা বলা যেতে পারে যে, নাটক এবং তার অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে এমন কতকগুলো মৌলিক বিষয় প্রকাশ পায়, যা উপন্যাস দ্বারা কখনও পূর্ণ হতে পারে না। অবশ্য আধুনিক-কালের লেখকেরা রচনার দিক দিয়ে কোন শাসন কিংবা নিয়ম স্বীকার করবার পক্ষপাতী নন। আবার উপন্যাস রচনায় তেমন কোন শাসন কিংবা নিয়ম স্বীকার করে চলবার আবশ্যক হয় না, এর রচনায় সুনির্দিষ্ট বাঁধাধরা কোন নির্দেশ নেই, এই বিষয়ে লেখক এতে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ করতে পারেন। বর্তমান যুগ সর্বসংস্কারমুক্ত এই স্বাধীনতা উপভোগেরই যুগ। কিন্তু নাটক রচনা বিষয়ে ইউরোপীয় সাহিত্যেই হোক, কিংবা ভারতীয় সাহিত্যেই হোক, সুপ্রাচীনকাল থেকেই কতকগুলি কঠিন নিয়ম অনুসরণ করে চলবার নির্দেশ দেওয়া হয়ে আসছে। এইসব নিয়মের নির্দেশ চোখের সামনে থাকবার ফলে সাহিত্য-সৃষ্টির ধারায় কোন-কোন যুগে এসে নাট্যরচনা স্তিমিত এবং প্রাণশক্তিহীন হয়ে পড়ছে, কিন্তু তা-সত্ত্বেও যুগোচিত শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় তা নতুন প্রাণে উজ্জীবিত হয়ে উঠছে। সাহিত্য-সৃষ্টির আদিকাল থেকে যুগে-যুগেই নাটক রচিত হয়েছে এবং নাট্যরচনার মধ্যে দিয়ে কোন কোন জাতির বিশিষ্ট মনীষার বিকাশ হয়েছে। সুতরাং সহস্র বৎসরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসে আজও যে সাহিত্য-রূপ তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারছে, তা উপন্যাসের মধ্যে আত্মবিলোপ করে দেবে, এমন আশঙ্কা করবার কোন কারণ দেখা যায় না। নাটকের যে একটা বিশিষ্ট প্রয়োগক্ষেত্র আছে, তা উপন্যাস কোনদিনই অধিকার করতে পারবে না। এর শাসন যত কঠিনই হোক, এর মঞ্চনির্ভরতা না-ই থাকুক, তবু নাটক দৃশ্যকাব্য, তা-উপন্যাসের মত শ্রব্য কিংবা পাঠ্যমাত্র নয়; সুতরাং দৃশ্য এবং পাঠ্যের যে পার্থক্য তা কখনো দূর হবে না।

তবে একথা সত্য, 'The drama is the most rigorous form of

literary art ; prose fiction is the loosest' অর্থাৎ নাটক রচনায় অত্যন্ত কঠিন নিয়ম পালন করবার আবশ্যক হয়, উপন্যাস রচনায় এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা ঔদাসীন্য প্রকাশ পায়। সুনির্দিষ্ট নিয়ম বিষয়ে ঔদাসীন্যের মধ্য দিয়েই সর্বনাশের বীজটি এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। কারণ, সুকঠিন নিয়মের নিগড় অনেক সময় সাহিত্যসৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্তি বিনষ্ট করে দেয় সত্য, নিয়মের একান্ত অভাবও এর মধ্যে এমন এক উচ্ছৃঙ্খলার প্রশ্রয় দেয় যে, তাতে যথার্থ সৃষ্টিকর্ম সার্থক হতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতা কখনও উচ্চভাবাপন্ন সাহিত্যসৃষ্টির সহায়ক হতে পারে না, কোন নিয়ম স্বীকার না করবার নীতি একে যখন স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষেত্রে উৎক্ষিপ্ত করবে, তখনই এর বিষয়ে আশঙ্কার কারণ দেখা দেবে। এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, নাটকের নিয়মগুলি কঠিন হলেও যুগে যুগে তার যুগোচিত পরিবর্তন বা সংস্কার কখনও অস্বীকৃত হয়নি। গ্রীক নাটকের যে নিয়ম ছিল, এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটকে তা সম্পূর্ণ স্বীকার করা হয়নি, ভিক্টোরীয় যুগে এলিজাবেথীয় যুগের নীতি অনুসরণ করা হয়নি, এমনকি, জর্জীয় যুগের জন্যও নতুন আদর্শ গঠিত হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে যে বিধি-নিষেধই থাকুক না কেন 'মৃচ্ছকটিক' কিংবা 'কর্পূরমঞ্জরী'তে সেই কঠিন নিয়মও অস্বীকার করা হয়েছে ; এমনকি, ভাসের সংস্কৃত নাটকও সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী রচিত হয়নি। সুতরাং নিয়ম থাকলেই যে তা কঠিন হয়ে ওঠে, তা নয়, যুগের দাবিতে নিয়মের আপনা থেকেই ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয়। একদিন আমাদের দেশে নাটগীত বা যাত্রা ছিল, তা কৃষ্ণ-যাত্রা হলো, তারপর তা নতুন যাত্রা হলো, তারপর তা ক্রমে গীতাভিনয়, পৌরাণিক যাত্রা, স্বদেশী যাত্রা ও সামাজিক যাত্রার রূপ গ্রহণ করল। সুতরাং নাটকের ভাবই যে কেবলমাত্র যুগের সঙ্গে তাল রক্ষা করে চলে, তা নয়, আঙ্গিক এবং যুগোপযোগী পরিবতনকে স্বীকার করে নিয়েই তা বিকাশ লাভ করে। তথাপি একটা মৌলিক নীতি সর্বদাই অপরিবর্তিত থেকে যায়। উপন্যাসের মতো কোন নিয়মকেই যদি নাটকে স্বীকার না করা হয়, তবে তার ভবিষ্যৎ যে কেমন হবে, তা কেউ কোনদিন অনুমান করেও বলতে পারবে না। সুতরাং উপন্যাস সম্পর্কে আমরা যে আশাই আজ পোষণ করি না কেন, এর ভবিষ্যৎ পরিণাম যে কি, তা বলতে পারা যাবে না।

সম্প্রতিকালে আর একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার তাৎপর্য একটু বিশ্লেষণ

করে দেখা যেতে পারে। মঞ্চ এবং সবাক্‌চিত্রে অভিনয়ের জন্য অনেক সময় কোন খ্যাতনামা উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়ে থাকে। নাট্যান্তরণের মধ্য দিয়ে এদের উপন্যাসিক গুণ কতদূর রক্ষা পায়, তা বিবেচনা করে দেখা আবশ্যক। বাংলায়ও উপযুক্ত নাটকের অভাববশত অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়, কোন কোন সুপরিচিত উপন্যাসকে নাট্যরূপে পরিবর্তিত করে তাদের অভিনয় করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রথম থেকে নাট্য-রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন কোন উপন্যাস বা ছোটগল্পকে স্বয়ং নাট্যরূপে পরিবর্তন করেছিলেন, শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেই তাঁর কয়েকখানি উপন্যাস নাট্যরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রায় সব ক'খানি উপন্যাসই নাট্যরূপে পরিবর্তিত হয়ে রঙ্গমঞ্চেই হোক, কিংবা ছায়াচিত্রেই হোক, অভিনীত হয়েছে। আধুনিক কথাসাহিত্যিকদেরও এই ধরনের বহু উপন্যাস এবং ছোটগল্প প্রতিনিয়তই নাট্যাকারে পরিবর্তিত হয়ে সর্বত্র অভিনীত হচ্ছে। কথাসাহিত্যের এইসব নাট্যরূপ কেবলমাত্র অভিনয়কার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে; ব্যবসায়ীই হোক, কিংবা শৌখিনই হোক, রঙ্গমঞ্চের সীমা অতিক্রম করে এদের আর কোন মূল্য প্রকাশ পায় না, এদের মৌলিক অর্থাৎ উপন্যাস কিংবা ছোটগল্পের রূপ সাধারণের মধ্যে প্রচারিত থাকে; কথাসাহিত্যের নাট্যরূপ পাঠকসমাজে প্রচার লাভ করতে পারে না, তার প্রয়োজনও হয় না। বিগত একশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যে অগণিত নাটক রচনা হওয়া সত্ত্বেও সার্থক অভিনয় করবার প্রয়োজন বোধ করলে বার বার কথাসাহিত্যের দ্বারস্থ হবার যে প্রয়োজন হয়, তা থেকেও কথাসাহিত্যের তুলনায় বাংলা নাটকের দৈন্যের কথা বুঝতে পারা যাবে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্নের উদয় হয়, উপন্যাসকেই নাট্যরূপ দিয়ে নাটকের অভাব কতদূর পূর্ণ করা যেতে পারে এবং কথাসাহিত্যিক যে কাহিনী উপন্যাসরূপে সৃষ্টি করে থাকেন, তা নাট্যধর্মী করে তোলা কতদূর সম্ভব হয়?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একটা কথা প্রথমেই স্বীকার করতে হয় যে, কোন-কোন ঔপন্যাসিকের কিংবা কথাসাহিত্যিকের কাহিনী-পরিকল্পনার মধ্যে অনেক সময় নাটকীয় গুণ প্রকাশ পেয়ে থাকে, কিন্তু মূলত উপন্যাস নাট্যধর্মী রচনা নয়। কথাসাহিত্যের একটা স্বতন্ত্রধর্ম আছে, তা নাটকের ভিতর দিয়ে যথার্থ বিকাশ লাভ করতে পারে না। সুতরাং যা উপন্যাসের বিষয়বস্তু, তা একান্তভাবে

নাটকের মধ্যে গৃহীত হতে পারে না। তবুও কোন কোন উপন্যাসের মধ্যে ঘটনা-বাহুল্য কিংবা নাট্যিক ক্রিয়ার (action) প্রাধান্য দেখা যায়, কিন্তু তা যে সম্পূর্ণ নাট্যধর্মী তা সর্বদা বলা যায় না। কোন কাহিনীতে ঘটনার বাহুল্য থাকলেই, তা নাটকের উপযোগী হয় না ; বিশিষ্ট প্রকৃতির ঘটনাই নাটকের উপজীব্য, ঘটনামাত্রেই নাটকের উপজীব্য নয়। বরং আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকে দেখা যায় যে, ঘটনা বা নাট্যিক ক্রিয়াই (action) নাটকের মধ্যে মুখ্য স্থান গ্রহণ করে না—বরং মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতও এর অবলম্বন হয়ে থাকে, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে যেসব উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে ঘটনার বাহুল্য দেখা যায়, তাদের মধ্যেই নাট্য রচনার উপাদান আছে, তা বিবেচনা করা যেতে পারে না। উপন্যাসের নাট্যধর্মিতা এক কথা এবং নাটকীয় গুণ অন্য কথা। সুতরাং যা উপন্যাস, তা উপন্যাসই, তা কোন উপায়েই নাটক হতে পারে না। আমাদের দেশে দর্শকদের এখনও এ কথা বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন হয় যে, যা রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়ে পরিবেশন করা হয় তা-ই নাটক নয়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

উপন্যাসে সময় : আর সব প্রবাহের তবু উৎস ও মোহানা খুঁজে পাওয়া যায়, পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু কাল বা সময়ের আদি অন্ত খুঁজতে গেলে বিড়ম্বনাই বাড়ে শুধু। অথচ সময় তো প্রবাহ-ই বটে, সময় হচ্ছে যা যায়, সমান ভাবে যায়। কিন্তু এই যাওয়াকে ধরে রাখা যায় না কোনোমতে, আবার তা দৃষ্টি শ্রুতি গোচরও নয়, ফলে সময়ের স্বরূপ নিয়ে দার্শনিক দ্রষ্টা বিজ্ঞানীর মনে সংশয় প্রশ্ন জাগে। অবশ্য প্রাজ্ঞজন সময় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে মানাই করেন, এই অশরীরী একজন কৃতী পুরুষকে আঘাটায় পৌঁছে দিতে পারে অবলীলায় স্বচ্ছন্দে।

তবু দার্শনিক বিজ্ঞানী সময় বিষয়ে চর্চা থেকে বিরত থাকেন না, কিন্তু সাধারণ মানুষ সে সম্পর্কে আদৌ চিন্তা করে কিনা সন্দেহ। অবশ্য কয়েকটি আবর্তনমূলক নৈসর্গিক ঘটনা উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। রাত-দিন, পূর্ণিমা-অমাবস্যার ঘুরেফিরে আসা ইত্যাদি থেকে মানুষ সময় সম্পর্কে সচেতন হয় প্রাথমিকভাবে। এগুলি তার প্রাত্যহিক জীবন, জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত, একসময় জীবনের নিয়ামক ছিল বলা চলে।

অথচ সময়কে অমান্য করলে মানুষের অস্তিত্ব শুধু বিপন্ন হয় না, এমনকি

কর্মরত মানুষ সময়-পরিমাপক যন্ত্রের পল-অনুপল-বিপলের চলা ভুলে যেতে পারে স্বাভাবিকভাবে খুব। সময়কে এরকম অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করতে পারেন কি একজন ঔপন্যাসিক ? করা, না করার প্রশ্নই ওঠে না কারণ 'উপন্যাসে সময়ের প্রতি আনুগত্য হচ্ছে নির্ঘাত, সময়কে বাদ দিয়ে কোনো উপন্যাসই লেখা হতে পারে না।' (ই. এম. ফরস্‌টার, "অ্যাস্পেক্টস্‌ অভ দ্য নভেল," পেন্‌গুইন ১৯৬৪, পৃ. ৩৭)। তাই কোনো ঔপন্যাসিকের পক্ষে উপন্যাসের বুনোটে সময়কে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

উপন্যাসের জন্মলগ্নেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে যেন। ব্যক্তির কথা হচ্ছে উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু, আর প্রাতিস্বিকতার ধারণা দেশ ও কালের নির্দিষ্টতার উপর নির্ভর করে। দেশ-কালের নির্বিশেষ পটভূমিতে রচিত আখ্যান থেকে উপন্যাসীয় আখ্যান দেশ-কালের বিশেষতার গুণে আলাদা এবং সম্পূর্ণ নতুন এক শাখা হয়ে যায় সাহিত্যের। আর উপন্যাসের শরীরে শ্বসনের মতো সময় অন্তঃ-বহমান অশরীরী অথচ অমোঘ অস্তিত্ব হয়ে ওঠে।

তাঁর উপন্যাসের নামে ইতিহাস যুক্ত থাকলেও লেখালিখির এক নতুন শাখার (উপন্যাস) প্রতিষ্ঠাতা হেন্‌রি ফিল্ডিং প্রচলিত ইতিহাস লেখার রীতি বর্জন করে অন্য এক রীতি গ্রহণ করেন, যে-রীতি কোনো একটি অসাধারণ দৃশ্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে, তেমন লক্ষণীয় কিছু না ঘটলে গোটা বছরের ঘটনা বাদ দিয়ে জরুরি প্রসঙ্গ তুলে ধরে, সেজন্য এ রীতিতে লিখলে কোনো কোনো পরিচ্ছেদ ছোটো, কোনোটি বড় হয়, কোনোটিতে থাকতে পারে একদিনের ঘটনা, কোনোটিতে হয়ত গোটা বছরের। (দ্রষ্টব্য : হেন্‌রী ফিল্ডিং, দ্য হিস্ট্রি অভ টম্‌ জোন্‌স, এ ফাউণ্ড্‌লিং)। বঙ্কিম-উপন্যাসে সাধারণভাবে এ-রীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি; 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ঘটনাকাল প্রায় এক বছর তিন মাস, তার মধ্যে 'লুৎফ-উন্নিসা আগ্রা গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রাম আসিতে প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছিল।' (৪/১) আর এই প্রায় এক বছরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তৃতীয় খণ্ডের সাতটি পরিচ্ছেদে। অথচ প্রথম খণ্ডের মোট পাঁচ দিনের কাহিনী ন'-টি পরিচ্ছেদে, দ্বিতীয় খণ্ডের আট-দশ দিনের কাহিনী ছ'-টি এবং চতুর্থ খণ্ডে মাত্র দু-দিনের কাহিনী ন'-টি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়। অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লেখক বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন অথচ এগুলি অতি অল্পদিনের ঘটনা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এখানে সময়ের

ব্যবহার সচেতন নয়, এমনকি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি সময়ের উপরও ছিল না, জোর পড়েছে বহির্ঘটনার উপর, কিন্তু ঘটনাগুলো এলোমেলো যেমন খুশি ঘটে না, ঘটে কালানুক্রমিক সময়ের সুতো ধরে—

'...যতক্ষণ মতিবিবি পথবাহন করেন, ততক্ষণ আমরা তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত কিছু বলি।' (৩/১) কিংবা '...নাম শুনিবামাত্র লুৎফ-উন্নিসা হোমকারীর নিকট গিয়া বসিলেন।'

এক্ষণে তিনি তথায় বসিয়া থাকুন ; পাঠক মহাশয় বহুকাল কপালকুণ্ডলার কোন সংবাদ পান নাই'...(৩/৫)

ঔপন্যাসিক যতই পূর্ববৃত্তান্ত বা নায়িকার সংবাদ দিতে চেষ্টা করুন, সবকিছুর পিছনে তাঁর মাথায় সময়ের হিসেব ঠিক থাকে, যেমন 'দুর্গেশনন্দিনী'-তেও—'তাহার পরদিন প্রদোষকালে' (১/১০), 'পরদিন প্রদোষকালে জগৎ সিংহের অবস্থান কক্ষে...(২/৩), 'দুর্গজয়ের দুই দিবস পরে' (২/৪) ইত্যাদি।

সাধারণভাবে 'চোখের বালি' পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস কাহিনীপ্রধান, আর কাহিনী, ফরস্‌টারের মতে, সময় অনুক্রমে সাজানো ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ। এই সময়কে আমরা বাহ্য সময় হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি, যা দিনের (অর্থাৎ ঘড়ির) পারম্পর্য মেনে চলে, এবং পাত্র-পাত্রী-পাঠক নিরপেক্ষ সমান বেগে বয়ে চলে।

এ-ছাড়া, সময়ের অস্তিত্ব আমরা আর একভাবে টের পাই, যা আমাদের অনুভূতি, মন-মেজাজের উপর নির্ভরশীল। মেজাজ ভালো থাকলে দীর্ঘ সময়কে মনে হয় অল্পক্ষণ, আর এই অল্পক্ষণ-ই দীর্ঘ হয়ে যায় মন মেজাজ খিচড়ে গেলে। সময়ের এই আপেক্ষিকত্ব ঔপন্যাসিকের বিষয়ের অন্তর্গত হয়, যখন তিনি 'আঁতের কথা' বের করে দেখান। একেই টমাস মান্ বলেন, 'তার প্রসঙ্গের সময়, যা আপেক্ষিক, এতই আপেক্ষিক যে বিবরণের কাল্পনিক সময় হয়ত যথাযথ কিংবা সাংগীতিক সময়ের সঙ্গে প্রায় কিংবা পুরো মিলে যেতে পারে বা ব্যবধান দুস্তর হতে পারে দারুণ।' (ম্যাজিক মাউণ্টেন, অধ্যায় ৭)

প্রাসঙ্গিক সময়কে আমরা গুহ্য সময়ও বলতে পারি, কারণ তার প্রকৃতি গুপ্তই থাকে। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে একটি ঘটনা মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা সামান্যক্ষণের জন্য হলেও তার বিবরণ দিতে ঔপন্যাসিক অনেক বেশি সময় নিয়ে নিতে পারেন, অথচ লেখক কিন্তু সাধারণভাবে কালানুক্রমিক

।ময়কেই অনুসরণ করে চলেন আতের কথার ধারাবাহিক বিবরণে, সেই বিবরণের ক্রমভঙ্গ হলেও তা অতীত-দীপন (ফ্ল্যাশব্যাক)-এর সরল রীতিতে ঘটে থাকে —যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসে 'গল্পটার এইখানে আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলার দীপজ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো।' (১) অথবা 'এইবার কন্যাপক্ষের কথা।' (৩) ইত্যাদি।

কিন্তু মনের গতিবিধি সহজ সরল নয় মোটে, তার গতি কোনো ক্রম মেনে চলে না কখনো, ক্ষণে ক্ষণে মন অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে অতীত কিংবা ভবিষ্যতে বা অতীত বর্তমান ইত্যাদি মিলেমিশে চলাফেরা করে, এবং তার গতিও ক্ষিপ্র খুব। ঔপন্যাসিক এই মনের মানচিত্র আঁকতে চেষ্টা করেন, ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে কালক্রমানুসারী সময় লঙ্ঘন করতে হয়, যেহেতু মনের মধ্যে কালের ক্রম সুশৃঙ্খল নয়, আর মনের চলাফেরা তার আঁকাবাঁকা গতি নজর করতে গিয়ে ঔপন্যাসিককে স্মৃতি ও অনুষঙ্গের সাহায্য নিতে হয়-দারুণ, ধূর্জটি-প্রসাদ যেমন বলেন, 'অন্তঃশীলার টেক্‌নিক উপভোগে পাঠক-পাঠিকার চিন্তা-শীলতার চেয়ে স্মৃতিশক্তিরই প্রয়োজন বেশি।…বইখানির অনেক স্থলেই স্মৃতির খেলা আছে—বিশেষতঃ তার সহচারী শক্তির—association-এর; …এক্ষেত্রে প্লুত ও উল্ফ-এর পন্থাই লেখকের একমাত্র পন্থা।' (ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ১, পরিশিষ্ট পৃ. ২৩৭) স্মৃতি অনুষঙ্গের সাহায্যে মনের বিচিত্র চিত্র তুলে ধরা হয়েছে গোপাল হালদারের 'একদা', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'স্মৃতি' প্রভৃতি উপন্যাসে, এবং এই রীতি আংশিক প্রযুক্ত হয় সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসে। সময় অন্যভাবে উপন্যাসের রচনারীতি প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে। সময়-সীমার সংকোচনে উপন্যাসে নাটকীয় লক্ষণ ফুটে ওঠে, আর তার সঙ্গে ঘটনা-বাহুল্য যুক্ত হলে অতিনাটকীয়তা সৃষ্টি হতে পারে, 'কপালকুণ্ডলা'-র চতুর্থ খণ্ড তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

এতক্ষণ যেসব উপন্যাসের কথা বলা হলো, তাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সময়ের ভূমিকা আছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তখন প্রশ্ন জাগতেই পারে, তবে কি সময় অমোচ্য, তাকে বিলুপ্ত করা যায় না উপন্যাসে ? অথচ শিল্প সাহিত্যের দু-টি বিভাগে ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় সময়কে এড়ানো বা লুপ্ত করা যায় স্থানকে পরম ক'রে। উপন্যাসে বিশেষ মানুষের বিশেষ চেতনা ঘটনার বদলে যদি মানবিক অবস্থার রূপায়ণ সম্ভব হয়, তবে সেই অবস্থা বর্ণিত হতে পারে শাশ্বত

সময়হীনতায়—'একদিন সকালে দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে গ্রেগর সাম্‌সা দেখে সে একটা অতিকায় বিশ্রী পোকা হয়ে গেছে।' (কাফ্‌কা, মেটামরফসিস) কিংবা 'মা আজ মারা গেছেন, বা হতে পারে কাল' (কাম্যু, দ্য আউট্‌সাইডার)

এখানে এক দুঃস্বপ্নময় অনিবার্য মানবিক অবস্থার কথা বলা হচ্ছে, তখন সময় থাকা না-থাকা সমান হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য'-উপন্যাস 'মানুষের এক টুকরো মানসিক অংশ' নিয়ে রূপকে প্রতীকে মানুষের প্রক্ষেপে আধুনিক বিচ্ছিন্নতা অস্তিচেতনার বিপন্নতা সমেত মানবিক অবস্থার আলেখ্য হয়ে দাঁড়ায় সময়ের অতিনির্দিষ্ট ঘের পেরিয়ে, সময় তখন অস্তিত্বের সংকটের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

কার্তিক লাহিড়ী

এপিক নভেল—দ্র. মহাকাব্যোপম উপন্যাস।

ঐতিহাসিক উপন্যাস : অভ্রান্তভাবে আমরা কোনদিনই জানবনা, কোন্ প্রেরণা থেকে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের অন্তর্লোকে উঁকি দিয়েছিলেন। নিজের ভাব-মূর্তিকে এই অতীত-ছোঁয়া ছায়াচ্ছন্ন দর্পণে কেন দেখতে চাইলেন তিনি? সে কি শুধুই গল্প বলার ঝোঁকে? অথবা ইতিকথার কিছু মোহ আছে বলেই? আমরা আরও জানব না এখানে তিনি সচেতনভাবেই এগিয়ে এসেছিলেন কিনা, নাকি এ তাঁর অবচেতন তাগিদের একটা অধ্যায়মাত্র? পাঠকের মধ্যে ইতিহাসকে একটা অভিজ্ঞতা করে তুলতে চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক অথবা জরজর-জগতের মধ্যে মন্থর-সান্ত্বনার প্রবালদ্বীপ গড়ে তুলতেই নিরত ছিলেন তিনি? কিন্তু, একথা তো স্পষ্টই ফুটে উঠছে—উপন্যাসের এই বিশেষ শাখাটি সুঠাম প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। বারে বারে তার আদল গিয়েছে বদলে, তথাপি বিস্তার-পবে অসীম সম্ভাবনায় নত হয়েও এই কাহিনীগুলি অনন্যমুখী, যদিও পরিণতির নির্দিষ্ট নিরিখও আমাদের অজানা। আর অজানা বলেই বোধকরি আমাদের অভিপ্রেত কৌতূহল যথাযোগ্য অভিনিবেশ সহকারেই একে নিরীক্ষণ করে চলেছে। এই পুষ্টির ইতিবৃত্ত ত আমাদের স্বাদের সামগ্রী, কতই না বিচিত্র সে স্বাদ। আমরা সেই বৈচিত্র্যের মাঝখানে হারিয়ে যাই; পারি না ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি সৌম্য-সংজ্ঞা এঁকে দিতে—স্পষ্টতই বিপন্ন বোধকরি তখন। ভালো, বরং বলা যাক্, কোন স্বাচ্ছন্দ্যই সংজ্ঞার অন্তগত নয়—সংজ্ঞা-নিরপেক্ষ।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেই স্বাচ্ছন্দ্যের দোলা আছে।

মহাকাব্যের সঙ্গে তো উপন্যাসের জন্মান্তর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। সেই সুবাদে দাবি করাই যায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গেই সে হৃদ্যতা ঘনিষ্ঠতম। শুধু পাদপীঠের বদল ঘটেছে। মহাকাব্যের বিপুল বিস্তৃত বৈভব আর সর্বজনীন আবেদন সত্ত্বেও দেশকালের প্রতিশ্রুতিকে তা লঙ্ঘন করে না। আর ঐতিহাসিক উপন্যাস দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতেই আরও খানিক অজানাকে আমাদের আয়ত্তে এনে দেয়। এই দেশকাল-নিরপেক্ষ আলিঙ্গনেই ইতিকথাশ্রয়ী কথাসাহিত্যের প্রাণস্পন্দন সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাই এইসব উপন্যাসে মহাকাব্যের লক্ষণ বড়ই প্রকট। যদিও, তারা মিলেমিশে আরেকটি মহাকাব্য হয়ে ওঠে না। মহাকাব্যের ঐ ইতস্ততবিন্যস্ত উপকরণগুলো কোন্ এক সংকেতে গাঁথা হয়ে যায়, ইতিহাসের সন্ধিলগ্নে মর্ত্য-এষণা প্রবল তাড়নায় বেজে ওঠে। কালের নির্দেশে যে দোলালাগা মর্ত্যপিপাসার ছন্দকে ঐ সন্ধিলগ্নে, ঐ সংকেতে নিজের উপলব্ধিতে সত্য বলে মেনে নিই, বোধকরি, তাকেই বলা যাবে 'ইতিহাস রস'।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐ কালদর্শন কি হবে, ভাবনার রাজ্যে এটাই আপাতত আমাদের সবচেয়ে জরুরি সমস্যা। সম্ভবত চল্তি প্রাণের ঐ চাঞ্চল্যের সঙ্গে সীমাশূন্য স্পর্ধিত বিস্তার যখন একটা আপস করে ফেলে, তখন অন্যান্য শাখার মতো ঐতিহাসিক উপন্যাসে কালবিন্দু একটি দিব্যদর্শন মাত্র থাকে না, কিংবা মুহূর্তের ভাষ্যে শাশ্বতের দার্শনিক পীঠস্থানও তা হয়ে ওঠে না। এই বিশেষ শাখাটিতে নির্বিশেষ কালস্রোত কান্তিময় স্বরূপ হিসেবেই প্রতিভাত হয় তখন। 'কাল'-এর ছিন্ন ফসল মহাকালের দ্যোতনাতেই অস্থির হয়ে ওঠে। অবলম্বন তার সমগ্র বিশ্ব। 'বিশ্বমন'ই ঐতিহাসিক উপন্যাসের 'সমাজমনে'র প্রতিভূ। স্থান-কালের এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তারপর দিগন্তে হারিয়ে যায়, উদয়াচলে ইতিহাসের আত্মা বিশাল প্রাণের শপথ নিয়ে জেগে ওঠে। পাঠকের অভিজ্ঞতাতে আছে—বিশালতা ঐতিহাসিক উপন্যাসের আরেক অঙ্গাভরণ। আর তা চল্তি রেওয়াজ হিসেবে নয়, মর্মকথা হিসেবেই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে নায়ক কে? ইতিহাসে যার অধিকার। আরও একটু সাহস করে বলা যাক্—ইতিহাসই ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক। কখনও ইতিহাসে চরিত্র সৃষ্টি হয়, কখনও সবল চরিত্র ইতিহাস গড়ে তোলে। বিবর্তনের ইতিহাসে দেখব, একের অধিকার কেমন করে বহুজনের সামর্থ্যে জন্মান্তর পেয়ে

যাচ্ছে। কিন্তু শেষ মূল্য কোথায়? সর্বজনের অঙ্গীকারে। এই 'সর্বজন' ভৌগোলিক পরিধি হারাচ্ছে আস্তে আস্তে। নিছক দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ে বৃহৎ মানবাত্মার অংশ বলে সে সমাজ উল্লসিত হচ্ছে না, বরং বিপরীতটিই সত্য। অ-লৌকিক প্রত্যয়ের বদলে, লৌকিক সংস্কারে, মানবিক বাসনাতেই তা ঘটে যাচ্ছে। রাজশাসনের কিংবা অভিজাত-অনভিজাত সংঘাতের স্তরগুলো মুছে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। দানা বেঁধে উঠছে সম্মিলিত প্রাণ-প্রাচুর্য। কালের যাত্রার রথের রশিতে আজ এদেরই অধিকার। আজ ইতিহাসের নায়ক এই মিলিত অস্তিত্ব। তাহলে আজকের ঐতিহাসিক উপন্যাসকে নামান্তরে বিশ্বমনা সামাজিক উপন্যাস বলা যেতে পারে বৈকি! এ মিলন ঐতিহাসিক, এ মিলন ইতিহাসকে মুক্তি দিয়েই চলেছে। 'টম জোন্‌স' থেকে 'স্পার্টাকাস্‌', 'দুর্গেশ-নন্দিনী' থেকে 'উপনিবেশ'-'পদসঞ্চার'—কি অপরূপ যুগনত বিশ্বস্ততার ইতিহাস!

কথাটা এখান থেকেই দেখা দেবে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ, সমাজের সঙ্গে দেশ, আর দেশের সঙ্গে মহাবিশ্ব—অক্ষয় শৃঙ্খলে পরস্পর আবদ্ধ। এই উপলব্ধি যতই ঋজু হচ্ছে মহাকালের নাট্যশালায় আমরা ততই বিশ্বযাগের দামামা শুনছি। বিপুলমন্দ্রে সে বাজনা বাজাবার দায়িত্ব ইতিহাসের তথা ইতিহাস-প্রোথিত পুরুষের। তখনই দেখছি ইতিহাসের অভিজ্ঞতাই সামাজিক মূল্যবোধে অঙ্কুরিত হচ্ছে। অর্থাৎ ক্রমাগত ইতিহাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে সামাজিকতার খুব অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী। আর এই অন্তরঙ্গতার তারতম্যই প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক উপন্যাসের রূপবিবর্তনের সূত্রধার। 'ফরাসী বিপ্লব' আর 'রুশ বিপ্লব'—এই যুগান্তকারী দুই সংঘাতের প্রভাবে রচিত উপন্যাসগুলোই আমাদের দাবি সমর্থন করবে।

এই অন্তরঙ্গতার অভাবেই ঐতিহাসিক উপন্যাসে নায়ক-নায়িকারা নির্বাসিত হয়েছিলেন ইতিহাসের গহ্বরে। সেখানে প্রণয়-হুতাশে সেইসব নায়ক-নায়িকারা আসঙ্গলীন। তারই মধ্যে কয়েকটি নিভৃত হৃদয় নক্ষত্র-দীপ্তি পেয়েছিল। অতিলৌকিক কিছু স্বপ্নে কিছু অবাস্তব মোহে তাদের অঙ্গরাগ সম্পূর্ণ হয়েছিল সেদিন। আর ফাঁকে ফাঁকে গথিক উপন্যাসের কিছু নিষ্করুণ-বৈভব সে প্রণয়-রসকে আরো আপ্লুত করে তুলেছিল। ভয়ে-বিস্ময়ে-পুলকে আমরা অবারিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ইতিহাস সেখানে স্তব্ধ। মহাকালের দুরন্ত চাপল্যের সে এক স্থাণুবৎ রূপ। কিন্তু, সে তো ইতিহাসের অভিজ্ঞতা ছিল না, সে ছিল

ইতিহাসের মণিদীপা-কক্ষে ব্যক্তি-হৃদয়ের ঐশ্বর্য। আমরা এই ঐশ্বর্যের সন্ধান দেশ-দেশান্তরেই পেয়ে থাকি। আয়েষা, তিলোত্তমা, জগৎসিংহ, মার্কাস, লিডিয়া—এরা আত্মতন্ময়; আক্ষরিক অর্থে কেউ কেউ ঐতিহাসিক চরিত্র হয়েও ইতিহাসবিচ্যুত। বড় অকরুণ বলেই মনে হয়—যদিও তা স্বাভাবিক—জঙ্গম ইতিহাসের স্থির দর্পণে এইসব মুখ ভেসে উঠেছিল।

পূর্ণচেতনার অভাবগ্রস্ত টুকরো দৃষ্টিতে সামাজিক মানুষের ইতিহাসকে দেখবার দিন ফুরিয়ে এলো। ইতিহাসের চরিত্রপূজা শেষ হবার আগেই দেউড়িতে ঘণ্টা বাজলো—মোড় ফেরবার পালা এলো। জার, নেপোলিয়ন, রাজসিংহ, সীতারাম—হারিয়ে যেতে থাকলেন। যদিও টলস্টয় মুক্তি নিলেন ব্যক্তি-বিশ্বাসে, বঙ্কিমচন্দ্র চরণচিহ্ন এঁকেছিলেন স্বদেশপ্রেমের পথে। প্রথমটি ইতিহাসের অনভিপ্রেত তথাপি শুভান্ত সমাধান, দ্বিতীয়টি কিন্তু এক অর্থে 'Regressive spirit,' নাটাশার বিশ্বাসে উজ্জীবনে নিবিড়তা আছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার চরিত্রে স্বাদেশিকতার মোহ বড়ই অপরিচ্ছন্ন। কথাটা মনে রাখা ভালো বঙ্কিমচন্দ্র অভিজাত পুরুষই এঁকেছেন, সামাজিক মানুষের ঠাঁই তাঁর দরবারে বড় নেই। কেন? হয়ত ইতিহাসের পরিণতিটাই, অন্তত পরিণতির সম্ভাবনাটুকু তাঁর অপরিজ্ঞাত ছিল। ত্রুটি বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, সামগ্রিকভাবেই তখন আমাদের ঐতিহাসিক চেতনার অভাবটা বড় অশোভন। বঙ্কিমচন্দ্র খানিক পরিমাণে সে বোধ জাগিয়েছিলেন, পরিণতির ইঙ্গিত যদি না-ও থাকে, তথাপি তিনি আদিগুরু। আর বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-ভাবনার যে পরিণতি আমাদের কখনও কখনও অসন্তোষের কারণ ঘটায়, তারও মূল সম্ভবত এখানেই। ইতিহাসের পথযাত্রী হয়ত বাধ্য হয়েছিলেন আত্মযাপনের বিরামাগারে আশ্রয় নিতে। সদ্যজাগর দৃষ্টি তখনও অপরিমার্জিত; তাই যে ইতিহাস বিশ্বগ্রাসী, সে স্বাদেশিকতায় ঢলে পড়ল। রোমান্সের সুখস্বপ্ন থেকে দেশাত্মবোধের মোহে এই পরিণতি অবশ্যই কাম্য ছিল না। ইতিহাসের এ বৈপরীত্য অস্বাভাবিক। কারণ বিশ্ব-সমাজের দর্পণ যে উপন্যাস, স্বাদেশিকতার খণ্ডবোধ তার পক্ষে বড়ই বে-মানান। 'ক্যাণ্ডিড'-এ দেশাধিকারের নয় মানবিক অধিকারের দাবি ফুটে ওঠে, 'আনন্দমঠ'-এ সন্ন্যাসীর জাতিবৈর-র প্রায়শ্চিত্ত-দৃশ্য আঁকা হয়ে যায়। যদিও উপন্যাসে ঐতিহাসিক আপতন যেমনভাবেই আসুক না কেন, ইতিহাসের গতি রুদ্ধ হয় না।

'স্পার্টাকাস্' নিশ্চয়ই আধুনিক কালের বিতর্কাতীত সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং এ যুগের প্রতিভূ। দেশের শত্রু বা জাতির শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, মানুষের শত্রুর বিরুদ্ধেই তার অকম্পিত ঘোষণা—শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে সে বার বার ফিরে আসবে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হয়েই ফিরে আসবে। এক অর্থে বর্তমান যুগযন্ত্রণার আর তারই বিরুদ্ধে ক্রমবিকশিত অধিকারচেতনার প্রতীক্-পুরুষ স্পার্টাকাস্। এ রাজনৈতিক অধিকারবোধ নয়, সমাজতান্ত্রিক অধিকার-বোধও নয়; কোন 'ইজ্‌ম্'-এর বাণীবাহকও নয়—সে নিছক সর্বকালের সর্বদেশের ম্লান-মূক-মূঢ় মানুষের আশ্বাসের এবং বিশ্বাসের নিশ্চিত সোপান। অতি-আধুনিক এই মূল্যবোধকে গ্লাডিয়েটরের যুগে স্থাপন করা পারিভাষিক অর্থে **কালানৌচিত্য** দোষদুষ্ট কিনা সে প্রশ্ন যোগ্য অধিকারী যিনি তিনি তুলতেই পারেন। আমরা কিন্তু স্বীকার করব ট্রাডিশ্যন্-কে উত্তরাধিকারে পৌঁছে দিতে গেলে এ অনিবার্য। সবচেয়ে বড় কথা রুশবিপ্লবের পরে ইতিহাস যে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, 'স্পার্টাকাস্' সে চিহ্ন বহন করছে। যে কোন সমাজদর্শী আজ অবশ্যই স্বীকার করবেন, বিশ্ব-প্রবাহ-বিচ্যুত হয়ে আমাদের অস্তিত্বের কথা আজ আমাদের কল্পনারও অগোচর। কেন? ইতিহাস আজ একাধারে আমাদের দেশের, আমাদের বিশ্বের।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের তালিকার সংখ্যা যেমনই হোক, বৃত্তের বন্ধনীর অনেকটাই বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকারে। যদিও ব্যক্তিগত ভাবনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্যা ছিলই, উপরন্তু ছিল ইতিহাসের সম্ভাব্য পরিণাম নির্দেশের ক্ষেত্রে—সে কথা বলেছি। আর এই কারণে দ্বিধাগ্রস্ততা তাঁর এখানেও। অধিকারবোধে নিষ্ঠা আরোপ করে 'আনন্দমঠ'-এর পরও চরিত্রপূজায় কেন তিনি উৎসাহবোধ করলেন সেটুকু আমাদের কৌতূহলের বিষয়। 'রাজসিংহ,' 'সীতারাম' উপন্যাসে—উভয়তই ইতিহাসের Regressive spirit—সেই পরিপন্থী সামর্থ্যেই উগ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি ঐতিহাসিক চেতনার কিছু কিছু মৌল তাগিদের সন্ধান তিনি আমাদের দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনী লেখা হয়েছে অনেক, কিন্তু 'উপনিবেশ' আর 'পদসঞ্চার'ই সম্ভবত সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। ভাঙনের মহালগ্নের জীবনসত্য এ দুটি উপন্যাসে যে আকার পেল, বাংলা উপন্যাসে অন্তত তা তুলনারহিত। তর্ক তুলে বলা যাবে, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'ই বা নয় কেন ঐতিহাসিক উপন্যাস? আমি বলব—

ঐ বিস্ময়ের অভাবে। বিশ্বস্রোতের ক্ষীণ তরঙ্গে পাখী-বনোয়ারী-করালী আলোড়িত হয়েছে শুধু, উদ্বুদ্ধ হয়নি। প্রেক্ষাপট যত সংকীর্ণ হবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সম্ভাবনা ততই হারিয়ে যাবে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল্যবোধ কোন বিশেষ দেশের বিশেষ সমাজের নিঃসপত্ন অধিকার নয়—সে সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বসাধারণের। অথচ, 'অমাবস্যার গান'-এ এই প্রত্যাশা আমাদের পূর্ণ হয় না। ভারতচন্দ্র নিছক মানসকণ্ডুয়নেই যন্ত্রণার আলাপন সমাপ্ত করলেন। আমরা ক্ষুন্ন হই বৈ কি। অথচ, পরিবেশ এবং উপকরণের দিক থেকে 'অমাবস্যার গান' অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল এ কথা কে অস্বীকার করবে?

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনীর অভাব নেই। কিন্তু আমরা জানি না, প্রেরণা এবং সততার বিচারে এরা কোথায় দাঁড়াবে? কালানুসারী ইঙ্গিতের প্রশ্ন সুদূরপরাহত, ইতিহাস যেন ক্ষণিক খেলনায় পর্যবসিত হয়েছে। অসংকোচে স্বীকার করব দুঃসহ যন্ত্রণার অবসানকল্পে আমরা মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, কিন্তু এইসব রচনায় তো সে প্রত্যাশাও পূর্ণ হয় না। ইতিহাসে সাম্প্রতিক মূল্যবোধ যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, তবে তার প্রাচীন মূল্যবোধ-গুলোকেও তো স্পর্শ করা যেতে পারে। কিন্তু এ তো জীবনবিমুখ কল্পকথার পশরা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে—আক্ষেপের কথা—'স্পার্টাকাসে'র মতো একটি উপন্যাস নেই। হতাশা আরো নির্মম হয়ে পড়ে যখন মনে হয়, সে সম্ভাবনাও বুঝি নেই। তথাপি, কালস্রোত অমোঘ, আমরা আশা করে থাকব এ যুগের ঐতিহাসিক কথাকারের আবির্ভাব ঘটবেই ঘটবে। আমরা নতুন মূল্যবোধে দীপ্ত হব। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সম্ভবত দুটি তোরণ উন্মুক্ত। একদিকে ব্যক্তি-জীবনাশ্রয়ী দার্শনিক উপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের ভিড়, আরেকদিকে সামাজিক এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস। আমরা প্রতীক্ষায় নিরত থাকব একদিন আত্মভাবনা আর সমাজভাবনাকে কেউ মিলিয়ে দেবেন। না দিলেও ক্ষতি নেই, রূপবৈচিত্র্য আমাদের সাড়া জাগায়, সেও তো সত্যিই!

সরোজ দত্ত

কথা—দ্র. আখ্যায়িকা।

কবিতা ও উপন্যাস : এ পর্যন্ত অনেকেই বলে আসছেন, আমাদের মনোনীত উপন্যাসগুলিই হলো অগত্যা আধুনিক যুগের মহাকাব্য। অপরপক্ষে, একালের কবি-সমালোচক-লেখকদের মধ্যেও, প্রধানত বিংশ শতাব্দীর একশ্রেণীর উপন্যাস সম্পর্কে, 'কবিতার সমগ্র অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'-এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে।

আরিস্টটলীয় কাব্যতত্ত্বের ইঙ্গিতসূত্রে, আমাদের বিশেষ-বিশেষ উপন্যাসকে আধুনিক মহাকাব্য বলা চলে কিনা—তা অবশ্য আজও বিতর্কসাপেক্ষ। তবু একটা সত্য তো এই যে মহাকাব্যপ্রতিম উপন্যাসগুলিতেও থাকতে পারে—অসম্ভবকে সম্ভবপর ও বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলার বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য : 'to tell lies skilfully' : —'the true art of fiction'। এখন সেই নৈপুণ্য যে-যে কথাবস্তু ও চরিত্রের নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনায় সিদ্ধ, অর্থাৎ যে-কাহিনী যে-চরিত্র লেখককৃত ব্যাখ্যা ছাড়াই স্বয়ংপ্রকাশ, আমরা জানি, আরিস্টটলের সমর্থন তার প্রতিই সমধিক। কিন্তু ঠিক এই সূত্রে, জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' বা দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-কে কি মেলানো যাবে। কারণ এসব উপন্যাসে চরিত্রবিশ্লেষণে লেখকের ভূমিকা প্রত্যক্ষ। কাজেই প্রাচীন মহাকাব্যের উত্তরাধিকার সত্ত্বেও, আধুনিক উপন্যাসে প্রকৃত মহাকাব্যিক উৎকর্ষ বা মহিমা হয়তো আশাই করা চলে না। তবু, এক আকার-প্রকারের বিশালতা ও বিস্তীর্ণতা যা নাটকের পক্ষে তো নয়ই—কারণ নাটকে মহাকাব্যোচিত মহিমা ও ব্যাপকতা দুর্লভ, কিন্তু কথাসাহিত্যে—অর্থাৎ উপন্যাসে—তা সুলভ না-হলেও যথাসম্ভব তার কাছাকাছি যেতে পারে হয়তো। এই তাৎপর্যে, হোমার-বাল্মীকি-বেদব্যাসের রচনাপ্রতিভার সত্যকথনও ('সেই সত্য যা রচিবে তুমি'—রবীন্দ্রনাথ) নিছক বহিরঙ্গের তথ্যপঞ্জী নয়, কাব্যসত্য।

কাব্যসত্য বা কাব্যগত আদর্শীকরণেই একদা উপন্যাস, কবিতার কতোটা সম্পর্কিত হয়ে উঠতে পারে, তা গত শতকের প্রতীচ্য উপন্যাসে কিছুটা লক্ষণীয়। তা হলেও, বর্তমান প্রসঙ্গে, সে-সম্পর্কটা বলতে পারি উপরিতলের। উপরিতলের, কারণ—মহাকাব্য থেকে রোমান্সের দ্বান্দ্বিক বিবর্তনপথে, একটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপ

হয়ে-ওঠার ইতিহাসে উপন্যাসের বাস্তবতায় ঠিক কাব্যসত্য নয়—কাব্যিক আদর্শীকরণেরই উপরিতল উন্মথিত। এর পরিচয় প্রাথমিকভাবে বাংলা কথাসাহিত্যেও রোমান্স ও উপন্যাসের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সংসর্গে কমবেশি ধরা আছে। বঙ্কিম থেকে এমনকি রবীন্দ্র-শরৎ পর্যন্ত তার দৃষ্টান্তস্থল, যদি না একবার 'চোখের বালি'-র ভূমিকাতেই বাংলা উপন্যাসের 'নব পর্যায় পদ্ধতি'-র কথা ওঠে। উঠেছে যদিও 'চোখের বালি' থেকেই, তবু প্রকৃত প্রস্তাবে, রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' থেকেই শুরু হলো এমন একটি অধ্যায়, যা বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসের পক্ষেও তা 'কবিতার সমগ্র অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'-এরই ইতিহাস। এ পর্যন্ত মোটামুটি থীম-এর দিক থেকে যতোটা কাব্যাদর্শ ছিলো, তা-ই প্রধানত কর্মের সক্রিয় প্রাধান্যে আরো গভীরতর ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো। এই ঘনিষ্ঠতার স্বরূপকেও বলা চলে—এক অর্থে 'উপন্যাসের রূপান্তর'। অবশ্য সে-রূপান্তরের তাৎপর্য এই নয় যে, তখনই 'চতুরঙ্গ'-এর থীমে আমরা রবীন্দ্রনাথের কোনো দীর্ঘ কবিতা পড়ছি। অর্থাৎ উপন্যাস কবিতা হয়ে গেল, আর কবিতা—দীর্ঘকবিতা—একটি উপন্যাস।

না, কোনো নির্দিষ্ট শিল্পের রূপ ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে তেমনটি কখনোই ঘটে না; ঘটে না যে তার প্রধান কারণ প্রত্যেকটি শিল্পরূপেরই একটা স্বাতন্ত্র্যঘটিত বিশেষত্ব থাকে ; এবং সেটা উপন্যাসের কাঠামোয় কবিতা বা কবিতার ছাঁচে উপন্যাস হয়ে-ওঠার অসম্ভব থেকেও বহুদূরে একটি সোনার পাথরবাটি। এখন এই বাটিও যদি কোনো-একটা ফর্ম বলে মনে হয়, তবে তার গুণগত ধর্মে, একটা পাথরের বাটিকেও নৈসর্গিক আলোছায়ার বিশেষ সংস্থানমায়ায় সোনার মতো মনে হলেও হতে পারে। মানে, এও সেই সম্ভবপর অসম্ভাব্যতা ('Probable impossibilities') তবে।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ'-এ সত্যকে একটি সরলরেখার উপর দাঁড় করালে, সেই যে—যে মুখে 'তিনি' শচীশের দিকে নেমে আসছেন আর শচীশও তেমনি উল্টো মুখে 'তাঁরই' দিকে চলে যেতে পারে, হয়তো, তবেই সম্ভব সে-রেখাগণিতে প্রকৃত মিলনবিন্দুর অধিষ্ঠান। তা হলে, পারস্পরিক এই দুয়ের উল্টো গতিক্রমকে মাত্র একটি সরলরেখার দ্বারাই—চারদিকের দ্বন্দ্ববিরোধ ও জটিলতার একটা উন্মোচন বলে মনে হতে পারে কি ? যদি পারে, তবে বুঝবো, উপন্যাসের রূপ কবিতার অরূপের দিকে এবং কবিতার বিমূর্ততাও উপন্যাসের অন্তর্নিহিত বাস্তবতার মুখোমুখি একটি সরলরেখার মিলনবিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং

তাদের উভয়ের অধিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্যকে--দ্বৈতাদ্বৈতকে—সম্পূর্ণ মুছে না দিয়েই দাঁড়াতে পেরেছে।

এখন, এই রেখাগণিতের চিহ্ন-প্রতীকের বিরোধ-মিলন সম্পর্ককে, উপমার ঊর্ধ্বে অন্বিত-করার প্রয়োজনে, অপৃথগযত্ন কবিতার দাবি কতটুকু? নিশ্চয় 'চতুরঙ্গ'-এর সে-বহুখ্যাত গুহাচিত্রানুষঙ্গের—তথা অবচেতনের প্রতীকোৎসারিতার চেয়েও বেশি। এই কমবেশির মাত্রা ও তাৎপর্য তবে ভাষাশিল্প-ঘটিত এক সমূহ আবিষ্কার ও পরিক্রমণ (total exploration)। যাকে স্বজ্ঞাপ্রাণিত সূত্রে কমলকুমার মজুমদার বলেন 'বেশি প্রকাশ' (দ্র. অন্তর্জলী যাত্রা)। আপাতত রবীন্দ্রনাথ থেকেই এর একটি নিরীহ অতি-সাধারণ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করি। যেমন,

> এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায়, জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল···(চতুরঙ্গ)

সাময়িকভাবে নিরুদ্দিষ্ট বা অন্তর্হিত শচীশ-সম্পর্কে, প্রথমত এক ফুঁয়ে প্রদীপ নেভার উপমা, এস্থলে উপলক্ষ। এর মূল লক্ষ্যবস্তু একটি অনুভাব: 'প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন **হঠাৎ চলিয়া যায়**।' ভাষায় অংশুশীল অনুভাবের জগতে বাস করে কোনো অদৃশ্যের দৃশ্যতর হওয়ার সম্ভাবনা; তাকে প্রতীক বললেই সব বলা হয় না, প্রতীকিতারও বেশি তার ইনট্যুইটিভ এভিডেন্স 'চলিয়া যায়' এই যৌগিক ক্রিয়াপদটির ব্যবহার থেকে লভ্য। কীভাবে বলছি। —আমরা জানি, ফুঁ-দিলে প্রদীপ নেভে। সুতরাং বাক্যটির সাধারণ জ্ঞাপনার্থ প্রদীপের আলো নিভে যাওয়া। অতএব, 'নিবিয়া যায়' লিখলে প্রয়োগটি প্রত্যাশিতই হতো। কিন্তু প্রত্যাশিত ও প্রচলিত শব্দার্থের দ্যোতনা ভেঙে, অপ্রত্যাশিত একটি বিপর্যাস (inversion) লক্ষণ ঐ 'চলিয়া যায়' যৌগিক ক্রিয়ায় যে-অর্থব্যঞ্জনা সম্প্রসারিত করে, তা একজনের অন্তর্ধান বিষয়েও সর্বাত্মক ভাষাশিল্পেরই সৌন্দর্য। বলাই বাহুল্য, এমন শিল্পসুষমা কখনো বিষয়-নিরপেক্ষ হতে পারে না। তা হলে, ভাষাকে সরল উপমা ও প্রতীকদ্যোতনার স্তর থেকে শব্দবিপর্যাসের স্তরে তুলে আনলে, স্বভাবতই আমাদের কল্পনাশক্তি ও স্বজ্ঞাশক্তির উৎকর্ষ হয়। এবং তখন, একটি শাদামাটা বিবরণভাগেও অন্তস্থিত বাস্তবতার প্রসারে, পূর্বোক্ত 'বেশি প্রকাশ' প্রায় ইনট্যুইটিভ এভিডেন্সের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। ভাষাকে উপমিত ও প্রতীকিত ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে,

অতঃপর, তার শব্দ-সংস্থানের বিপর্যাস সৃষ্টি করাও আধুনিক কবিতার একটি নিয়মিত লক্ষণ। আর সেক্ষেত্রে অবচেতনের উদ্ঘাটনেও চেনা বস্তুর মাত্রান্তর ও স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের মিশ্রণ, তথা প্রতিফলনে—আদি রূপকল্পের সনাক্তিকরণ চলে যৌথ-নিশ্চেতনার (collective unconscious) অনুষঙ্গবহ—হয় কোনো প্রতিমায়—নয়তো প্রতীকে। এই লক্ষণসমূহেরই কোনো-কোনো দিক একটা পূর্ণ পরিণত রূপ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। অবশ্য সে-রূপ-রূপান্তরের জন্য অবচেতনের উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণই নয় শুধু, তাকে উপন্যাসের শিল্পপ্রকরণে এই প্রথম আধেয়-আধারের সমমাত্রিক ও আত্মস্থ ক'রেও দেখা হয়েছে।

অন্যপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক রোমান্সে আর শরৎচন্দ্রের আন্তরিক সমাজঅভিজ্ঞতা-সহানুভূতির কেন্দ্রীয় ভাবালুতায়, প্রকৃত তাৎপর্যে, কবিতার নিঃসম্পর্কীয় যোগ কতক বহিরঙ্গ-ভূষণে থেকে যায়। হয়তো ঘটনার ঘনঘটার এবং চরিত্রের আবেগ-আতিশয্যের কবিত্ব তার জলের উপর তেলের মতো থেকে যায় তখনো। উপন্যাসের ভাষাশিল্পও সেখানে ক্বচিৎ বহিরঙ্গের অলংকার মাত্র। উপন্যাস ও কবিতার এই আলগা ভাসা-ভাসা সম্বন্ধের চূড়ান্ত শোচনীয়তার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'। যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাষাসচেতনতার পরিবর্তে, বিষয় ও রূপরীতির সমস্তটাই আনুষ্ঠানিক। বলতে গেলে, 'চতুরঙ্গ' ছাড়া ঠিক আর-কোনো উপন্যাসেই কবিতার সেই সহজ-স্বাভাবিক সম্বন্ধটি রবীন্দ্রনাথ পুরোদস্তুর কাজে লাগাতে পারেননি। অথচ তার আনুষ্ঠানিক কৃত্যে তিনিই তো এক অর্থে আমাদের প্রথম প্রদর্শক।

রবীন্দ্রনাথের পর, হয়তো এক বিভূতিষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক-নিসর্গের এপিকে, পথের বিস্ময়রসই কবিতার মৌলিক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বিষয়ের আনুকূল্য করে। আর তা করলেও কেন আরো সুনিশ্চিত প্রকরণপথে সেই বিষয় হয়ে ওঠে না বিষয়ীরও স্বাবলম্বন, তা আজো প্রশ্ন। তেমনি, তারাশঙ্করের অপূর্ব জীবনাগ্রহের বিষয়সর্বস্বতা। তিনি একটা যাহোক প্যাটার্নও সৃষ্টি করেন; অথচ প্রকৃত তাৎপর্যে সেই প্যাটার্নের অন্তর্ভাষা ও বাক্‌প্রতিমার সন্ধান করেন না। অবশ্য তা সত্ত্বেও, বাংলা উপন্যাসের সমাজবাস্তবতার রূপায়ণে এঁদের কৃতিত্ব ও সাফল্য সুবিদিত।

অন্যপক্ষে, উপন্যাস ও কবিতার মৌলিক সম্বন্ধের প্রত্যক্ষতায়, এ পর্যন্ত বাংলা

কথাসাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁদের সক্রিয়তা চূড়ান্তভাবে প্রধানত ভাষাশিল্পের পর্যায়ভুক্ত, তাঁরা হলেন : জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলকুমার মজুমদার। এই প্রধান ত্রয়ীর সঙ্গে আংশিক গৌণ লক্ষণে আরো যে-দুজন লেখক যুক্ত হতে পারেন, তাঁরা হলেন : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও অমিয়ভূষণ মজুমদার। এঁদের রচনায় বিষয়ানুগ ভাষাবিন্যাসের এবং অনুষঙ্গ-প্রতিমা-প্রতীকসন্ধানের খুব একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষিত না-হলেও তার কিছু কিছু প্রয়োগ কমবেশি উভয়েরই লেখায় আছে। বরং সাম্প্রতিকতম গদ্যে কথাসাহিত্য ও কবিতার সম্বন্ধসূত্রকে, আমাদের বিবেচনায়, যে বিশিষ্ট লেখকেরা একটা বিতর্কিত অথচ দ্বান্দ্বিক সত্যের অন্তর্গত করেন, তাঁদের মধ্যে trend setter হিসেবে মাত্র দুটি নামই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের একজন—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এবং অপরজন—দেবেশ রায়।

বস্তুত খুব সচেতনভাবে কবিতার প্রাকরণিক কৌশলগুলি আত্মসাৎ ক'রে কথাসাহিত্যে সর্বাত্মকরূপে নতুন ভাষাসৃষ্টির প্রবণতা যাঁর রচনায় একটা চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে, তিনি নিঃসন্দেহেই কমলকুমার মজুমদার। ভাষাকে কাব্যিক ক'রে তোলা নয়, বরং কাব্যময়তার সমস্ত প্রসিদ্ধি ঘটিত প্রয়াসকেই বর্জন, তাঁর ভাষাশিল্পের প্রধান তত্ত্ব। এমনকি তা যে আধুনিক কাব্যের শিল্পপ্রকরণেরও পূর্ববর্তী আদিম এক গ্রামীণ-লোকায়তিক বাগ্‌ভূমির শিকড়সন্ধান, এবং এক-একটি শব্দমূল-কে বিশেষত তার বিপর্যাসস্পৃষ্ট ধ্বনিসুষমায় বিচিত্র অনুষঙ্গময়তায় ছড়িয়ে দেওয়া, তা তাঁর গ্রন্থিল, দূরান্বয়ী, আপাত-বিশৃঙ্খল পদসংস্থানের 'আক্রমণাত্মক' ভঙ্গিমা থেকে যেমন, তেমনি প্রতিমা-প্রতীকসর্বস্বতার স্তরে স্তরে, বিবিধ প্রবাদ-প্রবচনের এবং বাক্‌প্রতিমার ব্যবহারে—বিশেষত ইন্দ্রিয়ান্তরসিদ্ধ সিনেস্থেসিয়ারও প্রয়োগ থেকে বোঝা যায়। আর্কেয়িক শব্দ বা পদবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই দেশজ শব্দের সংমিশ্রণ ও সংস্থাননৈপুণ্যে—ভাষার অর্থপ্রসার ও ধ্বনিসৌন্দর্যের গভীরতা সৃষ্টি, কমলকুমারের ভাষাশিল্পের প্রধান লক্ষণীয় বিশেষত্ব।

এখন এই বিশেষত্বকে—সরলীকৃত সমালোচনায়—নিছক কথাসাহিত্যের কবিত্ব বলাও ঠিক নয়। উপন্যাস ও কবিতার শিল্পগত সম্বন্ধ নির্ণয়ে, যখন আধুনিক উপন্যাসের ভাষায় 'রূপান্তর' ঘটছে, তখন সেটা আপাতদৃষ্টে কবিতার প্রাকরণিক কৌশলসমূহের প্রভাবে হলেও তা কেবল কাব্যেরই শিল্পপ্রকরণ ঘটিত উৎসের

একচেটিয়া নয়। বরং এই বলা ভালো, ভাষায় উপমাদি অলংকার বা প্রতিমা-প্রতীক ও অনুষঙ্গময়তার প্রকাশ আমাদের বাগ্‌ভূমির আদিতম তথা মৌলিক আলম্বন। বাগ্‌ব্যবহারের খুব সাবেক কাঠামো ও রূপকল্পের মধ্যেই তা প্রকট-অপ্রকটভাবে নিহিত থেকে, বিবর্তনপ্রবাহে তা-ই এতোদূর এগিয়ে এসেছে এবং দিকচিহ্নহীন সে-অশেষ পুরোভূমিতে মিশে গেছে।

তাহলে, উপন্যাস ও কবিতার একটি অন্যোন্যনির্ভর চূড়ান্ত সম্বন্ধ তথাকথিত আধুনিক কাব্যপ্রকরণাদিরও পূর্ববর্তী বাগ্‌ভূমি। ভাষার সেই আদি রূপকল্প-কাঠামোটিকেই যেন ভেঙে ভেঙে বস্তুনির্মাণক্ষম এক সমগ্রের নির্মাণ : রচয়িতার একটি সচেতন ও নিত্যসক্রিয় প্রয়াস। তখন কবিতার মৌলিক অভিজ্ঞতাই উপন্যাসের বাস্তবতায় অনায়াসে 'রূপকের এ একটা নূতন রূপ' হয়ে উঠতে পারে এমনকি তার চরিত্রও সেই তাৎপর্যে কতক 'মানুষের এক টুকরো মানসিক অংশ।' বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত ও সীমাবদ্ধ মানবিক অনুভূতিগুলি তো 'কেউ মানুষের নয়, মানুষের projection—' অর্থাৎ এক অথে মানুষেরও বেশি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'-এর (রচনাকাল : ১৯২৯) ভিতরের ও বাইরের গড়ন-সম্পর্কে এইরকমই ভেবেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই আমাদের বাংলা উপন্যাসের প্রথম পরবাসী-চরিত্র, যার মধ্যে 'ফুলের বেঁচে থাকবার চেষ্টার সঙ্গে কীটের ধ্বংসপিপাসার দ্বন্দ্ব'-এর রূপক, আর 'একটি নিঃশব্দ সংকেতের মতো আনন্দ'—শেষ অব্দিও প্রতীক হিসেবেই পরবাসী হেরম্বের 'অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে' কবিতার মৌলিক অভিজ্ঞতা দিয়ে উপন্যাসের বাস্তবতায় প্রতিফলিত করে। আর এর সমস্ত সংঘটন ও উপস্থাপনায়, অতঃপর, কবিতা ও কথাসাহিত্যের দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধই কালক্রমে—বলতে গেলে—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাবলিতেই—কমবেশি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপরপক্ষে, উপন্যাসে কবিতার ভূমিকা যাঁর রচনায় সবচেয়ে প্রত্যক্ষ, তিনি জীবনানন্দ দাশ। এ পর্যন্ত কবি হিসেবেই যাঁর সমধিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি, অধুনা অপ্রকাশিত-জীবনানন্দের প্রকাশ-পরিকল্পনায় ও উদ্যোগে (দ্র. জীবনানন্দ সমগ্র ১ম—৭ম খণ্ড, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস) এই লেখকের অন্তত আটটি উপন্যাস (রচনাকাল : ১৯৩৩ ও ১৯৪৮) এবং বেশকিছু গল্পের (রচনাকাল : ১৯৩১-৩৮) সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় একটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্মের সন্ধান মিলেছে। ঘটনাটি এমন নয় যে সেসব রচনাও এক অর্থে জীবনানন্দের কবিতাই। বরং এই

মনে করাই ভালো, তিনি ভিন্ন গোত্রীয় উপন্যাস রচনা করতে বসে উপন্যাস-শিল্পের মৌলিক শর্ত থেকে সরে যাননি। অবশ্য সেই মৌলিকতার সন্ধান কাব্যশিল্পের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের অনুধাবন ছাড়া প্রায় অসম্ভব। সুতরাং কবিতার ভূমিকা জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে প্রত্যক্ষ।

কিন্তু কেমন সে-ভূমিকা। তা কি—'কবির গদ্য', 'কবির গল্প-উপন্যাসের'ই মতো মনোহর অনুকম্পায়ী কোনো প্রেস-মার্ক-পাওয়া গদ্যকাব্য—যেখানে কথাবস্তু ন্যূনতম এবং চিন্তা ও বাক্ তার অফুরন্ত বক্রতায় অস্থিরতর। প্রধানত বাক্-বিপর্যাস-লক্ষণে তাঁর কথাসাহিত্যের বলবার বিষয় ও রীতি একই সঙ্গে অবশ্য বাস্তবের মাত্রান্তর ঘটায় ; কখনো, ব্যক্তি-সমাজ-পরিবেশের ত্রিমাত্রিক স্তরে—এইভাবে—ভাষাশিল্পের অন্বয়ীকরণে যুক্ত হয় চতুর্থমাত্রা এবং অনিবার্যতই উপন্যাসের বাস্তবিকতায় 'বেশি প্রকাশ' ঘটে। আর এই সংঘটনক্রিয়ায় রচয়িতার অবচেতন-মানস স্বভাবতই একটি সর্বতোমুখী প্রাধান্য পায়। অতএব, দেখা যাচ্ছে, বস্তুনিরীক্ষা তথা বিশ্লেষণের ব্যাপক অনুষঙ্গময়তায়—বিশেষত অবচেতনের ব্যাপক প্রতিফলনে—কথাসাহিত্যেও তাঁর কবিতার মতো—বাস্তব প্রায়শই অধিবাস্তবের সম্প্রসারণ লাভ করে। জীবনানন্দ দাশ তাঁর সমূহ গদ্যচর্চায় অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এই বিশেষ কাজটিই সুসম্পন্ন করেছেন। এবং সেই সৃষ্টি, তাঁর কথাসাহিত্যক্ষেত্রে যদিও কবিতারই গদ্যভাষার উৎসসম্ভূত, তবু সে-গল্প-উপন্যাসের ভাষা—'সেও এক ধরনের কবিতাই' এমন নয়। বরঞ্চ, দেশজ, গ্রামীণ-লোকায়তিক যে-একটা মৌলিক বাগ্‌ভূমির শেকড়বাকড়ের সন্ধানে তিনি তৎপর, তারই উদ্দেশে, জীবনানন্দের ভাষায় একই সঙ্গে ঐতিহ্যপ্রীতির বহুতর লুপ্ত ও সুপ্ত বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের পুনরুদ্ধার—তথা উত্তরাধিকারও একটি স্বাবলম্বনের বিবর্তন। এই বিবর্তন একটি জায়গায় এসে আমাদের কথাসাহিত্য ও কবিতার সম্পর্ককে খুবই অন্তরঙ্গ ও অন্যোন্যনির্ভর ক'রে তুলেছে।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় যেখানে যৌনতাকে বিষয় ক'রেও তার সদর্থক প্রতীকিতার মুক্তিকে ভাবতে পারেন বিপ্লব—শব্দবিপ্লব—এবং তার অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতাবোধও, তো সেটাও এই অস্থির সময়েরই প্রায়-নিয়তিকৃত একটি সত্যরূপ। এই সত্যের আর কোনো বিকল্প হয় না। সুতরাং ব্যক্তিত্বময় অনমনীয় আপস-হীন 'ঋজু ইরেক্ট্ গদ্য' তাঁর যে-কোনো নমনীয় দ্বিধার সম্মুখেই আক্রমণোদ্যত, এবং তা-ই তাঁর অন্যতম প্রধান অবলম্বন ও সমকালীন শ্রেষ্ঠ আধুনিকতা।

জীবনানন্দের উত্তরাধিকারে, তাঁরও বাস্তববোধ অধিবাস্তবের দিকে অগ্রসর। অন্যদিকে, দেবেশ রায় তাঁর মার্ক্সীয় চৈতন্যে কথাসাহিত্যের বাস্তবিকতায় শিল্প-বিন্যাসের অপরিহার্য চতুর্থ মাত্রাটিকে স্বাগত জানান। আর সেই সূত্রে, কবিতার মৌলিক অভিজ্ঞতা তাঁকেও স্বকীয় বোধবিশ্বাসের জমিতে অখণ্ড একটি দেশকাল-প্রতিমার আর্কেটাইপ-সন্ধানে ব্রতী করে। ঘুরিয়ে, অনেকটা গ্রামীণ-লোকায়তিক ভাষাশক্তির দীর্ঘসূত্রতার কথনে—তিনি একটা বিশাল মহীরুহের শাখাপ্রশাখা-জটিল জগতে আমূল প্রবেশ করেন। এই প্রবেশ, তথা প্রস্থানভূমিতেই তাঁর এপিকের আদলে আধুনিকতম আলেখ্যরচনার দায়বদ্ধতায়—একই সঙ্গে জৈব ও প্রাকৃতিক হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাসভাষা। গ্রন্থিজটিল সে-ভাষার পরতে পরতে—প্রধানত কমলকুমারেরই যোগ্যতর উত্তরাধিকারে—পলিমাটির নমনীয়তা আর গ্রানাইট পাথরে খোদিত মানবিক ভাস্কর্য প্রকাশমান। আর তাই তো—আপাতদৃষ্ট খুবই উপেক্ষিত ছোটো ছোটো জীবনের সম্মিলিত প্রবাহ ছুঁয়ে, তিনি নিয়ত সন্ধান করেন ও লিপিবদ্ধ করেন তাঁর স্বদেশাত্মারই নায়কোচিত আর্কেটাইপটি। তাঁর এই অন্বেষার ধরনটিও এমন যে তাকেও প্রধানত কবিতারই দ্বান্দ্বিক অথচ মৌলিক সম্বন্ধসূত্র থেকেই বুঝে উঠতে হবে।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কাব্যধর্মী উপন্যাস : সাধারণ অর্থে উপন্যাস মানবজীবনের সমগ্র সত্যের সন্ধান দেয়। ব্যক্তি-রূপ ও সমাজ-রূপকে এক করে, অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গকে মিলিয়ে মিশিয়ে মানুষের জীবনের যে নিটোল বিন্যাস তারই ছবি ফুটিয়ে তুলতে সতত সচেষ্ট থাকেন ঔপন্যাসিক। অবশ্য উপন্যাসের শিল্পরূপের এই বিশুদ্ধতা ঔপন্যাসিকের রূপ-দৃষ্টি ও শিল্পগত অভিপ্রায় অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। অবস্থান্তরে স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসের রূপান্তর সেক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে ওঠে। দেখা যায়, উপন্যাসের মধ্যে কখনও ইতিহাসের কাহিনী, কখনও সমাজজীবনের রূঢ় বাস্তবতা, কখনও রোমান্সপ্রিয়তা, কখনও রাজনৈতিক বক্তব্য, আবার কখনও কাব্যধর্মীব্যঞ্জনার প্রকাশ। কাব্যরসের পরিবেশন যে সবসময় উপন্যাসের মৌলধর্মকে বজায় রাখে তা নয়, তবুও এর মিশ্রণ ঔপন্যাসিকদের রচনায় অ-লক্ষ্য নয়। অথচ উপন্যাস ও কাব্য—এ দুয়ের স্বাদ একেবারেই ভিন্ন। উপন্যাসের কাছে সব থেকে বড় প্রত্যাশা সামাজিক মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। কবিতার শর্ত হলো মানুষের ভাবজগতের দ্বার উন্মোচন। কবিতা যখন উপন্যাসের

সঙ্গে মিশে যায় তখন উপন্যাসে একটা নতুন মাত্রা যোগ হয়—কাব্যধর্মী উপন্যাস যার নাম। অবশ্য কবিতার রস থাকলেই যে তা কাব্যিক উপন্যাস হবে—এমন নয়। বরং, যে-উপন্যাস চরিত্রচিত্রণের চেয়ে বর্ণনা-পদ্ধতিকে মুখ্য স্থান দেয় এবং এই বর্ণনারীতিকে লাবণ্যমণ্ডিত করার জন্য কবিতাসুলভ ভাব ও ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ভাষায় দুরবগাহ ইঙ্গিতময়তার একটি গূঢ় ব্যঞ্জনা থাকে তাকে চেনা যায় কাব্যধর্মী উপন্যাস বলে। অন্তর্জীবনের অন্তরঙ্গ নিভৃত রূপটি এ ধরনের উপন্যাসে বড় কাছাকাছি থাকে। এই রীতি কিছুটা হাল আমলের। আনন্দ বাগচীর 'স্বকাল-পুরুষ', নচিকেতা ভরদ্বাজের 'অন্যরূপ রূপান্তর' এ ধরনের রচনা।

কাব্যধর্মিতা উপন্যাস-রচয়িতার একটি বিশেষ গুণ এবং এই কাব্যময় উপস্থাপনা রীতির মূল লক্ষ্যই হল উপন্যাসের চরিত্রগুলির অন্তরতম জগতকে সংগীত ও চিত্রকল্পময় ও গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করা। মানুষের মনোজগতের সত্য বা 'inner reality'র রহস্যময় চেতনা যখন উপন্যাসের শিল্পরূপ গড়ে তুলতে সাহায্য করে তখন ঔপন্যাসিককে এক ধরনের কাব্যিক পরিবেশের আশ্রয় নিতে হয় এবং বলাই বাহুল্য এই কাব্যসুলভ পরিমণ্ডল উপন্যাসের বিষয়-বিন্যাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এই অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় সকল লেখকের উপন্যাসই কমবেশি কাব্যলক্ষণাক্রান্ত ; কিন্তু তাঁদের জীবনদৃষ্টির পার্থক্যে, বিষয়ের বিভিন্নতায়, বক্তব্যের বৈচিত্র্যে উপন্যাসের রূপেরও পরিবর্তন হয়। রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যে-অর্থে কাব্যধর্মী উপন্যাসের স্রষ্টা, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা নন। আবার, 'রোমান্স'ও এক অর্থে কাব্যধর্মী উপন্যাসের সগোত্র। কারণ রোমান্সের উচ্ছ্বাসময়তা, কল্পনার লীলাচাপল্য, বাস্তববিমুখতা, অতীতচারিতা একে কাব্য-সৌন্দর্যে অভিষিক্ত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা,' উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্তরাগ' এই শ্রেণীর।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় রোমান্সের মিশ্রণ অত্যন্ত বেশি মাত্রায় দেখা যায়। এর কারণ হলো তখনও পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের কোন প্রথাসিদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত তাঁর ঝোঁক ছিল প্লট,

বুলওয়ার লিটন, চার্লস কিংসলির রচনা পাঠের, আর সর্বোপরি তাঁর রোমান্স-প্রীতি জেগেছিল অতীত ইতিহাসচেতনা থেকে। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক প্রবণতা ছিল কাব্যিক রোমান্সের দিকে, দূর অতীতের রোমান্টিক পরিবেশের দিকে। কিন্তু এই অতীত সম্বন্ধে জ্ঞান লেখকের কাছে অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত, ও বিকৃত ছিল। সেইসব ছায়াময় স্থান তিনি ঐতিহাসিক ভাবকল্পনার সাহায্যে পূরণ করেছেন এবং 'উপন্যাসে কাব্যের ঝংকারও এই রোমান্টিক ভাব-কল্পনারই অন্য দিক।' বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী—এই উপন্যাসগুলিতে রোমান্সধর্মিতা প্রবল। আবার বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত রাজসিংহ আনন্দমঠ দেবীচৌধুরাণী সীতারাম সাধারণভাবে ঐতিহাসিক রোমান্সের নিদর্শন। আসলে উপন্যাস রচনার অন্তরালে সক্রিয় থেকেছে বঙ্কিম-চন্দ্রের মহৎ আবেগ-গম্ভীর ও দূরবিস্তারী কল্পনাপ্রবণ এক কবিদৃষ্টি। এর মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' বিশেষভাবে কাব্যধর্মী উপন্যাসরূপে পরিকল্পিত—গদ্যের আধারে এখানে কাব্যরস পরিবেশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই রোমান্টিক মানসিকতা আশ্রয় করেছে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানবলোকের গভীর আত্মীয়তাকে, জীবনের অতীন্দ্রিয় রহস্যানু-ভূতিকে, মানবজীবনের গভীর-সমাহিত অন্তরলোককে। এই রোমান্টিকতা বিশেষভাবে অন্তর্মুখী এবং এই রোমান্টিকতাই রবীন্দ্র-উপন্যাসে কাব্যের মধুর ব্যঞ্জনা ও নম্র স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে। বস্তুত 'রবীন্দ্রমানস একান্ত ভাবে গীতিধর্মী।' রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কথারসে নয়, ভাবরসে। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'-কে বাদ দিলে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমাজজীবননিষ্ঠ মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'। তারপর প্রবাসী-তে 'গোরা'। সবুজপত্রের যুগে এসে রবীন্দ্র-উপন্যাসের কিছু মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ পরিবর্তন যেমন ভাবগত তেমন রূপগত। আসলে এ সময়ে তিনি ব্যক্তির অস্তিত্বের নানাবিধ দ্বন্দ্ব-সমস্যাকে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক প্রকরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে চাইছিলেন এবং তিনি আরও চাইছিলেন সংগ্রহ করতে 'উপন্যাসের এমন একটি রূপ যা কবির স্বভাবের পক্ষে অনুকূল। তার ভিতরকার কথাটি যাতে প্রশ্রয় পায়, কবিত্ব সহ-যোগী হয় কথাশিল্পে।' শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের পারস্পরিক সম্পর্কের অতি সূক্ষ্ম জটিলতা (চতুরঙ্গ), বিমলা-সন্দীপ-নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের সংঘাত (ঘরে

বাইরে), মধুসূদন ও কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবনের সংকটের চিত্র (যোগাযোগ), অমিত-লাবণ্যের রোমান্টিক প্রেমের রহস্য (শেষের কবিতা) প্রভৃতি ঘটনাগুলি বলা যায়, উপন্যাসের চেয়ে কাব্যজগতের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এ পর্বের উপন্যাসের প্রধান শিল্পবৈশিষ্ট্য-ই ছিল সুগভীর লিরিক ব্যঞ্জনা। 'শেষের কবিতা'কে তো স্পষ্টই বলা হয়েছে 'চরম কাব্যোপন্যাস।'

'শেষের কবিতা' বুদ্ধদেব বসুকে যে একদা যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল তা তিনি জানিয়েছেন। 'শেষের কবিতা' প্রকাশিত হবার আগে তাঁর কোন উপন্যাসই প্রকাশিত হয়নি। প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস 'সাড়া' থেকে আরম্ভ করে 'যেদিন ফুটলো কমল', 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'বাসর ঘর', 'ধূসর গোধূলি' প্রভৃতি উপন্যাসের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে লেখকের আত্মগত রোমান্টিক কাব্যময়তা। আসলে প্লট-প্রধান উপন্যাসে যে বুদ্ধদেবের অনাগ্রহ ছিল তার মুখ্য কারণই হলো কাব্যধর্মী কাহিনীর মধ্যে এক ধরনের সুখকর তৃপ্তিবোধ। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সুতীব্র মমতা—এই ছিল তাঁর যশপ্রতিষ্ঠার সোপানভূমি। আবার তাঁর এই কাব্যধর্মিতার বড়ো সহায়ক হয়ে উঠেছে 'ইম্প্রেসনিজম্' রীতি প্রয়োগ-পদ্ধতি। 'বাসর ঘর' উপন্যাসটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, 'গল্প হিসাবে তোমার এ লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বয়ে চলেছে।' এখানে 'মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট—কবিতারই অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য।'

'কল্লোল'-পর্বের আর এক সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এঁর রচনা-রীতির সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর লিখনশৈলীর মোটামুটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন 'অচিন্ত্য-বুদ্ধদেবের কবিত্ব উপন্যাসের মধ্যে সর্বব্যাপী ; তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণপ্রণালী একান্তভাবে কাব্যধর্মী।··· মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ যেন কাব্যের সোনালী কাপড়ের সীমান্তে একটু ছোট পাড়, কবিতার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসকে ধরিয়া রাখিবার জন্য একটু উচ্চ তটভূমি মাত্র।' তাঁর 'প্রচ্ছদপট', 'রূপসী রাত্রি,' 'প্রথম প্রেম' প্রভৃতি কাব্যধর্মী উপন্যাসের আঙ্গিকে রচিত। এই পর্যায়ের আরো একটি উপন্যাস মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা'র মনস্তত্ত্বসম্মত আখ্যানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী উপন্যাসের টেকনিকের কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন অর্থেই কল্লোলীয় লেখক নন। শিল্পীমাত্রেই এক

অর্থে রোমান্টিক কবিদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পী। কিন্তু মানিক ছিলেন একাধারে কবিজনো-চিত রোমান্টিক এবং বিজ্ঞাননিষ্ঠ বাস্তবতাবোধের অধিকারী। তাঁর একুশ বছর বয়সে লেখা 'দিবারাত্রির কাব্য'-তে কিছু রোমান্টিক কাব্যময় ধারণার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তা বলে উক্ত উপন্যাসটিকে ঠিক কাব্যধর্মী উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা চলে না। এটি 'একটি বস্তু-সংকেতের কল্পনামূলক রূপক কাহিনী।' হেরম্বের জীবনে দুটি নারী নিয়ে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি তা-ই নিয়েই এ উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে।

জীবন-বৈচিত্র্যের রসমাধুর্য পরিবেশন করাই বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) আসল লক্ষ্য ছিল। এই ধরনের একটি উপন্যাস 'লক্ষ্মীর আগমন'—কিছুটা কাব্যলক্ষণাক্রান্ত। জ্যোৎস্নারাত্রের মোহময় বিস্তীর্ণ পরিবেশে পৃথিবীর মায়াময় রূপের বর্ণনা করেছেন লেখক—'ইহার মানব চরিত্রগুলি যেন এই জ্যোৎস্না সমুদ্রের এক একটি ফেন-শুভ্র বুদ্বুদ্।' এরকমই মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের 'মধুরে মধুর' উপন্যাসটি। ভক্তিরসাশ্রিত নৃত্যলীলা যে কল্পনাব সৌন্দর্যজগত সৃষ্টি করে তারই বর্ণনা এখানে।

আলো সরকার

কারা উপন্যাস: বাংলা দেশের সাহিত্যে বৈপ্লবিক আন্দোলন একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এর কারণ ইংরাজের কারাব্যবস্থা। এখানে বৈপ্লবিকতা প্রায়ই চরম-হিংসামূলক কর্মপদ্ধতির পরিণতি পথও পৌঁছুতে পারেনি—মানস-কল্পনার রক্তচ্ছবি কার্যে রূপ পরিগ্রহ করার পূর্বে ইংরাজের সদা-সতর্ক প্রতিরোধ-ব্যবস্থা তাকে জেলখানার লৌহগরাদের অন্তরালে বন্দী করেছে।

সাধারণ জীবনের সঙ্গে জেলখানার জীবনের একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, এখানে বেছে বেছে সমস্ত উৎকেন্দ্রিক, অসাধারণ, ভালো বা মন্দের দিক দিয়ে তীক্ষ্ণ-বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত চরিত্রের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সংসারে যে গড়-পড়তার প্রাদুর্ভাব, যে সুনির্দিষ্ট ছন্দের প্রচলন, এখানে তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সমাজে যে সমস্ত ব্যক্তির অসামাজিক মনোবৃত্তি, যারা দশের মধ্যে নিজেকে নিশ্চিহ্নভাবে মেলাতে অক্ষম, যারা আকাঙ্ক্ষার প্রবলতায় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উগ্রতায় সর্বদা সমাজনির্দিষ্ট সীমা-লঙ্ঘনে প্রবণ, তারাই এক অনতিক্রম্য মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাবে কারাগৃহের আতিথেয়তার বন্ধনে ধরা দেয়—জেলখানার

চুম্বক-শক্তি এই লৌহকণাগুলিকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করে। কাজেই এখানে চিন্তাশীল, মানবের প্রকৃতি-রহস্যভেদে আগ্রহশীল ব্যক্তি তাঁর কৌতূহল-নিবৃত্তির বিচিত্র ও প্রচুর উপাদান একত্র সংগৃহীত দেখতে পান। আর যাঁরা প্রকৃত পরার্থপর ও স্বদেশপ্রেমিক, যাঁরা চিত্তের আদর্শবাদের প্রেরণায় অত্যাচারী-শক্তি-প্রণীত আইন ভঙ্গ করে কারাগারে স্থান পেয়েছেন, তাঁদের অন্তরের সমবেত ঊর্ধ্বমুখী অভীপ্সা যেন এর নিরানন্দ, অন্ধকার আবহাওয়ার মধ্যে আত্মার অবিকল্প দেয়ালী উৎসব রচনা করে। যে অগ্নিশিখা জঞ্জালস্তূপ পোড়াতে বা প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলো না, তাই যেন প্রাণের আরতি জ্বালিয়ে অপরাজেয় আদর্শের বেদীমূলে অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়। কারাগারের নিরবচ্ছিন্ন অবসর আত্মানুশীলনের সুযোগ দিয়ে অনেক আত্মবিস্মৃত সাহিত্যিকের লুপ্ত শক্তি স্ফুরিত করেছে। মনে হয় যে জেলের কর্মবিক্ষেপহীন, প্রশান্ত বিরতিটুকু না পেলে অনেকেই নিজ সাহিত্য-রচনার শক্তি সম্বন্ধে চিরকাল অবচেতনই রয়ে যেতেন। কাজেই বাংলা দেশে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে জেলখানা সাহিত্য-সাধনার পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। অখণ্ড অবসর, গভীর আত্মবিশ্লেষণ, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয়, জীবনের কোলাহল হতে দূরে থেকে দার্শনিক নিরাসক্তির সঙ্গে জীবন-পর্যবেক্ষণ, মতবাদ-সংঘর্ষের অনুচিত প্রভাব থেকে মুক্ত সত্যানুসন্ধিৎসা—এই সমস্ত বাইরের ও অন্তরের উপাদান-সমবায়ে, কারা-প্রাচীরের অন্তরালে, এর লৌহকঠোর বিধিনিষেধের রন্ধ্রপথে এক নতুন ধরনের সাহিত্য রচিত হয়েছে। আত্মাবমাননার ভস্মশয্যা থেকে আত্মবিকাশ ও আত্ম-সম্প্রসারণের এক অভিনব জীবনীশক্তি মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

আমি কারাসাহিত্য বা কারা উপন্যাস অর্থে কারাগারে রচিত সমস্ত সাহিত্যকে নির্দেশ করছি না—কারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপাদানস্বরূপ ব্যবহার করে যে সাহিত্য রচিত তাকেই উক্ত নামে অভিহিত করছি। কারাগারের প্রচুর অবসরে কারাগারের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট উপন্যাস কেউ যদি রচনা করেন, তার সঙ্গে জেলের সম্পর্ক শুধু ভৌগোলিক প্রতিবেশমূলক, অন্তরঙ্গ নয় ;—তার উপর জেলজীবনের ছাপটি মুদ্রিত হয়নি। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসবাদ-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত সাহিত্য কারাগারের বাইরে, বিপ্লববাদীর স্বাধীন, অথচ অনিশ্চিত ও আশঙ্কা-কণ্টকিত জীবনের আশ্রয়ে রচিত হয়েছে, সেগুলিকেও কারাসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করতে পারি না। আসন্ন সর্বনাশের অশ্রান্ত অনুসরণ থেকে আত্মগোপন

চেষ্টায় উদ্‌ভ্রান্ত, শিকারের পশুর ন্যায় সমস্ত আশ্রয়স্থল থেকে মুহুর্মুহু উৎক্ষিপ্ত, জীবনমৃত্যুর সীমারেখায় সর্বদা অস্থির চরণে দণ্ডায়মান অস্তিত্ব কয়েকটি জ্বরাতুর, বিভীষিকাগ্রস্ত, দুঃস্বপ্নতাড়িত মুহূর্তের সমষ্টিতে সঙ্কুচিত হয়—এর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি সাধারণ প্রবাহ ও পরিণতি হারিয়ে একপ্রকার অস্বাভাবিকরূপে তীক্ষ্ণ, আত্মকেন্দ্রিক বিকারের মতো প্রতিভাত হয়। যেন নদীর সহজ, বিসর্পিত প্রবাহ জলপ্রপাতের দুর্বার বেগ ও ফেনিল বিক্ষোভের ব্যর্থ চক্রাবর্তনে নিজেকে নিঃশেষিত করেছে—যেন মুহূর্তের দুঃসাহসিকতা সমগ্র জীবনের বিস্তৃতি ও প্রসারকে নিজের মধ্যে সংহরণ করে নিয়েছে। বিপ্লবীর যে জীবনে বাইরের অভিভব স্বাধীন ইচ্ছাকে পর্যুদস্ত করেছে, যা আকস্মিকের তাড়নায় অসম ছন্দে ছুটে চলে, যার প্রাণশক্তি স্বল্প রন্ধ্রপথের ভিতর দিয়ে অবরোধমুক্ত ফোয়ারার ন্যায় শতধারে অজস্র অমিতব্যয়িতায় নিজেকে ফুরিয়ে দেয় তারও কাহিনী নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে। কিন্তু এটি ঠিক কারা উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারা-জীবনের প্রচুর, বাধাহীন অবসর, এর মন্থর মননশীলতা, এর ঈষৎ-মোহভঙ্গ-স্পৃষ্ট অতীত-পর্যালোচনা, এর নিরাসক্ত অন্তর্দৃষ্টি, জীবনের নানা অপ্রত্যাশিত বিকাশের বিস্মিত উপলব্ধি—কারা-প্রাচীরের বাইরে অতিবাহিত সন্ত্রাসবাদীর জীবনযাত্রার মধ্যে মেলে না।

এই কারা-সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নিদর্শন পাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণপুরী'তে। কারাকক্ষে কিরকম অদ্ভুত চরিত্রের একত্র সমাবেশ হয়, জেলের নিয়মকানুনের ফাঁকে ফাঁকে তাদের জীবনধারা কিরকম আঁকাবাঁকা পথে, আইন ফাঁকি দেবার কিরকম নতুন নতুন উপায়-উদ্ভাবন-কৌশলের সহায়তায়, জেলের নিম্নশ্রেণীর খবরদারীওয়ালার সঙ্গে কেমন সুনিপুণ বোঝাপড়ার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, তার প্রথম চিত্র পাই ঐ উপন্যাসটিতে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসটি কারা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে বিবেচিত হতে পারে। জেল-জীবনের এমন পূর্ণাঙ্গ, তথ্যবহুল ও মননশীলতা-সমৃদ্ধ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। এক পরিবারের চারজন ব্যক্তি এই উপন্যাসের চারটি অধ্যায়ে নিজ নিজ পূর্বস্মৃতি-রোমন্থন ও জীবন-দর্শনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

কারা-সাহিত্যে অতীন্দ্রনাথ বসুর 'বি-কেলাস' আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এটি ঠিক উপন্যাস নয়, গভীর মননশীলতার ফ্রেমে বাঁধা কয়েকটি

বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমষ্টি। লেখকের উদ্দেশ্য কারাজীবনের একটা তথ্যগত বিবৃতি নয়, এর কঠোর আইন-বিধানে আবদ্ধ দৈনন্দিন জীবনধারার একটা নিখুঁত প্রতিলিপিকরণ নয়। তাঁর মনোভাব ঐতিহাসিকের বা স্বদেশপ্রেমিকের নয়, মানবপ্রকৃতির অফুরন্ত বৈচিত্র্যপিয়াসী কৌতূহলী দার্শনিকের।

'লৌহকপাট' (তিন খণ্ড) গ্রন্থে কারাজীবনের সম্পূর্ণ অভিনব জীবনচিত্রটি নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। লেখক 'জরাসন্ধ' তাঁর কারাজীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সহানুভূতি ও শিল্পজ্ঞান নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তা আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। তবে 'লৌহকপাট' ঠিক উপন্যাস নয়, অনেকগুলি উপন্যাসধর্মী খণ্ড ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনীর সমষ্টি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কালানৌচিত্য (অ্যানাক্রনিজ্‌ম): কালানৌচিত্য, কিংবা 'কালবিরোধ' অথবা 'কালাতিক্রমণ'—যা-ই বলি না কেন, এদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই আমাদের পরিচয় হয় সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকর্মে। কখনও অতি-ক্রান্ত কোন কিছু স্থান পেয়ে যায় বর্তমানের অঙ্গনে আর কখনও বর্তমান মিলিয়ে যায় হারানো দিনে; আবার ভবিষ্যৎ এসেও সোরগোল তোলে সমকালে। কালের সঙ্গে যখনই হিসেবে মেলে না কোন কিছুর, তখনই আমরা বলে থাকি কালবিরোধী, কিংবা কালাতিক্রমণশীল,—কালের ঔচিত্যবোধ ক্ষুণ্ণ হলো। সাহিত্যে 'অ্যানাক্রনিজ্‌ম' নামেই ব্যাপারটি সমধিক পরিচিত।

এমনটি যে ঘটে যায় তার প্রমাণ আছে, কিন্তু কেমন করে ঘটে আমাদের তা অপরিজ্ঞাত। হয়ত তথ্যের অভাব, হয়ত একটু সতর্কতার অভাব। দূর অতীতের ক্ষেত্রে এই 'অতিক্রমণ' হয়ত খুব মারাত্মক নয়, কিন্তু অব্যবহিত অতীতের কাছে আমাদের দাবিও অব্যবহিত, সুতরাং সেক্ষেত্রে সামান্য সমস্যা দেখা দেয়। ব্যাপারটি ঘটতে পারে উভয়তই। কখনও ভাবানুষঙ্গে, কখনও কোন প্রত্যক্ষ ঘটনার বিস্তারে। তাছাড়া কালের পক্ষে অসম্ভব কোন শব্দের প্রয়োগ, কোন বস্তুর উল্লেখ—এরাও সব দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রভাস' কাব্যে ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্য-নাম-মাহাত্ম্যের যে প্রগল্‌ভ প্রক্ষেপ ঘটেছে তাকে 'কালাতিক্রমণ' বলেই চিহ্নিত করব। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা'য় 'সমকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকার বর্ণনায় কিছু কালাতিক্রমণ আছে' বলে মন্তব্য করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—'যেন ১৯৩০ সালের

প্রেক্ষাপটে ১৯২৪ কে বিন্যস্ত করা হয়েছে।'

আসলে এ সম্ভাবনা বেশি থাকে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক তথা ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনীতে। ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনীর আরেকটি সম্ভাবনা থাকে, সেটি অনৈতিহাসিকতা। কিন্তু অনৈতিহাসিকতা আর কালাতিক্রমণ ঠিক এক নয়। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে 'পিসী-ভাইঝির মদন-মন্দিরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা' অনৈতিহাসিক হতে পারে, কিন্তু কালের পক্ষে প্রগল্‌ভ নয় কিছুতেই। কিন্তু 'আনন্দমঠে' যে দুর্ভিক্ষের চিত্র আছে তা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের। কিন্তু সেই মন্বন্তরের আগেই মৃত্যু হয়েছে মীরজাফরের। অথচ, এই উপন্যাসে অরাজকতার আংশিক দায়িত্ব মীরজাফরের, এমন কথাই আছে। এই যোগসূত্র একই সঙ্গে অনৈতিহাসিক এবং কালাতিক্রমণশীল।

প্রকৃতপক্ষে এইসব দৃষ্টান্ত কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করে আখ্যায়িকাকে? খুব প্রবলভাবে নয় অন্তত। তথ্যের খাতিরে আমরা যাচাই করি বটে, কিন্তু এই খুঁটিনাটিগুলো রসনিষ্পত্তিতে বিঘ্ন ঘটায় না তেমন। 'আইভ্যান হো'-তে ধর্মযুদ্ধের ভ্রষ্ট ইতিহাস কিংবা 'অ্যান্টনি এ্যাণ্ড ক্লিয়পেট্রা'র মধ্যেকার কিছু তথ্য-বিকৃতি সত্ত্বেও 'যে একটি ঐতিহাসিক রসের অবতারণা' সম্ভব হয়েছে, 'তাহা ইতিহাসের নূতন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবে না।' তবে একথা ঠিক, যদি কোন বিশেষ ঘটনা বা বিশিষ্ট চরিত্রের কোন তাৎপর্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয়ে থাকে, তবে তা বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠবে অবশ্যই। যেমন, টেগার্টে'র কাছে নলিনী বাগ্‌চীর মৃত্যুকালীন উক্তিটি ব্যবহৃত হয়েছে 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে পূর্ণর মুখে। এবং খুবই সংগতভাবে এই ব্যবহার আমাদের স্পর্শকাতরতাকে রূঢ়ভাবে স্পর্শ করে। প্রসঙ্গত মনে হয় অব্যবহিত পূর্ব-ইতিহাস সম্পর্কে একটু বেশি সতর্কতার প্রয়োজন আছে। না হলে সেগুলো কখনও কখনও অশোভন লাগে। লেখক আর পাঠকের মধ্যে এমনটি না ঘটাই ত বাঞ্ছিত এবং প্রত্যাশিত।

সরোজ দত্ত

গথিক নভেল : দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে প্রচলিত বিশেষ স্থাপত্যরীতিকে 'গথিক রীতি' বলা হয়। মধ্যযুগে গ্রীক-সভ্যতার অবসানে গ্রীকস্থাপত্যের সঙ্গে বৈপরীত্যসূত্রে গথিক স্থাপত্যের প্রসার নির্দেশ করা হয়ে থাকে। গথ্ জাতির সঙ্গে প্রাগ্‌সভ্যতা তথা বর্বরতার ঘনিষ্ঠ যোগ। গথিক শিল্প সরল, ('pointed arch style') কিন্তু পরবর্তী কালে

গথিক রীতিতে নানা মিশ্রণ ও জটিলতা দেখা দেয়। সাহিত্যে 'গথিক রীতি' মধ্যযুগীয় সাহিত্যে প্রকাশিত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাহিত্যে গথিক রীতির পুনরুত্থান ঘটে, এবং মধ্যযুগীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য এক মোহময় অন্তর জগতের সন্ধান দেয়। ইংল্যাণ্ডে অগাস্টান কবিসাহিত্যিকদের রচনায় গথিক রীতির প্রতি আকর্ষণ দেখা দিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে উপন্যাসে, বিশেষত ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে মধ্যযুগের আবহাওয়াকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা লক্ষ্য করি। এই চেষ্টার সূচনা জার্মানীতে, পরে অন্যান্য দেশেও তার প্রসার ঘটে। ইংরেজি সাহিত্যে গথিক উপন্যাসের সূচনা স্মোলেটের লেখায় (দ্র. *Ferdinand Count Fathom*, ১৭৫৩), সাফল্যের দৃষ্টান্ত হোরেস ওয়ালপোলের বিখ্যাত '*Castle of Otranto*' (১৭৬৪)। ওয়ালপোলের উপন্যাসের পটভূমি মধ্যযুগীয় একটি দুর্গ—যার ভূগর্ভস্থ কক্ষ অন্ধকারে ঢাকা, ধুলোভরা সিঁড়ি ও দালান, রহস্যময়ভাবে দরজাগুলি আকস্মিক খোলে এবং বন্ধ হয়। শিহরণ উদ্রেককারী ভয়ঙ্কর আবহাওয়া গথিক উপন্যাসের প্রাণ। গথিক উপন্যাসে স্থায়ীভাব বিস্ময়, গঠন সরল, চমৎকারিত্ব ক্ষণে ক্ষণে। অতিলৌকিকের ব্যবহারেও গথিক রীতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

দীপেন বসু

গোয়েন্দা কাহিনী: গোয়েন্দা কাহিনীতে একটি অপরাধের ঘটনাকে ঘিরে একটি আকর্ষক বর্ণনামূলক আখ্যান রচিত হয়ে ওঠে। এই অপরাধ সাধারণত হত্যাকাণ্ড, কখনও দুঃসাহসিক চুরি বা ডাকাতি, কখনও বা একটি দেশ অথবা জাতির পক্ষে হানিকর কোনও সমাজ-বিরোধী অপকর্ম, বা সাধারণভাবেই মানবকল্যাণের পরিপন্থী এক হীন গুপ্তকর্মের আকারে দেখা দেয়। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ সামর্থ্য, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রখর বুদ্ধি ও ক্ষিপ্র কর্মনৈপুণ্যের সাহায্যে সত্যসন্ধানী গোয়েন্দা ঐ অপরাধজনিত সমস্যার সমাধান করেন। গোয়েন্দা হতে পারেন বেতনভোগী কোনও পুলিশ-কর্মচারী, নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অপরাধরহস্য তথা অপরাধীর পরিচয় উদ্‌ঘাটনে তৎপর কোনও পেশাদার অনুসন্ধানজীবী বা কোনও শৌখিন সত্যান্বেষী। তাঁর প্রধান অভীষ্ট হয়ে ওঠে, অপরাধ সম্পাদনের সম্ভাব্য অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধি বিচার ক'রে, অপরাধ সংঘটনের পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিক পর্যালোচনা ক'রে, ছিন্নসূত্র বা আপাতসূত্রবিহীন দৃশ্যত দুর্ভেদ্য ঘটনারাজির কার্যকারণপরম্পরা

তীক্ষ্ণভাবে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ ক'রে, অপরাধী বা অপরাধীদের সঠিক সনাক্ত-করণ। এই উদ্দেশ্যেই গোয়েন্দা উপযোগী নানা তথ্য সংকলন ক'রে যুক্তি-নির্ভর অনুসন্ধানে অগ্রসর হন এবং আশ্রয়বাক্য (প্রেমিস) থেকে অনুমানের (ইন্‌ফারেন্স) মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে (কন্‌ক্লুশন্) উপনীত হন। গোয়েন্দা কাহিনী সাধারণ পাঠককে আকর্ষণ করে গঠনের ঔজ্জ্বল্যে ও চমৎকারিত্বে, স্থান ও পরিস্থিতির সানুপুঙ্খ বর্ণনার সাহায্যে আবহনির্মাণের নৈপুণ্যে—যার মধ্য দিয়ে প্রায়শই সম্ভব হয়ে ওঠে অশুভ ঘটনার শঙ্কিল ছায়াপাত—উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার ক্রমবৃদ্ধিতে, বুদ্ধি ও যুক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায়। গোয়েন্দা কাহিনীতে অনিবার্য-ভাবেই ঘটনার গতি ও চমৎকারিত্ব বেশ কিছুটা গুরুত্ব পায়, কিন্তু তা সর্বাত্মক আধিপত্য বিস্তার করলে রচনা পর্যবসিত হবে ক্ষণিকের বুদ্‌বুদবিলাসে। কিছুটা স্থায়িত্বলাভের যোগ্য হতে হলেও গোয়েন্দা কাহিনীকে কথাসাহিত্যের সাধারণ গুণ অর্জনের প্রয়াস করতে হবে। চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, চরিত্রগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন, কচিৎ এরই মধ্য দিয়ে মানবজীবন, মানবচরিত্র ও মানবভাগ্য সম্পর্কে মৌল সত্যের উদ্‌ভাসন—এই বৃহত্তর লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হলে তবেই গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক তাঁর রচনাকে নিছক জন-মনোরঞ্জক আখ্যানের সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে মুক্তি দিতে পারবেন।

সাধারণভাবে এ সত্য স্বীকৃত যে এডগার অ্যালান পো-ই প্রথম, শৌখিন গোয়েন্দা অগুস্ত দ্যুপ্যাঁ-র বুদ্ধিদীপ্ত অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের বৃত্তান্ত-সংবলিত 'দি মার্ডার্স ইন্ দি রু মর্গ' শীর্ষক কাহিনীতে গোয়েন্দা কাহিনীর নিজস্ব প্রকরণটির একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত রূপ উপস্থিত করেন। এর মধ্যে কয়েকটি উপাদানের দেখা মিলল, যা অচিরেই গোয়েন্দা কাহিনীর সুনির্দিষ্ট প্রথায় পরিণত হলো। এই উপাদানগুলিকে একটি ছকের মধ্যে এইভাবে সাজানো যেতে পারে: ১. দৃশ্যত নিখুঁতভাবে সংঘটিত অপরাধ (যেমন ভিতরের দিক থেকে বন্ধ ঘর)। ২. ভুল ক'রে এমন একজনকে অপরাধী বলে সন্দেহ ও গ্রেপ্তার, যার দিকে উপস্থিত সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণই অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। ৩. পুলিশের স্থূল নির্বোধ আনাড়িপনা; অপরাধ-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছে ভেবে পুলিশ অফিসারের আত্মতৃপ্তি, নতুন ক'রে অনুসন্ধান শুরু হওয়ায় তার বিরক্তি ও হতাশা, গোয়েন্দার অনধিকারচর্চা বিষয়ে তার তির্যক কটাক্ষ। ৪. তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি-এবং ক্ষিপ্রতর বুদ্ধি-সম্পন্ন গোয়েন্দা যার নৈপুণ্য তার খামখেয়ালি

আচরণ ও অভ্যাসের পরিচয়ে আরও যেন আকর্ষক হয়ে ওঠে। ৫. গোয়েন্দার গুণমুগ্ধ এবং অপেক্ষাকৃত মন্থরবুদ্ধি সহযোগী যিনি কাহিনীকথক তথা বৃত্তান্ত-লেখকের ভূমিকায় নিয়োজিত হয়েছেন। ৬. কাহিনী থেকে এই স্বতঃসিদ্ধ ধারণা নিষ্পাদিত হয়ে আসে যে আপাত-পর্যবেক্ষণে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ নিশ্ছিদ্র প্রত্যয়-উৎপাদক মনে হয়, পরিণামী বিচারে সেগুলি সবসময়েই অবান্তর প্রতি-পাদিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে পরবর্তীকালের গোয়েন্দা কাহিনীর বিকাশ ও বিবর্তনে যে দুটি প্রধান ধারা—ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীর যুক্তি-গ্রাহ্য বিশ্লেষণপ্রবণ বুদ্ধিগত ধারা এবং মার্কিন গোয়েন্দা কাহিনীর রোমাঞ্চকর ও তীব্র উত্তেজনামূলক ধারা—সুস্পষ্ট পার্থক্যে লক্ষ্যগোচর হয়ে ওঠে, তাদের উভয়েই উৎসারিত হয়েছিল পো-র রচনা থেকে।

পো-র ধারাই অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন আর্থার কনান ডয়েল। 'এ স্টাডি ইন্ স্কার্লেট'-এ (১৮৮৭) শার্লক হোম্‌সের দীর্ঘ, কিছুটা অনিয়মিত, অনুসন্ধান-বৃত্তান্ত রচনার যে সূত্রপাত করলেন কনান ডয়েল, তাতে ঐ ধারাই আরও গভীর ও মানবিক হয়ে উঠল; মূল পরিকল্পনা অধিকতর সমৃদ্ধ হলো গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌সের বিচিত্র ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে, তাঁর সহযোগী ও কাহিনী-কথক ডাঃ ওয়াটসনের চরিত্র বর্ণাঢ্য ক'রে তোলায়। আর প্রযুক্তি-বিদ্যার নাটকীয় প্রয়োগকৌশলে, চিকিৎসাবিজ্ঞান তো বটেই, বিজ্ঞানের অন্যান্য নানা শাখারও তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে, অপরাধ-রহস্যের উদ্‌ঘাটন-প্রয়াসকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা হলো। কনান ডয়েলের পর ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীর আর এক স্মরণীয় রচয়িতা আগাথা ক্রিস্টি। তাঁর প্রথম গোয়েন্দা কাহিনী 'দি মিস্টিরিয়স অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইল্‌স্' প্রকাশিত হয় ১৯২০-তে। এতেই তাঁর প্রধান গোয়েন্দা ফরাসিভাষী বেল্‌জিয়ান এরকিউল পোয়ারোর আবির্ভাব। ক্রিস্টির সৃষ্ট দ্বিতীয় গোয়েন্দা বর্ষীয়সী, অবিবাহিতা, গ্রাম্য রমণী মিস্ জেন মার্পল, যিনি তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যেই অপরাধ-সমস্যার সমাধান করেন। মার্কিন গোয়েন্দা কাহিনীর তিনজন প্রতিনিধিত্ব-মূলক লেখক হলেন: ড্যাসিয়েল হ্যামেট, রেমণ্ড শ্যাণ্ডলার ও রস ম্যাকডোনাল্ড।

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর ইতিহাসে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাই সবাধিক সাহিত্যগুণঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতির চমক, ঘটনার রুদ্ধশ্বাস গতি —এসব ছাপিয়ে সেখানে চরিত্রসৃষ্টি, দুর্জ্ঞেয় জটিলতার প্রকাশে, বিচারবিভ্রান্তির

মর্মান্তিকতায়, প্রায়শই স্মরণীয় হয়ে ওঠে। 'মাকড়সার রস' গল্পে এক বৃদ্ধের ব্যাধিত মনোবিকার ও 'অগ্নিবাণ' গল্পে এক শান্তিকামী প্রতিভাবান বিজ্ঞান-গবেষকের ভয়ংকর-করুণ লক্ষ্যভ্রষ্টতা আমাদের নিহিত চেতনাকে অধিকার ক'রে নেয় এবং মানুষের জীবন, চরিত্র ও ভাগ্যের দুজ্ঞেয় রহস্যময়তায় মগ্ন করে।

অরুণকুমার ঘোষ

ঘটনাপ্রধান উপন্যাস : বাস্তবধর্মী সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রকার হলো ঘটনাপ্রধান উপন্যাস। জীবনের পরিধি ঘটনাকে ঘিরেই বিস্তৃতিলাভ করে। তাই ঘটনাপ্রধান উপন্যাসে জীবনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। এই ধরনের উপন্যাসের প্লট বা কাঠামো এক বা বহু ঘটনাকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়। ফলে, এই ধরনের উপন্যাস বাস্তবিক পক্ষে কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি। এই উপন্যাসে ঘটনা মুখ্য, চরিত্র গৌণ ও চরিত্র ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত। স্বভাবতই কাহিনী ঘটনাকে কেন্দ্র করে থাকে। এখানে কোন একটি ঘটনার পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকে না। মুখ্য ঘটনার সঙ্গে অন্যান্য ঘটনাগুলিও যুক্ত হয়ে থাকে। উপন্যাসের শ্রেণীবিচারে ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ আধুনিক কালের। আধুনিক মত অনুযায়ী *Treasure Island, Tristram Shandy, Wuthering Heights, The Ambassadors, Ulysses* ঘটনাপ্রধান উপন্যাস। পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই উপন্যাসগুলির কাহিনী ঘটনার সূত্র ধরে নিজস্ব গতিলাভ করেছে।

ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে ঘটনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংঘাতময় এবং পাঠকের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রেখে পাঠকের দৃষ্টি মূল কাহিনীর প্রতি কেন্দ্রীভূত করে। ক্রমশই ঘটনার উত্থানপতনের সঙ্গে পাঠক নায়ক-নায়িকার জীবনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয় ও তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়ে। একটি ক্ষুদ্র ঘটনাও পাঠকের মনে অপ্রত্যাশিত প্রভাব বিস্তার করে ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং কাহিনীর মূল প্রবাহকে সমস্যাকীর্ণ করে। ঘটনার প্রতি পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করা এই প্রকার উপন্যাসের অন্যতম লক্ষ্য। কতকগুলি অসাধারণ ঘটনা এই ধরনের উপন্যাসে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ নাম করা যায় *Treasure Island, Ivanhoe* এবং *Cloister and the Hearth*। এইসব উপন্যাসের কাহিনী কিছু অসাধারণ, দুঃসাহসিক ঘটনাকে ভিত্তি করে পূর্ণতালাভ করেছে। ঘটনাই বিষয়বস্তুকে

ঘনীভূত করেছে। **রোমান্স**-এর মতোই ঘটনাপ্রধান উপন্যাস পাঠকের আবেগ ও ঔৎসুক্যকে জাগিয়ে রাখে। এই উপন্যাসের ভয়াবহ ঘটনা বা ঘটনাসমষ্টি পাঠকের আনন্দের মূল উৎস। এমনকি, একটি আপাত তুচ্ছ ঘটনা এখানে অসামান্য গুরুত্ব লাভ করে। ঘটনার মধ্যেই নিহিত থাকে পাঠকের প্রত্যাশা ও আনন্দ। ঘটনার প্রতি চরিত্রের প্রতিক্রিয়া প্রাসঙ্গিক মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে এই উপন্যাসে নায়ক তার ঈপ্সিত রাজ্যে গমন করে। কিন্তু এই রাজ্যে কোনভাবে বিপদাপন্ন না হয়ে সে রক্ষা পায়। বিপদসঙ্কুল স্থান থেকে তার প্রত্যাবর্তন অপরিহার্যভাবে সংঘটিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের বহু উপন্যাসকে 'ঘটনাপ্রধান' পর্যায়ভুক্ত করা যায়: স্বর্ণকুমারী দেবীর অন্যতম রচনা দীপনির্বাণ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাজসিংহ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়েছে। রাজসিংহ উপন্যাসে কল্পনা ও বাস্তব একীভূত হয়েছে। ঘটনাপ্রধান উপন্যাসে দুর্বৃত্তের দমন ও শিষ্টের রক্ষা এক অন্যতম বিষয়বস্তু।

এই দিক থেকে বিচার করলে ইতিহাসের সংঘাতময় ঘটনার উপস্থাপনের সঙ্গে কাহিনীতে ধার্মিক রাজসিংহের জয় ও অধার্মিক ঔরঙ্গজেবের পরাজয় সার্থক ভাবে দেখান হয়েছে। কল্পনার মিশ্রণে ঐতিহাসিক কাহিনীর আকর্ষণ হ্রাস পায়নি। জেবউন্নিসার জীবনের করুণকাহিনী ঐতিহাসিক কাহিনীকে কাব্যময় করেছে। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল বঙ্কিমচন্দ্রের এই দুখানি সামাজিক উপন্যাস ঘটনাপ্রধান পর্যায়ভুক্ত বলা যেতে পারে। এই দুটি উপন্যাসেই একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে ও কাহিনী দুটিকে তাদের পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে গেছে। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রের বিবাহ, কুন্দর সঙ্গে তার দেখা, তাকে আশ্রয় দান, কুন্দের বিবাহ, তার স্বামীর মৃত্যু, কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের প্রেম ও তাকে বিবাহ, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, সূর্যমুখীর সন্ধান, সন্ন্যাসী কর্তৃক তার প্রাণরক্ষা, নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর পুনর্মিলন. সবই মনে হয় বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, রজনী উপন্যাসে রজনীর জীবনের ক্ষুদ্রতর ঘটনার সঙ্গে তার জীবনের পরিণতি সংযুক্ত হয়ে আছে। কৃষ্ণকান্তের উইল-এ চরিত্রের উপর বাহ্য ঘটনার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। প্রত্যেক উইলের পরিবর্তন, সম্পত্তির বিভাগ ও বণ্টন, কাহিনীর আকর্ষণীয় ক্রমবিকাশকে সাহায্য করেছে। কৃষ্ণকান্তের উইলের পরিবর্তন রোহিণীর জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্তনের

সূচনা ক'রে তার প্রেমস্পৃহা জাগিয়ে তোলে। রোহিণীর প্রণয়ের কথা জানতে পেরে ভ্রমর তাকে জলে আত্মহত্যা করতে বলে। রোহিণী ভ্রমরের এই উপদেশ পালন করে। গোবিন্দলাল জলমগ্ন রোহিণীর প্রাণরক্ষা করে। কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষ পরিবর্তনে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের বন্ধন চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সামাজিক উপন্যাসও যে ঘটনাপ্রধান হয়ে ওঠে—কৃষ্ণকান্তের উইল তার একটি অন্যতম নিদর্শন।

রমেশচন্দ্র দত্তের মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত ও রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা ঘটনা-প্রধান ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও কল্পনা বিষয়বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ইতিহাসের ঘটনা ও বীরত্বের কাহিনী মানবমনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাহিত্যরস সঞ্চার করেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার বৈচিত্র্য ও কাহিনীর সাড়ম্বরতা, রাজনৈতিক সংঘাত, সব কিছুই পাঠকের মনকে জয় করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৌকাডুবি ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের একটি নিদর্শনরূপে ধরা যেতে পারে। সমাজজীবনের ঘটনার প্রভাব ব্যক্তিজীবনেও যে কত গভীর হতে পারে রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়েছেন। উপন্যাসে নৌকাডুবির ঘটনা প্রথম থেকেই কাহিনীকে গতিময় করেছে।

রবীন্দ্রনাথের বউঠাকুরাণীর হাট ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের আরও একটি নিদর্শন। রাজর্ষিও বউঠাকুরাণীর হাট-এর মতোই ঐতিহাসিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ-এর বিষয়বস্তু সামাজিক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত। দুর্গাদাস লাহিড়ীর রাণী ভবানী ঘটনাপ্রধান উপন্যাস। উপন্যাসে ঐতিহাসিক পরিবেশ ও আবর্তের মধ্যে রানীর জীবনকাহিনীটি ফুটে উঠেছে। উপন্যাসে ঘটনাই মুখ্য, রানীর চরিত্রটি গৌণ হিসেবে দেখান হয়েছে। এই উপন্যাসগুলিতে নায়ক-নায়িকার জীবন ঘটনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।

ভূপেন্দ্রনাথ শীল

চরিত্র: প্রাচীন যুগের সাহিত্যের নিদর্শন নাটক ও মহাকাব্য। নাটকে ঘটনার প্রাধান্য, মহাকাব্যে চরিত্রের। উপন্যাস মহাকাব্যের আধুনিক সংস্করণ, উপন্যাসেও দেখি ঘটনার থেকে চরিত্র বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু চরিত্রের সংজ্ঞা এক থাকেনি, থাকলে প্রাচীনযুগেই উপন্যাস লেখা হতো। মহাকাব্যে লৌকিক ও অ-লৌকিক দুজাতের চরিত্র আছে। কিন্তু তাদের ব্যক্তিপরিচয় অস্পষ্ট। এর অন্যতম প্রধান কারণ সেখানে চরিত্রের পাশে ছিল ঘটনা, এবং তাদের

পরস্পরস্পর্ধী বিস্তার স্বভাবতই চরিত্রের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছে। ঘটনার বর্ণাঢ্য বিচিত্র গতিময়তায় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রচ্ছন্ন, চরিত্র সেখানে অধিকাংশ সময় একটি ব্যক্তির নাম মাত্র, নির্বিশেষ পরিচয় তাকে বৃহত্ত্ব দিয়েছে, কখনো মহত্ত্ব, কখনো পশুত্ব। রেনেসাঁসের সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন মানব সভ্যতার যে নবরূপান্তর ঘটালো তারই ফলে উপন্যাসের সৃষ্টি। উপন্যাসের চরিত্র নবযুগের অভিঘাতে একাধিক বৃত্তির সংঘাত-সমন্বয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি চরিত্রকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। শ্রেণীগত পরিচয় অপেক্ষা ব্যক্তি-গত পরিচয় প্রধান হয়ে উঠেছে। ব্যক্তির অন্তর্জগৎ অনির্দেশ্য রহস্যে ভরা, অনেকখানি অজানা, সেইজন্যই তাকে জানবার তীব্র বাসনা। সীতা-দময়ন্তীর আকর্ষণ এবং আয়েষা-রোহিণীর আকর্ষণ স্বতন্ত্র ধরনের, কারণ উপন্যাসে জটিলতর মানবমনের অন্ধকার দূর করার প্রয়াস নতুন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেছে। অবশ্য উপন্যাস একদিনে পরিণতিলাভ করেনি, প্রথমে ছিল **রোমান্স**, তারপর রোমান্সধর্মী উপন্যাস, সবশেষে উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' রোমান্স-ধর্মী উপন্যাস। "বিষবৃক্ষে 'কাহিনী' এসে পৌঁছল 'আখ্যানে'। যে পরিচয় সে নিয়ে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।" ফলে 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'বিষবৃক্ষে'র চরিত্র এক শ্রেণীর নয়, আবার 'সাহিত্যের নবপদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।' (রবীন্দ্রনাথ)। একে যদি **মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস** বলি, তাহলে এখানে চরিত্র আর এক শ্রেণীর।

শ্রেণীনির্দেশ করার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থেকেও এবং পরস্পরসম্মিলিত মিলন-মিশ্রণের দৃষ্টান্ত মনে রেখেও সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষায় চরিত্রকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, একটি টাইপ বা নির্বিশেষ-চরিত্র, অন্যটি ইণ্ডি-ভিজুয়াল বা ব্যক্তি-চরিত্র। মহাকাব্যে টাইপ চরিত্রের ব্যবহার, রোমান্সেও তারই অনুবর্তন, সাদা-কালো সেখানে তেল-জলের মতোই পৃথক। ভালো-মন্দের বিচার সেখানে সহজ, একটিমাত্র বৃত্তি গড়ে তুলেছে একটি চরিত্র। এই ধারাই আধুনিক ঔপন্যাসিকের হাতে রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি করলো সমতলসদৃশ চরিত্র (**ফ্ল্যাট্**, থিন্ বা ডিস্‌ক্ ক্যারেকটার), ডিকেন্সের সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন উপন্যাসে যারা বারবার ঘুরে ফিরে আসে; তবে কিছুটা স্থান পরিবর্তন হয়েছে সন্দেহ নেই, মুখ্য চরিত্র এখন গৌণ চরিত্রের স্থান নিয়েছে।

অনেকেই অবজ্ঞা করেন, নিন্দাও করেন কেউ কেউ, কিন্তু এই জাতীয় একরঙা সমতলসদৃশ চরিত্রের প্রয়োজন ফুরোবে না কোনোদিন। নাটকে এই জাতীয় চরিত্রের অবকাশ সবচেয়ে বেশি, তবে উপন্যাসেও এদের গুরুত্ব কম নয়। কমিক চরিত্র মাত্রেই একরৈখিক। কৌতুক জীবনের একটিমাত্র দিক, কিন্তু তবু উপন্যাসে তাকে স্থান দিতে হয়, এবং অনেক তত্ত্ববাহী গভীর চরিত্রকে ভুলে গিয়ে কমিক চরিত্রকে আমরা মনে রাখি, উপন্যাসের সব কিছুকে ভুলে যাই, কিন্তু তাকে ভুলতে পারি না। আসলে সমতলসদৃশ চরিত্র সাধারণত পাঠক-মনে দীর্ঘজীবী, এবং সেইজন্যই অনেক সময় উদ্দেশ্যমূখ্য উপন্যাসেও এই জাতীয় চরিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু কৌতুকরস সৃষ্টির জন্য যা অপরিহার্য, তত্ত্বপরিবেশনের জন্য তা কার্যকর নয়। 'স্বর্ণলতা'র নীলকমল বা গদাধরচন্দ্রকে প্রশংসা করতে কখনো বিমুখ হবো না, কিন্তু 'গোরা'র পরেশবাবু বা 'ঘরে-বাইরে'র চন্দ্রনাথবাবু সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ তুলনায় অনেক কম। একরঙা চরিত্রকে বহুরঙে রঞ্জিত করার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, চরিত্রের নিজের মধ্যেই তার সম্ভাবনা ও বিশিষ্টতা লুকিয়ে থাকে। সমতলসদৃশ চরিত্রেরও সম্ভাবনা এবং বিশিষ্টতা কম নয়। বিশেষত ঘটনাপ্রধান উপন্যাসে এই জাতীয় চরিত্র চিরদিন প্রাধান্য পাবে।

কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে যে-ধরনের চরিত্র স্থান পায় তার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিকাশক্ষম অস্থিরতা ও একাধিক বৃত্তির সংঘাততীব্রতা। একে বৃত্তাকার চরিত্র (রাউণ্ড বা থিক্ ক্যারেকটার) বলা হয়, কারণ বৃত্তকে একদিক থেকে দেখা যায় না, তাকে চারদিক থেকে এবং কখনো উপর-নীচ থেকেও দেখতে হয়। অনেকগুলি রঙে আঁকা হয় এই চরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'বৃত্তি-নিচয়ের অসামঞ্জস্য' একে জীবন্ত করে তোলে। কেন্দ্রস্থ শক্তি একটি হলেও, কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মেলে অনেকগুলি রেখার রশ্মিসম্পাত, এবং তারই ফলে চরিত্রটির ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকের প্রকৃত কৃতিত্ব চরিত্রের অন্তর্জগৎ উদ্ঘাটিত করায়, যে জগৎ জটিল ও রহস্যময়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে চরিত্রের দ্বৈত সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকখানি ভূমিকা করতে হয়েছে, 'সুমতি নামে দেবকন্যা, এবং কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুইজন সর্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং সর্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে।··· আজি, এই বিজন শয়নাগারে, রোহিণীকে লইয়া সেই দুজনে সেইরূপ ঘোর

বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল।' (কৃষ্ণকান্তের উইল)। যত স্থূলই হোক না কেন, মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের সূচনা এখান থেকেই, তারপর ধীরে ধীরে ঔপন্যাসিককে 'নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে।' ('চোখের বালি'র সূচনা), ফলে চরিত্রও ত্রি-স্তর-বিশিষ্ট গভীরতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করলো। এই ধারারই সাম্প্রতিক পরিণতি 'চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসে' (দ্র. **চেতনাপ্রবাহ**), যেখানে চরিত্রের অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণে অবচেতনার স্তর উন্মুক্ত হয়েছে।

ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও এখানে স্মরণীয়। দৃঢ়সংবদ্ধ-গঠন (**অরগানিক্ প্লট**)-উপন্যাসের কাহিনী পূর্বপরিকল্পিত, এবং প্রায়শই প্লটের গঠন সেখানে বৃত্তাকার। ফলে চরিত্রের বিকাশও পূর্বনির্ধারিত, তার মধ্যে আকস্মিকতার সম্ভাবনা অনেক কম, কালপারম্পর্যও সেখানে সুবিন্যস্ত। কিন্তু শিথিলসংবদ্ধ-গঠন (**লুজ প্লট**)-উপন্যাসে চরিত্রের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্ব-পূর্ণ। কারণ সেখানে প্রধান 'চরিত্রের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহাই একগাছি ডোরের মত অবিন্যস্ত ফুলরাশিকে একটি মালার আকার দান করে।' চরিত্র সেখানে ক্রমবিকশিত, কিন্তু তার মধ্যে কালপরম্পরা প্রায়ই অনুপস্থিত, আকস্মিকতার অবকাশও সেখানে অনেক বেশি।

গত দেড়শো বছরের উপন্যাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এই দুই রীতিই ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিকেরা। একদিকে আছে বিনোদিনী, কিরণময়ী, সুরেশ, অন্যদিকে শ্রীকান্ত, অপু, শিবনাথ ('ধাত্রীদেবতা')। এ দুয়ের মিলন-মিশ্রণও ঘটেছে অনেক উপন্যাসে, যেমন শচীশ ('চতুরঙ্গ'), খগেনবাবু ('অন্তঃ-শীলা'-'আবর্ত'-'মোহানা'), বাদল ('সত্যাসত্য')।

কিন্তু সাম্প্রতিক উপন্যাসে প্লট সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা বিপর্যস্ত হতে চলেছে, সেখানে দৃঢ়সংবদ্ধ বা শিথিলসংবদ্ধ প্লট নির্দেশ প্রায় অসম্ভব। আসলে চরিত্রপ্রধান উপন্যাস ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে, এবং মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসও চেতনাপ্রবাহের ব্যবহারে ক্রমশ অন্তর্মুখী ও ঘটনানিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। ঘটনার গুরুত্ব অস্বীকার করলে প্লটেরও গুরুত্ব কমতে বাধ্য। কাফ্‌কা বা কামুর উপন্যাসে প্লট এতই প্রচ্ছন্ন যে চরিত্র সেখানে প্রায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ। অবশ্য চরিত্রের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়েছে সেই সঙ্গে। একদা যে কাল-

পরম্পরা নির্দেশিত বিকাশধারা চরিত্রের মধ্যে অন্বেষণ করা হতো, কিংবা অন্তর-সংঘাত রূপায়ণে দ্বৈত সত্তার উদ্ঘাটনকে গুরুত্ব দেওয়া হতো, তা আজকের উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে অনিবার্য নয়। চরিত্রকে কখনো ভালো-মন্দ শ্রেণীতে বিভক্ত করা, কখনো চরিত্রের মধ্যে ভালো-মন্দের মিশ্রণ দেখানো এতদিন উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক উপন্যাসে ভালো-মন্দ সম্বন্ধে কোন শাশ্বত মূল্যবোধ স্বীকৃতি না পাওয়ায় শ্রেণীবিভাগও নিরর্থক হয়েছে। রেনেসাঁসের চেতনায় মানবতার উপর যে বিশ্বাস ছিল তা ক্রমে বিনষ্ট। সুতরাং ব্যক্তির মানবিক পরিচয় তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। হয়তো প্রতীকধর্মের প্রসার চরিত্রকে এই পরিবর্তন দিয়েছে, কিন্তু মানুষকে প্রতীকে রূপান্তরিত করা উপন্যাসের স্বভাবধর্মবিরুদ্ধ। তবে সাম্প্রতিক উপন্যাসে অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অনুভব ও উপলব্ধিই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে, ফলে ছোটগল্পের মতোই উপন্যাসের চরিত্রও মুহূর্তিক অন্তরঅভিজ্ঞতার মধ্যে অনন্তের উদ্ভাসে আলোকিত। বলা-বাহুল্য একে ক্লপদী সাহিত্য বিচারে বৃত্তাকার চরিত্রই বলতে হয়, কিন্তু সম্ভবত সে বৃত্তও প্রায়ই অসম্পূর্ণ। কেন্দ্রবিন্দু হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে, এবং উপন্যাসে প্লটও প্রায়ই শিথিলসংবদ্ধ, কারণ বিচ্ছিন্ন ঘটনাই চেতনাপ্রবাহকে কালপরম্পরা থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হলে উপন্যাসের চরিত্র সম্বন্ধে ধারণাও স্থির থাকতে পারে না। ভবিষ্যৎ-উপন্যাসে চরিত্র ভবিষ্যৎ-কালচেতনার উপরই নির্ভর করবে, এবং যদিও সাধারণ পাঠক অতৃপ্ত ও অসন্তুষ্ট, তবু এই পরিবর্তনকে রোধ করা যাবে বলে মনে হয় না।

অলোক রায়

চরিত্রপ্রধান উপন্যাস: এডুইন মুর উপন্যাসকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন. চরিত্রপ্রধান উপন্যাস, নাট্যোপন্যাস ও ক্রনিকল। সম্ভবত উপন্যাসের এই শ্রেণীনির্দেশে রবার্ট লুই স্টিভেন্সনের ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'A Humble Remonstrance' নামে প্রবন্ধটি মুরকে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছিল।

উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে তিনটি প্রধান স্তর আবিষ্কার করা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রথমটিতে ব্যক্তিচেতনা ও ব্যক্তির মূল্যবোধ সমাজচেতনা ও সামাজিক মূল্যবোধের কাছে পরাস্ত, দ্বিতীয়

পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস বিদ্যমান, তৃতীয় পর্যায়ে ব্যক্তি সমাজের উপর তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী। এডুইন মুরের 'চরিত্র প্রধান উপন্যাসে' দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষণগুলি বিদ্যমান। যেহেতু এই ধরনের উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোন সংঘাত নেই, সেইজন্য উভয়ের কোন পরিবর্তন দেখানোর প্রয়োজন নেই। চরিত্রচিত্রণের প্রধান দুটি উপায় আছে—প্রথমটি হলো, উপন্যাসের শুরুতে একের পর এক চরিত্রের আবির্ভাব এবং তাদের বাহ্যিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ নির্দেশ, এবং পরে ঔপন্যাসিক তাদের সম্বন্ধে পাঠকমনে যে ধারণা প্রথমে সৃষ্টি করেছেন সেই ধারণাকে চরিত্রের কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে বদ্ধমূল করা। প্রথম সাক্ষাৎকারে চরিত্রগুলি আমাদের মনে যে ধারণা সৃষ্টি করে, উপন্যাসের শেষেও তাদের সম্বন্ধে আমাদের সেই একই ধারণা থেকে যায়,—কারণ ঔপন্যাসিক তাদের বিবর্তনের ইতিহাস আমাদের কাছে তুলে ধরতে আগ্রহী নন এবং সম্ভবত তা তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়। কারণ প্রথম পরিচয়েই এই ধরনের চরিত্রগুলিকে আমরা এমনভাবে জেনে ফেলি যে পরে তাদের কোন পরিবর্তন দেখাতে গেলে চরিত্রগুলি অসংগতিপূর্ণ মনে হতে পারে। ইংরেজিতে এই ধরনের চরিত্রকে 'Set piece character' বা 'block character' বা 'Flat character' বলে (দ্র, চরিত্র)। মুরের 'চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে' অধিকাংশ চরিত্রই এই ধরনের, আসলে এই শ্রেণীর উপন্যাসে ব্যক্তি-মানসে বা সামাজিক কাঠামোয় কোন পরিবর্তন দেখানো ঔপন্যাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এবং যেহেতু এখানে কোন পরিবতন নেই সেজন্য অনিবার্যভাবেই এখানে ঘটনার ভূমিকাও গৌণ। সুতরাং চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে যেমন চরিত্রের পরিবতনজনিত বৈচিত্র্য নেই, তেমনি ঘটনার বৈচিত্র্যও সামান্য। তাহলে এই শ্রেণীর উপন্যাসের আকর্ষণ কোথায়? আকর্ষণ নিত্য নতুন চরিত্রের উপস্থাপনায়। সাধারণত চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে চরিত্র সংখ্যা নাট্যোপন্যাসের তুলনায় অনেক বেশি,—চরিত্রই এখানে আকর্ষণ। চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের রচয়িতা বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে তাঁর চরিত্রগুলি বেছে নেন। তার ফলে এই ধরনের উপন্যাস সমাজের একটি সমগ্র চিত্র তুলে ধরে। যেহেতু তিনি কোন নতুন ও নিজস্ব জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হননি, প্রধানত তিনি সমাজের বর্তমান স্থিতাবস্থাকেই বজায় রাখার পক্ষপাতী, তাই চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের লেখক তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য চরিত্রের মধ্য

দিয়ে সমাজের একটা প্রতিবিম্ব রচনা করেন।

মূর বলেছেন, চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের চরিত্রগুলি কালের গণ্ডিকে অস্বীকার করে। আসলে এখানে চরিত্র ক্রমপরিবর্তনশীল নয় বলেই তারা যে জগতে বাস করে সেখানে কালের কোন আধিপত্য নেই—তারা বাড়ে শুধু স্থানে। এখানে কাল অপেক্ষা স্থানেরই গুরুত্ব বেশি। এই চরিত্র একবার যে ধারণা গড়ে তোলে, ক্রমে সেই ধারণাই পুষ্টতর হয়, কোন নতুন ধারণা সৃষ্টির অবকাশ নেই। অন্যদিকে এই শ্রেণীর চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সম্পর্ক ঠিক ব্যক্তিগত নয়, অনেকখানি সামাজিক বা শ্রেণীগত।

নাট্যোপন্যাস, মূর যাকে বলেন **'ড্রামাটিক নভেল'**, সেখানে চরিত্রের স্বরূপ আলাদা। সেখানে উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু ব্যক্তি ও সমাজের সংঘাত, এবং এই সংঘাত-প্রতিঘাতজনিত ব্যক্তি ও সমাজজীবনে পরিবর্তন। সুতরাং চরিত্র-চিত্রণের পদ্ধতিটিও ভিন্ন ধরনের। নাট্যোপন্যাসের চরিত্র উপন্যাসের সূচনাতেই চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের মত পূর্ণাঙ্গ গঠিত নয়, তাদের বিকাশক্ষম অগ্রগতির সূচনা মাত্র। তাদের মধ্যে বিকাশের সম্ভাবনা ও শক্তি আছে, ব্যক্তিত্বের উপর বিশ্বাসও তাদের বেশি, এবং সেইজন্য সমাজের হাতে তারা ক্রীড়নক মাত্র নয়। সামাজিক ও প্রথাগত মূল্যবোধের পরিবর্তে ব্যক্তিগত উপলব্ধিজাত মূল্যবোধ দ্বারা তারা চালিত। চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে চরিত্র এবং ঘটনা পরস্পরসাপেক্ষ ও পরিপূরক নয়। নাট্যোপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্রের সম্পর্ক নিকটতর ও পরস্পর-নির্ভর। নাট্যোপন্যাসে মুখ্য চরিত্রগুলিকে আমরা প্রথমেই চিনতে পারি না, কারণ ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলির একটা সামগ্রিক পরিচয় আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন না,—চরিত্রগুলির পারস্পরিক ব্যবহার ও তাদের কার্যাবলী থেকে তাদের সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলতে হয়। সুতরাং উপন্যাসের শেষে যখন চরিত্রের বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়, তখনই কেবলমাত্র আমরা চরিত্রের সমগ্র পরিচয় লাভ করি। নাট্যোপন্যাসের চরিত্রগুলি সজীব, পরিবর্তনশীল ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ। এই ধরনের চরিত্রকে 'Round character' (দ্র, চরিত্র) বলে।

কিন্তু 'চরিত্রপ্রধান উপন্যাস' কাকে বলবো ? যেখানে উপন্যাসের চরিত্রগুলি সজীব, পরিবর্তনশীল ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ, না যেখানে জটিলতাবর্জিত, ব্যক্তিত্বহীন ও স্থাণুবৎ ? হার্বার্ট রীড দেখিয়েছেন, 'চরিত্র' প্রকাশিত হয় সামাজিক আদর্শের স্বীকৃতিতে, সেখানে সামাজিক সত্তা ও ব্যক্তিসত্তায় বিরোধ নেই, অন্যদিকে

'ব্যক্তিত্বে'র প্রকাশ হয় সামাজিক আদর্শের স্খলনে, সেখানে সামাজিক সত্তা ও ব্যক্তিসত্তার বিরোধ অনিবার্য। আমরা যদি 'চরিত্র' ও 'ব্যক্তিত্ব'কে পৃথক ভাবে দেখি, তাহলে মুরের উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে নিতে হবে। মুরের 'চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে' যদি 'চরিত্রে'র প্রাধান্য স্বীকৃত হয়, তাহলে তাঁর 'নাট্যোপন্যাসে' (ড্রামাটিক নভেল) 'ব্যক্তিত্বে'র প্রাধান্য আছে বলে তাকে 'ব্যক্তিত্বপ্রধান উপন্যাস' (নভেল অফ পার্সোন্যালিটি) বলতে হয়।

কমল রায়

চেতনাপ্রবাহ : সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষত উপন্যাস-গল্পে 'stream of consciousness' বা 'চেতনাপ্রবাহ' একটি বিশেষ পারিভাষিক তাৎপর্য নিয়েছে। উইলিয়াম জেম্‌স্‌ তাঁর *Principles of Psychology* (১৮৯০) বইটিতে এই শব্দগুচ্ছটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। সে অর্থটি হলো, জাগ্রত বা সজাগ মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তার প্রবাহ বা সচেতনতা। ক্রমশ এই শব্দগুচ্ছটি ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে এবং এই শতাব্দীর প্রথম তিন-চার দশকের আধুনিক কথাসাহিত্যের এক বিশেষ কথনরীতি বোঝাতেই ব্যবহৃত হতে থাকে। এই বিশেষ অর্থে শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত হবার কিছু আগে থেকেই জর্জ মেরিডিথ কিংবা হেনরি জেম্‌সের কোনো কোনো উপন্যাসে চরিত্রের মানসিক অবস্থা বোঝাবার জন্য দীর্ঘ অন্তর্দর্শনময় বর্ণনা দেখা যাচ্ছিল। এমনকি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এডুয়ার দুজার্দ্যাঁ নামে এক অপ্রধান ফরাসি কথাসাহিত্যিকের লেখা 'দি লরেল্‌স্‌ হ্যাভ বিন কাট' নামে একটি ছোট উপন্যাসে নায়কের মনের প্রতিফলিত সবরকম ঘটনা ও দৃশ্যের বর্ণনার একটি দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু একটু স্থূল প্রচেষ্টাও দেখা গিয়েছিল। ক্রমশ এই চেতনাপ্রবাহের প্রচারভঙ্গিতে লেখকের নিরন্তর চেষ্টায় ধীরে ধীরে সূক্ষ্মতা আসতে থাকে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরেকার কথাসাহিত্যে এই চেতনাপ্রবাহের প্রকাশে চরিত্রের মানসিক প্রক্রিয়া ও প্রবাহের ব্যাপক ছবি ধরা পড়তে শুরু করে। সেই ব্যাপক ছবির মধ্যে সচেতন ও অর্ধচেতন চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতি, স্মৃতি, ও নানা এলোমেলো অনুষঙ্গের শৈল্পিক বিন্যাসও দেখা দিতে শুরু করে।

কোনো কোনো সমালোচক 'stream of consciousness' এই শব্দগুচ্ছের বিকল্প হিসেবে 'interior monologue' বা অন্তর্মুখী আত্মকথন শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'চেতনাপ্রবাহ' কথাটি বোধহয় আর একটু ব্যাপক অর্থ

বহন করে যার মধ্যে চরিত্রের মানসিক অবস্থা ও চেতনাধারার বিচিত্র অবস্থাকে ধরবার নানা কৌশলকেও ধরে নেওয়া যেতে পারে। নিছক আত্মকথনের অন্তর্মুখীনতায় মনের চিন্তাভাবনার ছন্দস্পন্দ ও গতিবিধিই শুধু ধরা যায়। কিন্তু চেতনাপ্রবাহের রীতি বলতে চেতনাধারার প্রবাহ প্রতিফলনের সঙ্গে সঙ্গে লেখকের নিয়ন্ত্রণ-শক্তি ও মন্তব্যদক্ষতা এবং চিন্তার খেয়ালী গতিবিধি প্রকাশে ব্যাকরণ-বিপর্যয় ও বর্ণনা-বিন্যাসের স্বাভাবিক যুক্তি-শৃঙ্খলার ওলটপালটকেও বোঝায়। অন্তর্মুখী আত্মকথনের চরম অবস্থায় মানসিকতার যথাযথ প্রতিফলনই লেখকের মূল লক্ষ্য থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সাধারণ অনুভব এবং কোনো-কোনো চিন্তা-ভাবনা যেহেতু 'ক্রিয়া-নিরপেক্ষ', সেজন্যে এই জাতীয় মানসিক প্রক্রিয়ার বর্ণনায় সমপর্যায়ের কোনো 'ক্রিয়া-সূচক' ভাষার আমদানি করতে হয়। খানিকটা বোঝবার মতো নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাও আনতে হয়। একেবারেই অবিন্যস্ত এলোমেলো চিন্তাভাবনার যথাযথ প্রতিফলনে পাঠকের সঙ্গে যোগসূত্রটাই নষ্ট হয়ে যায়। শিল্পের প্রয়োজনীয় বিন্যাসটাই তখন উধাও হয়ে যায়। শিল্পীকে আপাত-বিশৃঙ্খলার আড়ালে কোনো একটা তাৎপর্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করতেই হবে। নইলে এই অন্তর্জগতের প্রকাশে কোনো শৈল্পিক তাৎপর্যই থাকে না।

কথাসাহিত্যে এই চেতনাপ্রবাহরীতির প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার করেন জেম্‌স্ জয়েস তাঁর 'ইউলিসিস' উপন্যাসে (১৯২২)। কিন্তু কোন্ অভাববোধ থেকে এই চেতনাপ্রবাহকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রশ্ন উঠলো সেটা ভেবে দেখা দরকার। এই রীতির সমর্থকরা মনে করতেন, পূর্ববর্তী উপন্যাস-রচনায় ঔপন্যাসিক বর্ণনার ক্ষেত্রে এতো বেশি অনুপ্রবেশ করেন যে চরিত্রগুলির নিজস্ব মানসিকতা যেন পরোক্ষে প্রকাশ পায়, যেন অসংকোচ আন্তরিকতার অভাব থেকে যায়। চরিত্রের চিন্তা-ভাবনার ভেতরকার পরস্পরবিরোধী অথচ সত্য রূপটি তার কিছুটা স্বাভাবিক অপ্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে প্রকাশ পেলে তা চরিত্রের বাস্তবতার মাত্রাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। নিছক লেখকের কর্তৃত্বে সেই বাড়তি মাত্রাটি পাওয়া যায় না। ভার্জিনিয়া উলফের সেই বিখ্যাত উক্তিটি—১৯১০-এর ডিসেম্বর মাসের কাছাকাছি সময় মানুষের চরিত্রটি পাল্‌টে গেছে—এই রীতির সমর্থকদের আদর্শ ছিল। তাঁদের মনে হলো, নতুন যুগের সামাজিক চাপে মানুষের চরিত্রের যে জটিলতা বেড়েছে তাকে প্রকাশ করতে গেলে পুরোনো সামাজিক উপন্যাসের বর্ণনারীতিতে লেখকের যে সর্বাত্মক প্রাধান্য তা আর চলে

না। চরিত্রগুলিকে নিজেদের মুখোমুখি করা দরকার। এইভাবেই অন্তর্মুখী চিন্তা ও অনুভব ধীরে ধীরে উপন্যাসে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। চিন্তার প্রবাহে ঔপন্যাসিকেরা প্রথম প্রথম যতটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় যত্নবান ছিলেন পরবর্তী-কালের ঔপন্যাসিকদের ততটা যত্নবান হতে দেখা যায় না। বোধহয় খানিকটা বহির্মুখিতা এনে, চরিত্রের কর্মোদ্যমের নানা রূপ দেখিয়ে তার চিন্তা-ভাবনার জগতের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা করেছেন। অতীতের ক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমানের সক্রিয়তার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে বোধহয় ভালোই করেছেন।

যাইহোক, চেতনাপ্রবাহরীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল মানসিক জগতের সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করা। এখানেও ভার্জিনিয়া উল্‌ফের কথাই মনে পড়ে: 'No perception comes amiss'। অর্থাৎ কোনো অনুভূতিকেই বাদ দেওয়া যাবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই রচনারীতির প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই তাঁদের নিজস্ব রুচি ও ভঙ্গিতে চিন্তা-অনুভবের নির্বাচন-পদ্ধতিকেই প্রকাশ করেছেন। জয়েস এবং উল্‌ফ নিজেদের স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গিতে উপন্যাসের গঠন-পদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছেন। উল্‌ফের উপন্যাসের বর্ণনারীতিতে এক শিথিল পুনরাবৃত্তিময় ভঙ্গি আছে। একধরনের চিত্রকল্পের প্রতি তাঁর যে ঝোঁক এসেছে, উপন্যাসের ঘটনার বাইরে সে চিত্রকল্পের অন্য কোনো তাৎপর্য নেই। যে অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে একটা বিশেষ প্যাটার্ন বা ছকের মধ্যে একটি চিত্রকল্প বিশেষ তাৎপর্য পাচ্ছে সে তাৎপর্য ওই লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তেমনি আবার জয়েসের রীতিতে চিন্তা থেকে চিন্তান্তরে সরে সরে যাওয়ার একটা আপাত-আকস্মিকতা সৃষ্টির দক্ষতা আছে যা চেতনাপ্রবাহরীতির মূল উদ্দেশ্যটিকে যেন ধরবার চেষ্টা করছে বলেই মনে হয়। কিন্তু উল্‌ফের প্যাটার্ন সৃষ্টির পেছনে যেমন একটা গভীর যুক্তিপ্রবণ মনের নিয়ন্ত্রণ উপলব্ধি করা যায় এখানেও তেমনি আপাত-আকস্মিকতার ভেতরে একটা গঠন-চিন্তা কাজ করছে। 'ইউলিসিস' উপন্যাসের দ্রুত অপস্রিয়মাণ চিন্তার ভেতর থেকে যে চিত্রকল্পগুলি ভেসে আসছে সেগুলি মানবসংস্কৃতির ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সমান্তরাল সম্পর্ক রেখে চলেছে। ব্লুম আর স্টিফেন যথাক্রমে ইউলিসিস ও টেলিমেকাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে যুক্ত। আবার এই দুটি জোড়া চরিত্র মানবসম্পর্কে চিরকালের পিতা-পুত্রের সম্পর্কে জড়িত। চিন্তাপ্রবাহকে ধরবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই স্বতন্ত্র পথে চলেছেন বিশৃঙ্খল চিন্তার স্বকীয় নির্বাচনে ও গ্রন্থনে এবং তাতেই

প্রমাণ হয়েছে মানবিক অবস্থার রূপায়ণে কোনো বিশেষ একটি পদ্ধতি নেই।

এখন এই জাতীয় উপন্যাসের কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯১৩ সালে মার্সেল প্রুস্ত্-এর এই চেতনাপ্রবাহ-ধর্মী উপন্যাস 'আ লা রিশার্স দ্যু ত্যাঁ পার্দ্যু' ('রিমেমব্রান্স্ অব থিংস পাস্ট') ছখণ্ড বেরোলো। ১৯১৫ সালে বেরোলো ডরোথি রিচার্ডসনের 'পিলগ্রিমেজ' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'পয়েন্টেড রুফ্স্'। এই উপন্যাসটির সমালোচনা প্রসঙ্গে মে সিনক্লেয়ার 'চেতনাপ্রবাহ-পদ্ধতি' কথাটি প্রথম উল্লেখ করেন। উইলিয়াম জেম্স্ যে 'চেতনাপ্রবাহ' সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা যে একটি বিশেষ টেকনিক বা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সিনক্লেয়ার সে সম্পর্কে আমাদের প্রথম সচেতন করেন। আর ১৯১৬ সালে বেরোলো জেম্স্ জয়েসের 'এ পোর্ট্রেট অব অ্যান আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান।' এই তিনটি উপন্যাসই কথাসাহিত্যের জগতে বিশেষ অর্থেই 'সময়োত্তীর্ণ' উপন্যাস, যেহেতু চেতনাপ্রবাহ প্রকাশের সূত্রে এই উপন্যাসগুলিতে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গেছে। পূর্বস্মৃতি বা রিট্রসপেক্ট এবং পূর্বজ্ঞান বা অ্যান্টিসিপেশন দুয়ে মিলে চলতি-মুহূর্তে একটা চেতনা-সার যে তৈরি হয়ে যায় তা কথাসাহিত্যে ক্রমশ খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে আবার বলছি, এই অবচেতন-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন হবার আগে বা পদ্ধতি হিসেবে এই কথাসাহিত্যশিল্প তাৎপর্যপূর্ণ হবার আগে থেকেই মেরিডিথ বা হেনরি জেম্সের উপন্যাসে এই জাতীয় চৈতন্যমুখী ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

তেমনি বাংলা কথাসাহিত্যেও প্রথম সার্থক শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল এবং রজনী উপন্যাসে এই চেতনাস্তরকে উন্মোচনের চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। যদিও, এই চেষ্টা ঘটনাধারার মাঝে মাঝে ইতস্তত ছড়ানো। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে 'না'-শীর্ষক ষোড়শ পরিচ্ছেদ থেকে কুন্দের আত্মচিন্তার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি :

> দূর হউক—ভাল, মরিলে হয় না ? কেমন করিয়া ? জলে ডুবিয়া ? বেশ ত ! মরিলে নক্ষত্র হব—তাহলে হব ত ? দেখিতে পাব—রোজ রোজ দেখিতে পাব ? কাকে ? কাকে, মুখে বলিতে পারি নে কি ? আচ্ছা, নাম মুখে আনিতে পারি নে কেন ? এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পাবে না। একবার মুখে আনিব ? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। ন-নগ-নগেন্দ্র।

এই জাতীয় উদাহরণ এই কথাই প্রমাণ করে, রীতি হিসাবে চেতনাপ্রবাহকে

সচেতনভাবে প্রয়োগ করবার আগেই এইরকম চৈতন্যের গভীরে যাবার চেষ্টা অনেক দক্ষ ঔপন্যাসিকই করেছেন উপন্যাসে গভীর মাত্রা আনবার প্রয়োজনেই। রবীন্দ্রনাথও এই গভীর মাত্রা আনবার জন্যেই 'আঁতের কথা'র ওপর জোর দিয়েছিলেন 'চোখের বালি' রচনার সময় থেকে। চরিত্রের মুখে অনেক সময়েই তিনি এইরকম আত্মকথন ফুটিয়েছেন যা চরিত্রের গোপনতম অন্তর্দ্বন্দ্বকেই প্রকাশ করে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বিমলার একটি সংকট মুহূর্তের ছবি তুলে দিচ্ছি। সন্দীপের একটি ছবি প্রসঙ্গে বিমলা বলছে :

> ঘরে সব দরজা বন্ধ করে তবে তাকে খুলে দেখি। …রোজই মনে করি এই কেরোসিনের শিখায় ওকে পুড়িয়ে ছাই করে চিরদিনের মতো চুকিয়ে ফেলে দিই ; আবার রোজই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আমার হীরে মানিক মুক্তোর নিচে তাকে চাপা দিয়ে চাবি বন্ধ করে রাখি। কিন্তু, পোড়ারমুখী, এই হীরে মানিক মুক্তো তোকে দিয়েছিল কে? এর মধ্যে কতদিনের কতো আদর জড়িয়ে আছে। তারা আজ কোথায় মুখ লুকোবে? মরণ হলে যে বাঁচি।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস রচনার সাধারণ ভঙ্গিটাই কিন্তু এই চেতনাপ্রবাহ প্রকাশের ভঙ্গি। তাঁর কবিত্বশক্তি ও তাঁর গদ্যরচনার দক্ষতা একই সঙ্গে তাঁর বহু উপন্যাসের স্মৃতির দরোজা খুলে নায়কের ভাবনা-চিন্তা ও অনুভূতির এক বিচিত্র মায়াজাল তৈরি করেছে। তাঁর লাল মেঘ, নীলাঞ্জনের খাতা, তিথিডোর ইত্যাদি বহু উপন্যাসেই এই চেতনাপ্রবাহের প্রকাশ। অনেক সময়েই ভাবনার যথাযথ অনুসরণে বাক্যকেও 'ক্রিয়ানিরপেক্ষ' ক'রে বিচিত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির শিহরণ আনা হয়েছে—বিশেষত 'তিথিডোর' উপন্যাসে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে প্রুস্ত্-পড়া নায়ক খগেনবাবু আত্মচিন্তায় তাই গল্পের ঘটনার চেয়ে তার প্রতিক্রিয়ায় মনের স্রোতের ওপরেই জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, বিশুদ্ধ নভেলে গল্প থাকবে না। থাকবে এই প্রতিক্রিয়ার নানা অন্তঃশীল আবর্ত। গোপাল হালদারের একদা, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সৃষ্টি, সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী, সংকট, অচিনরাগিণী, সমরেশ বসুর বিবর, বিমল করের অপরাহ্ন, অসময় ইত্যাদি এই চেতনাপ্রবাহধর্মী উপন্যাসেরই তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ। এঁদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদের মতো সতীনাথ ভাদুড়ীও এইজাতীয় উপন্যাসরচনার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনিও প্রুস্তের অনুসরণে জীবনের বিশেষ 'মুহূর্ত' গুলিকে নির্বাচন করে

একটা অর্থপূর্ণ সমগ্রতা আনবার চেষ্টা করতেন। তাঁর অবিশ্বাস্য উপন্যাসটি এই জাতীয় চিন্তারই পরিণতি। স্মৃতিসূত্রে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-কে একত্র করতে তিনি 'স্মরণ বা চিন্তন-চিহ্নের' কথাও ভেবেছিলেন। সন্তোষকুমার ঘোষের শেষ নমস্কার, শ্রীচরণেষু মাকে উপন্যাসেও এই চেতনাস্রোতের ছবি লক্ষ্য করার মতো। এখানে লেখক তাঁর নিজের আমিত্বে একাকার হয়ে গিয়ে পরের কাহিনী শোনাবার ছলে নিজেরই কাহিনী শুনিয়ে গেছেন। দূরত্ব ও একাত্মতার এই সচেতন মিশ্রণেও কিন্তু কোনো কৃত্রিমতা আসেনি। বলবার আন্তরিকতা দুক্ষেত্রেই গভীর মাত্রা পেয়েছে। অন্তঃশীলা উপন্যাসে রমলা দেবী খগেনবাবুর ডায়ারি পড়ছেন। তার থেকে খানিকটা উদ্ধার করি :

> দুঃখ আসে বনের মাঝে সন্ধ্যার মতন, ধীরে, গোপন সঞ্চারে—আমার প্রিয়ার মত তার নম্রগতি ; দুঃখ নামে করুণার মতন, আবার প্রিয়ার মত, বিষাদমাখা স্মিতহাস্যময়ী মুখটি নিয়ে, দুঃখ আচ্ছন্ন করে আমার প্রিয়ার চোখে অশ্রুকণার মতন। যমুনার কালো জলে ডুবে যাবার যে আনন্দ গোপিকাকে আবিষ্ট করে, আজ আমার মন সেই আনন্দে ভরে উঠেছে। দুঃখ রূপান্তরিত হল। তীব্র অনুভূতি নেই, আছে প্রবৃত্তিশূন্যতা।...

কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাংলা গল্প-উপন্যাসে অন্তর্মুখী প্রবাহ ভাষাকে খুব বেশি ভেঙেচুরে বিপর্যস্ত করেনি, জয়েসের ইউলিসিসের মধ্যে যেমন ঘটেছিল। যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্যেই চেতনাপ্রবাহরীতিকে আমাদের গল্প-উপন্যাসের লেখকরা প্রয়োগ করে গেছেন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একক প্রদর্শনীর মতো দু-একটি ব্যতিক্রম অবশ্য আছে।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও উৎস : ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (ইম্প্রেসন)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য-কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।

ছোটগল্প উনিশ শতকের এক সম্পূর্ণ নিজস্ব সামগ্রী—যা ইতঃপূর্বে—অন্তত এই রূপে—বিদ্যমান ছিল না। এ নভেলও নয়—রোমান্সও নয়। এ কবিতার মতো ঐকভাবাশ্রয়ী—অথচ কল্পনামুখ্য নয়, জীবন-নির্ভর। আবার সেই জীবনের সামগ্রিকতার প্রতিচ্ছবিও এতে নেই—এতে খণ্ডতার ব্যবহার। সুতরাং এ বস্তু

স্পষ্টই 'অভিনব'—এ হলো একটি Peculiar Product।

উনিশ শতকই ছোটগল্পের জন্মলগ্ন কেন—এ প্রশ্নের উত্তর এত সরল নয়। কিন্তু একটা জিনিষ সুস্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। দান্তের তিমিরাভিসার আর পেত্রার্কের বিদগ্ধ রোমান্টিকতার যুগে নির্মোহ জীবন-সন্ধানী জনসাধারণের শিল্পী বোক্কাচ্চিয়ো চার্চের দিকে—সামাজিক গ্লানির দিকে তাঁর জিজ্ঞাসা উদ্যত করে তুলে ধরেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দী, বিশেষ করে তার মধ্য ও শেষভাগ (ছোটগল্পের পূর্ণ আবির্ভাব যুগ) পৃথিবীর ইতিহাসে বুদ্ধিজীবীর যন্ত্রণাকে দুঃসহ করে তুলেছে। ফ্রান্স এবং রুশিয়ায় এই যন্ত্রণা সবচেয়ে ভয়াবহ। স্তঁাধাল-মেরিমে-ফ্লোব্যার প্রমুখ লেখকেরা রিয়্যালিজ্‌মের পথে—সমাজ-সমালোচনায় যতখানিই অগ্রসর হোন—নাপোলিয়ঁ। বংশের প্রতি তাঁদের অন্তরের মমতা ছিল, তাঁরা তখনো বিশ্বাস করতেন—ফ্রান্সই ইয়োরোপের মুক্তিদাতা। সিডানের রণক্ষেত্রে বিসমার্কের জয়ে মেরিমের মৃত্যু ঘটল—'স্যালাম্বো'র পরে ফ্লোব্যার আর এগোতে পারলেন না। মোপাসাঁ এলেন চূড়ান্ত গ্লানির মধ্যে—আধুনিক ছোটগল্প হলো যন্ত্রণার ফসল। মহৎ বিশ্বাস থেকে—অন্তত মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ত ভিত্তি থেকে (যা ফ্লোব্যারও রাজতন্ত্রের মধ্যে পেয়েছিলেন) উপন্যাস সৃষ্টি হয়, কিন্তু শূন্যতার আঘাতে তার উপকরণগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে—আদর্শ আর বিশ্বাসের উজ্জ্বল-কৌণিক ধারালো খণ্ডগুলিকে লেখক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নগ্ন-তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ছুঁড়ে দিতে থাকেন। গী-দ্য মোপাসাঁও তাই দিয়েছেন। এমিল্ জোলা গণজীবনের বলিষ্ঠতায় বিশ্বাস করে উপন্যাসের পথে অবশ্য কিছু এগোতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তিনি ন্যাচারালিজ্‌মের পঙ্কে তলিয়ে গেছেন।

মহান্ শিল্পী হয়েও তুর্গেনেভ নিজের বুদ্ধির বৃত্তেই তৃপ্ত, ফ্লোব্যারের সহমর্মী—তাই 'ফাদার্স এণ্ড সন্‌স' কিংবা 'ভার্জিন্ সয়েলে'র মতো ভালো উপন্যাস লিখেছেন। তলস্তয়ের গভীর ক্রীশ্চান মনন, তাঁর আশাবাদ—নব অভ্যুত্থানের প্রত্যয় তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখার সৌভাগ্য দিয়েছে। চেখভ্‌ও আশাবাদী—কিন্তু সে আশা যে কী যন্ত্রণাগর্ভ—তাঁর 'ছয় নম্বর ওয়ার্ডে'ই সে পরিচয় আছে, তাই জিজ্ঞাসা-চিহ্নিত ছোটগল্পই চেখভের প্রধান অবলম্বন।

আমেরিকায় ছোটগল্পও এমনি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কোনো বিপুল সংঘাত নেই বটে, কিন্তু আছে লেখকের

ব্যক্তিক বেদনা ও ব্যর্থতার ট্রাজেডি। নিঃসঙ্গ উপেক্ষিত ন্যাথানিয়েল হথর্ন্ সেই বেদনাতেই আলো-ছায়ার মধ্যে 'পিউরিটান ঊর্ধ্বচারণা'কে ভাসিয়ে দিয়েছেন—ক্ষত-বিক্ষত এড্গার অ্যালান্ পো দেখেছেন তাঁর জানালার পাশে দাঁড়কাকের জলন্ত দৃষ্টি করাল-নিয়তির মতো জেগে আছে। হয় সামাজিক সংকট—নয় ব্যক্তিক সংকট—উনিশ শতকের ছোটগল্পে এই দ্বিবিধ যন্ত্রণা বিদ্যমান। ছোট-গল্প যন্ত্রণার ফসলরূপেই এই সময় প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষভাগ—যা বিশেষ করে ছোটগল্পের কাল, তা প্রধানত রিয়্যালিজ্ম এবং ন্যাচারালিজ্মের উত্তাল তরঙ্গে কলমন্দ্রিত। ইংল্যাণ্ডের বার্নার্ড শ আর জার্মানির হাউপ্টম্যানের নাটকে, ফ্রান্সের এমিল্ জোলার উপন্যাসে আর চার্লস বোদ্ল্যারের কবিতায় দুঃখ-বেদনার নিগূঢ় বাস্তবতা ও অতি-বাস্তবতার উদ্বেলতা। জীবন-জিজ্ঞাসু, সত্যসন্ধী এবং নিষ্ঠুর ছোটগল্প তাই একালেই এত বেশি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।

জীবনের পুরোনো মূল্যবোধগুলিকে যখন অর্থহীন মনে হতে থাকে, ব্যক্তি-চেতনার সঙ্গে, সমাজ-চেতনার সঙ্গে কোনোমতেই যখন সামঞ্জস্য ঘটতে চায় না—যখন প্রতি মুহূর্তে চতুর্দিকের সঙ্গে শিল্পীর সংঘাত—তখন রোমান্টিক কবি নাইটিঙ্গেলের পাখা আশ্রয় করে 'Strange and beautiful'-এর অভিসারে নভোযাত্রিক হতে পারেন, বুদ্ধির চোরাগলি থেকে বেরিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন হৃদয়ারণ্যের ছায়ায়; কিন্তু গীতিকবির সগোত্র গল্পলেখক যেন তীরবিদ্ধ পাখি। সে-পাখি আহত বক্ষে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—রক্তকর্দমের মধ্যে তাকে ছটফট করতে হয়। কখনো তার নির্বাপিত চোখে স্বপ্নময় আকাশের ছায়া ঘনায়, আবার কখনো বা মৃত্যুকালীন 'হংস-গীতি'তে সে সমাজ ও জীবনের ব্যাধকে অভিসম্পাত জানিয়ে যায়। তাই ছোটগল্পের ভিতর আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-কল্পনার কথা থাকলেও উনিশ শতকে তা মূলত দুঃখবাদী। চেখভের মতো জীবনরসিক লেখকের গল্পের দীর্ঘশ্বসিত বেদনাই তার পরিচয়। তার মধ্যে একটা কঠিন জিজ্ঞাসা—চারদিকের ব্যর্থতার প্রতি তার আর্ত অঙ্গুলি-নির্দেশ। অবশ্য দুঃখবাদ হয়েও তা সর্বত্র পরাজয়বাদ নয়। দুঃখের মধ্যেও কারো চোখে আশার আলো—তিনি চেখভ্; কারো বিশ্বাস—প্রকৃতির অম্লান সৌন্দর্যে 'এখনো অনেক রয়েছে বাকি'—তিনি আল্ফঁস দোদে; কেউবা মানুষের চিন্তা-চেষ্টা-স্বপ্নকে এক অদৃশ্য শক্তির কঠোর ব্যঙ্গে তাড়িত হতে দেখেন—তিনি ন্যাথানিয়েল হথর্ন্; কারো

চোখে অকরুণ নিশাচ্ছকার—তিনি মোপাসাঁ।

জিজ্ঞাসাচিহ্ন হয়েই ছোটগল্পের আবির্ভাব। তারপর তা অবশ্য বিশিষ্ট একটি শিল্পবস্তুতে পরিণত হলো। তখন তার মধ্যে সবই এল। প্রেম এল, স্বপ্ন এল, আনন্দ এল, কান্না এল, হাসি এল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আকাশে ছোটগল্প লেখকেরা যেন সপ্তর্ষির মতো জিজ্ঞাসা রচনা করে অন্তর্জ্বালায় জ্বলেছেন—ধ্রুবতারাটি যে কোন্‌দিকে—তার সন্ধান তাঁরা তখনো পাচ্ছেন না।

তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে কলারীতির দাবিও গল্পলেখকের অবশ্য-মান্য। ছোটগল্প বিদ্রোহ আর প্রতিবাদকে একেবারে যে অতি প্রত্যক্ষভাবেই উপস্থিত করবে—এমন কোনো শর্তও নেই। একটি বিশেষ প্রতীতির প্রতিক্রিয়া নানাভাবে আমাদের শিল্পের মধ্যে দেখা দিতে পারে; কখনও তা অতিব্যক্ত রূপে আসবে, কখনও দেখা দেবে বক্রকুটিল পরোক্ষতার মাধ্যমে, কখনও বা নিজেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন করে রাখবে। ছোটগল্পের মধ্যে যুগ-মননের সন্ধান করতে হলে তাই অতি-স্পষ্টতার উপর নির্ভর করলে চলবে না। মনঃসমীক্ষণের কাজে যেমন অবাধ ভাবানুষঙ্গের ভিত্তিতে চিন্তার অসংলগ্ন সূত্রগুলিকে একত্র করে একটি অখণ্ডতার সন্ধান করতে হয়, তেমনি যুগচেতনাকেও সেইভাবে নানা বৈচিত্র্যের এবং বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে সন্ধান করে নেওয়া দরকার। মোপাসাঁর দেশাত্মবোধক গল্পে, শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও লালসার কাহিনীতে এবং কৃষক-জীবনের চিত্রণে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব খণ্ড খণ্ড ভাবে বিকীর্ণ হয়ে আছে; তাঁকে সম্পূর্ণ-ভাবে বুঝতে গেলে এদের মধ্যগত ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করা আবশ্যক।

যে কোন যুগসন্ধির প্রতিক্রিয়া ঘটে দুদিকে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্কের ভিতর। তাই সংশয় ও বেদনার যুগের ফসল ছোট-গল্প একাধারে ব্যক্তিমূলক ও সমাজমূলক। এই ব্যক্তিমূলক গল্পগুলির মর্মোদ্ধারই সব চাইতে কঠিন কাজ। এইসব গল্পের মধ্যে কখনো আত্মভান্ত্রিক বিষণ্ণতা, কখনো অবচেতনার ছায়া-সঞ্চরণ। পাঠককে অনেকখানি গভীরে প্রবেশ করেই ব্যক্তি-প্রধান গল্পের গুহানিহিত তাৎপর্য এবং সামাজিক অবস্থার সঙ্গে স্পষ্ট সংযোগটিকে নির্ণয় করতে হবে। চেখভের 'ডার্লিঙে'র সঙ্গে 'ছয় নম্বর ওয়ার্ডে'র মর্মসম্বন্ধ এইভাবেই অনুসন্ধান করা দরকার। তাই উনিশ শতকের ছোটগল্পের ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা-মূলকতার ধর্মটিকে বহুমুখী আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়ে ত্রিবিধ-পদ্ধতিতে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে: অভিধায়, লক্ষণায় এবং ব্যঞ্জনায়;

বুঝতে হবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কে।

আরো লক্ষণীয়, ছোটগল্পের যখন ব্যাপক আবির্ভাব, উপন্যাস তখন সংকুচিত। 'মহৎ অস্তি—মহৎ নাস্তি'—অথবা 'যেমন আছি তা-ও ভালো' এদের যে কোনোটি না থাকলেই যেন উপন্যাসের সংকট। মোপাসাঁ-পূব ফ্লোব্যার কুণ্ঠিত, মোপাসাঁ-পরবর্তী জোলা প্রায় অসার্থক। তাই ভক্ত খ্রীস্টান তলস্তয়েরও ধৈর্যচ্যুতি—'ক্রুট্‌জার সোনাটা'র আবির্ভাব। তাই পঞ্চাশ বছর বয়েস পেরিয়ে—একটা দার্শনিক নির্বেদে পৌঁছে, তবেই 'দি স্কারলেট্ লেটার' লিখতে পারলেন হথর্ন।

এ গেল আত্মিক কারণ। অন্য কারণও ছোটগল্পের পথ খুলে দিয়েছিল।

আমেরিকায় সংবাদপত্র ছোটগল্পকে আনুকূল্য করেছে। সাংবাদিকতার প্রয়োজনেই স্কেচ্‌ধর্মী রম্যতার আবির্ভাব হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে ট্যাট্‌লার-স্পেক্‌টেটর-র‍্যামব্লারে। হথর্ন, পো এবং হেন্‌রি জেম্‌স্ বিখ্যাত ম্যাগাজিনিস্ট্, ফ্লোব্যার-ব্যাল্‌জাকের মুখ্য আশ্রয় পত্রিকা, মোপাসাঁ তাঁর তিনশোর উপর গল্প পত্রিকার প্রয়োজনেই প্রধানত লিখেছেন; চেখভ্‌কে ডাক্তারি পড়ার খরচ চালাতে হাসির নক্সা দিয়ে পত্রিকার পাতায় হাত মক্‌সো করতে হয়েছে—তারপর লিখতে হয়েছে গল্প। সংক্ষিপ্ত পরিসর—একটিমাত্র ভাব—একটি সংকটের সৃষ্টি করে পাঠককে নগদ বিদায় করা—এই স্থূল ব্যবসায়িক প্রয়োজনও উনবিংশ শতাব্দীর ছোটগল্প সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য কারণ। প্রসঙ্গত বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গল্পের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথকেও মনে পড়তে পারে, তিনিও ছোটগল্প লিখতে শুরু করেছিলেন 'সাপ্তাহিক হিতবাদী'র তাগিদেই। উনবিংশ শতকের সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের কিছু রোচক পরিবেশনের চেষ্টা আধুনিক ছোটগল্পের দ্বিতীয় জন্ম-হেতু। সংক্ষেপে বলা যায়, উনিশ শতকের যুগ-মানস ছোটগল্পের ভাব-সত্যকে জন্ম দিল এবং সংবাদপত্র তার কায়ারূপ নির্মাণ করল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটগল্প: নাটক বা মহাকাব্যের মতো ছোটগল্পের কোনো বহিরঙ্গ নির্দিষ্ট রূপরীতি নেই। ছোটগল্প আয়তনে ছোট, এই সংজ্ঞা অবশ্য সর্বস্বীকৃত, কিন্তু সেই ক্ষুদ্রতা কতটুকু, দুপাতা অথবা দশ পাতায়—তার কোনো বিধিনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তা ছাড়া এর চরিত্রসৃষ্টি বা ঘটনাসৃষ্টি সম্বন্ধেও কোনো সর্বজন-পালনীয় অনুশাসন গড়ে ওঠেনি। এমনকি ছোটগল্প যে একমাত্র গদ্যেই লেখা হবে, তাও হয়তো বিনা প্রতিবাদে স্বীকার্য হবে না। রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা

জমি' অথবা 'ফাঁকি' কবিতাগুলিও পদ্যে লেখা ছোটগল্প ছাড়া কিছুই নয়। এর থেকে মনে হয় এর অন্তরের প্রকৃতিই এর শেষ নিরিখ। ছোটগল্পের বক্তব্য এবং উপস্থাপনরীতিতে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে প্রকৃতিগত সেই বৈশিষ্ট্য না থাকলে শুধু আকৃতি হ্রস্ব হলেই তাকে ছোটগল্প বলা চলবে না।

গল্প বলায় এবং গল্প শোনায় মানুষের ঔৎসুক্য চিরন্তন। শ্রোতার মনে ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখাই গল্প রচনার সাফল্য। আদিম মানুষও গল্প বলেছে এবং গল্প শুনে আনন্দ পেয়েছে। এইসব গল্প ছিল সরল। সেকালের মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনায় সহজেই বিস্ময় এবং আনন্দ বোধ করত। বৈদিক কাহিনীগুলি তার দৃষ্টান্ত। আজ শিশুচিত্তের কাছে যেসব গল্প চিত্তাকর্ষক আমাদের প্রাচীন পূর্ব-পুরুষের কাছে সেসব ছিল দৃঢ়মূল বিশ্বাস। উপকথার পশুপাখিরা আদিম প্রাকৃতিক নানা আধিভৌতিক সত্তার স্মৃতির প্রতীক মাত্র। এদের মধ্যেই আদিম মানুষের বিশ্বাস রূপ পেয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের মধ্যে প্রবেশ করল নীতি-উপদেশ। কিন্তু সে নীতিও সরলপ্রকৃতির। হিতোপদেশের গল্প বা ঈশপের গল্পের মধ্যে সভ্য মানুষের প্রথম পর্যায়ের গল্প-রসের সঙ্গে মিশেছে নানা অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান ও উপদেশের সঞ্চয়। গল্পগুলি খুবই সরল। ঘটনায় বা বক্তব্যে কোনো দিক দিয়েই তাতে জটিলতা নেই। এই আদিম গল্পরচনার পদ্ধতি অবলম্বনে ভারতবর্ষে পরিণততর গল্পরীতিও গড়ে উঠেছিল। জাতক বা পঞ্চতন্ত্রের উপদেশ-নীতির প্রচারে এই শ্রেণীর গল্পই ছিল সার্থক। প্যারাবল নামে পরিচিত কথিকাগুলি বস্তুত প্রাচীনতম গল্পরীতির অবশেষ।

(সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে কথা, আখ্যায়িকা ও অবদান নামে পরিচিত বিভিন্ন গল্প-সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছিল, তাদের সঙ্গে আধুনিক ছোটগল্পরীতির পার্থক্য অনেকখানি। অবদান কাহিনীগুলিতে অতীত ঘটনাকে বর্তমান ঘটনায় প্রক্ষেপ করে দেখানো হয়। জাতকে বোধিসত্ত্ব অতীত জীবনের কাহিনী বলেছেন, যদিও উত্তম পুরুষে নয়। কথা মৌলিক গল্প, আখ্যায়িকা কিংবদন্তিমূলক। আখ্যায়িকা কয়েকটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। কন্যাহরণ, বিচ্ছেদ, নায়কের জয়লাভ প্রভৃতি কাব্যময় ভাষায় এতে বর্ণিত। এর সঙ্গে বরং আধুনিক উপন্যাসের কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে। কথা সেকালের খাঁটি গল্প। আধুনিক ছোটগল্পের সঙ্গে কথার পার্থক্য আছে। ছোটগল্প আখ্যায়িকার মতো নিছক বিবরণধর্মী নয়। এতে গল্প

রচনার বিশুদ্ধ আর্টের সঙ্গে আছে জীবনজিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নানা সংকেতসূচক ঘটনার অর্থপূর্ণ সমাবেশ।

আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভব য়ুরোপে রেনেসাঁস-পর্ব থেকে। রেনেসাঁসের দৃষ্টি হলো বস্তুজগৎকে বিশেষ অর্থগৌরবে মণ্ডিত করে দেখা। যে-জীবন ছিল নেহাৎই কতকগুলি বাহ্য ঘটনার সমাহার মাত্র, সেই জীবনই নানা অসাধারণ তাৎপর্যে ভরে উঠল রেনেসাঁস-মনোভাবের ফলে। এতেই ছিল আধুনিক মনোভাবের সম্ভাবনা। উপন্যাসের উদ্ভব হয়েছিল লেখকের একটি নিজস্ব মননচেতনায় জীবনকে ব্যাখ্যা করে নেওয়ার জন্যই। আগে তো ছিল নাটকে বা মহাকাব্যে বস্তুমাত্রক ঘটনাধারা।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সাহিত্যধারার প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায়, প্রাচীন যুগে হ্রস্বকায় সাহিত্য যেমন ছিল অপেক্ষাকৃত বিরল, আধুনিক যুগে বিপুলকায় সাহিত্য তেমনি ক্রমবিরল। হয়তো মানুষের অবসর সময়ের অভাব ঘটছে বলেই বৃহৎকায় সাহিত্য রচনা করবার এবং পড়বার ধৈর্য এবং সুযোগ কমে আসছে। ছোটগল্পের সমৃদ্ধি রেনেসাঁস যুগের অল্প পরে। দেকামেরোন (চতুর্দশ শতাব্দী) বা হেপ্তামেরোন (ষোড়শ শতাব্দী) থেকে কথাসাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে সত্য, কিন্তু উপন্যাস বা ছোটগল্পের পরিপূর্ণ রূপ তাতে ফোটেনি। সেগুলি বিবরণধর্মিতার ধার ঘেঁষে গিয়েছে। আবার ছোটগল্পের চেয়ে উপন্যাসের রূপই আগে ফুটে উঠেছে, একথাও সত্য। আধুনিক রীতির ছোটগল্পের আবির্ভাব ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। উপন্যাসের স্থান গল্প অধিকার করে নেবার উপক্রম করতেই গল্পের নিজস্ব প্রকৃতিও সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠল। উপন্যাসের গ্রন্থন কিছু শিথিল। আর সংহত এককেন্দ্রিকতায় জীবনের ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে আস্বাদ করবার চেষ্টাতেই ছোটগল্পের সৃষ্টি। এই জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক যুগই ছোটগল্পের স্বাভাবিক জন্মকাল। রোমান্টিক দৃষ্টিতেই এসেছে ব্যাপ্তির পরিবর্তে গভীরতা। রবীন্দ্রনাথ লিরিক ফর্ম আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কার করলেন ছোটগল্পের ফর্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। এই যোগাযোগের কথা ভাবলে 'সোনার তরী' কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতাটি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে—

> "ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা
> নিতান্তই সহজ সরল,

সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি—
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা—
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল—"

—যদিও রবীন্দ্রনাথের এই ভাষ্য মোপাসাঁর মতো লেখকের গল্প সম্বন্ধে হুবহু প্রযোজ্য নয়, তথাপি ছোটগল্পের পরিমিতি, সামান্য ঘটনাতে অসামান্য গভীরতা ফুটিয়ে তোলার সাফল্য, উপদেশনীতি-বিরহিত অনুভূতিময়তা—ছোটগল্পের এ সব প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যাংশটিতে প্রকাশিত।

উপন্যাসে আবশ্যকের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ থাকতে বাধা নেই, কিংবা মূল কাহিনীধারা বর্ণনা স্থগিত রেখে গৌণ কাহিনীর বর্ণনায় লেখক সময়ক্ষেপ করতে পারেন এবং তাতে নানা রসের সৃষ্টি হয়। ছোটগল্পে তার উপায় নেই। উপন্যাসে মূল কাহিনী এবং অপ্রধান কাহিনীর স্থান আছে, ছোটগল্পে তা নেই। উপন্যাসে দুই কাহিনীর বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে লেখক নিজের বক্তব্যকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রায়শই একাধিক প্লট থাকে। শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটিতে দুটি প্লট ব্যবহার করা হয়েছে ধনী দরিদ্রের বৈষম্যকে দেখাবার জন্যে। এটা বস্তুতই উপন্যাসের প্রকৃতি। শুধু দুই সমান্তরাল ঘটনার কাল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় ছোটগল্পের প্রতিভাস সৃষ্টি হয়েছে।

এইজন্য উপন্যাস-বন্ধ কিছু শিথিল, ছোটগল্প ঘনবদ্ধ, আঁটসাঁট। উপন্যাসে একটি সমাজ বা পরিবারের ব্যাপক পটভূমিকাটি ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত হয়ে সমগ্র হয়ে দেখা দেয়, তাই তাতে বর্ণনার বাহুল্যও স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ও 'নষ্টনীড়' কালদৈর্ঘ্যে এবং পটভূমির ব্যাপকতায় উপন্যাসোচিত। ছোটগল্পে একমুখী ভাব থাকে, ঘটনার ধারার পরিবর্তে থাকে একটি

ক্লাইম্যাক্স। এই ক্লাইম্যাক্সে আনতে যে ঘটনাধারার প্রয়োজন, ছোটগল্পে তার ইঙ্গিতই যথেষ্ট, তার বিস্তার ছোটগল্পের সংহতির প্রতিকূল। ছোটগল্পের আরম্ভে উপসংহারের কোনো আভাস থাকে না, অথচ তাতে অতি সতর্ক ও পরিমিত বাক্যপ্রয়োগে ব্যঞ্জনা নিয়ে এসে একটি অপ্রত্যাশিত অথচ স্বাভাবিক সমাপ্তিতে গল্পটিকে পৌঁছে দেওয়া হয়।

ছোটগল্পের আরম্ভের চেয়ে এইজন্য সমাপ্তি অধিকতর শিল্পনৈপুণ্যসাপেক্ষ। উপন্যাসের সমাপ্তিতে পরিপূর্ণতা, তারপরে আর কোনো প্রত্যাশা থাকে না। কিন্তু ছোটগল্পের সমাপ্তি পাঠকের কাছে অজস্র কল্পনার সম্ভাবনা মেলে ধরে। গল্পশেষে এই ভাবপূর্ণ অনির্বচনীয়তাই ছোটগল্পের সবটুকু রসকে সংহত করে নিয়ে আসে।

ছোটগল্পের উৎকর্ষের একটা বিশেষ কারণ তার স্টাইল। ভাষার উপর পরিপূর্ণ অধিকার থাকা চাই, শুধু এই কথাই সব নয়, ভাষাকে ইঙ্গিতময় করে তোলা, ঘটনাকে বাছাই করা এবং বর্ণনাকে বক্তব্যের সঙ্গে পরিমিত করে তুলে বক্তব্যকে অবিক্ষিপ্ত একমুখী করাতেই লেখকের নিজস্ব স্টাইল। এই স্টাইলেই লেখকের ব্যক্তিত্ব।

আধুনিক বাংলা গল্পে সার্থক গল্পকারের অভাব নেই। স্টাইলের দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা বিশেষ করে দুজনের উল্লেখ করতে পারি—তারাশঙ্কর এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র। তারাশঙ্কর ইঙ্গিতময় ভাষা ব্যবহার করেন সত্য, কিন্তু তাঁর গল্পে ঘটনাগুলি যথেষ্ট কংক্রীট বা প্রচলিত বাস্তব। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কৌশল হচ্ছে শুধু ইঙ্গিত নয়, সংকেতের আশ্রয় নেওয়ায়। ঘটনাগুলি তদনুপাতে অস্বাভাবিক (যদিও অবাস্তব নয়)।

ছোটগল্পের সুস্পষ্ট শ্রেণীভাগ করা যায় না। লেখকের জীবনদৃষ্টি অনুযায়ী গল্পের রূপ এবং বৈচিত্র্যও বহু। মোটামুটি ছোটগল্পকে এই কয় শ্রেণীতে ফেলা যায়: (১) সমাজসমস্যামূলক (২) মনস্তত্ত্বমূলক (৩) ভাবনামূলক (৪) কাব্যধর্মী (৫) রাজনৈতিক (৬) অতিপ্রাকৃত (৭) ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যবাচক ইত্যাদি। বলা প্রয়োজন, ইদানীং ছোটগল্পের গতি সাঙ্কেতিকতা, ঘটনবিরলতা এবং চেতনা-প্রবাহধারা রচনার দিকে।

ভবতোষ দত্ত

ছোটগল্প ও উপন্যাস—দ্র, উপন্যাস ও ছোটগল্প।

ছোটগল্পের গঠন : উপন্যাস কিংবা নাটক, প্রবন্ধ কিংবা গীতি-কাব্যের মতোই ছোটগল্প একটি বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ। এবং অন্য সব সাহিত্য-রূপের মতোই ছোটগল্পেরও কোন একটি স্থায়ী, সুনিরূপিত, নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। বহু লেখক ও সমালোচক অবশ্যই ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলির কিছু উপযোগিতাও যে আছে তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনটিই সর্বকালের পাঠকের কাছে সমানভাবে গ্রাহ্য নয়। প্রত্যেকটিই হয় অব্যাপ্তি, নয় অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

গল্পের দৈর্ঘ্য অনুসারে ছোটগল্পের পরিচয় নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন অনেকেই। অর্থাৎ ছোটগল্প হলো ছোট আকারের গল্প। এই পরিচয় অসংগত নয় এবং স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু ছোট বা বড়-র বোধ কিছুটা আপেক্ষিক। বনফুল যে দৈর্ঘ্যের গল্প লিখেছেন সেগুলি কি ছোটগল্পের আকারগত আদর্শ? রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় কি ছোটগল্প নয় এই জন্য যে গল্পটি যথেষ্ট ছোট নয়। প্রকৃত-পক্ষে দৈর্ঘ্য নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই এবং যান্ত্রিকভাবে দৈর্ঘ্য নিরূপণ করার চেষ্টা আরো নিরর্থক। কিন্তু 'ছোট'ত্বের একটি বোধ যে ছোটগল্পের রূপ নির্ধারণে আমাদের মনে ক্রিয়াশীল তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আমাদের স্বাভাবিক শিল্পবোধের মতোই সেই বোধ ছোটগল্পকে চিনে নিতে সাহায্য করে।

আমরা জানি যে সব দেশের সাহিত্যেই প্রাচীনকাল থেকে গল্পের অস্তিত্ব। গল্প এক অতি আদরণীয়, জনপ্রিয় সাহিত্যরূপ। ভারতীয় সাহিত্য এক্ষেত্রে বিশেষ গৌরবের অধিকারী। সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃতভাষায় রচিত অসংখ্য গল্প ভারতীয় কথাসাহিত্যের ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখি নীতিমূলক, রোমাঞ্চকর, অলৌকিক ইত্যাদি নানা ধরনের গল্প প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। আমাদের পঞ্চতন্ত্র কিংবা হিতোপদেশ, বেতাল-পঞ্চবিংশতি কিংবা শুকসপ্ততি, জাতক কিংবা কথাসরিৎসাগর-কে নিয়ে গড়ে উঠেছে এক বিশাল গল্পের সাম্রাজ্য। তাদের কি ছোটগল্প বলা চলে না? আসলে এক অর্থে তারাও ছোটগল্প, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এক ধরনের গল্পের উদ্ভব হয়, বিশেষভাবে সেগুলিকেই ছোটগল্প আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী গল্পধারা থেকে তাদের পার্থক্য মেনে নেওয়া হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে ইতিহাসের ধারায় অনেক শিল্পরূপের বিবর্তন ঘটে। এই বিবর্তন

কোন যান্ত্রিক পরিবর্তন অবশ্য নয়। প্রাচীন কালের কোন কোন রচনার সঙ্গে আধুনিক রচনার একটা আত্মিক যোগ স্পষ্টই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একটি রচনা বা সাহিত্যরূপ বিশেষভাবে একালেরই সৃষ্টি। একালে অনেক ছোটগল্প আমরা পড়ি যা গঠনগত দিক থেকে প্রাচীন গল্পের সঙ্গে যুক্ত। আবার অনেক গল্পের কোন পূর্বসূরীর সন্ধান পাওয়া কঠিন। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণ কিংবা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদরিণী। কোন প্রাচীন গল্পকার হয়তো এধরনের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতেন না। কিন্তু প্রাচীন গল্পের সঙ্গে এদের গঠনগত কোন পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করি না। এখানে ঘটনার পর ঘটনা কালানুক্রমিকভাবে 'বর্ণিত' হয়েছে এবং আদ্যোপান্ত বর্ণনার সমাপ্তিতে গল্পের সমাপ্তি। এটিই হলো এই ধরনের গল্পের আখ্যান-রচনার এবং বর্ণনার বৈশিষ্ট্য। এদের পাশে যদি রাখা যায় রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' তাহলে বুঝব প্রাচীন গল্পধারার সঙ্গে এর পার্থক্য মেরুপ্রতিম। প্রথমেই চোখে পড়বে এর আখ্যান-অংশের ঘটনাবিরলতা, কিন্তু তার চেয়েও বড় হলো কাহিনীর সমাপ্তি। এভাবে তো কোন প্রাচীন কাহিনীর শেষ হয় না। এ এক চলমান ঘটনাস্রোতের একটি খণ্ড। বলা চলে প্রাচীন গল্পের সঙ্গে আধুনিক গল্পের পার্থক্যের এটিই সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ।

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে বাংলাভাষায় এই নতুন ধরনের গল্প—যাকে আমরা ছোটগল্প নাম দিয়ে আলাদা করেছি—শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে "ছোটগল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই তাহা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন।" অবশ্য ইতিহাসে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে কোন সাহিত্যরূপের উদ্ভব হয় না, প্রত্যেক সাহিত্যরূপের প্রাক্-ইতিহাস থাকে। তাই অনেক বাঙালী সমালোচক ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মধুমতী' গল্পটিকে বাংলা ছোটগল্পের প্রথম রচনার মর্যাদা দিয়ে থাকেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আরো একটি মন্তব্য করেছিলেন "উপন্যাসের মত, ছোটগল্প জিনিষটাকেও আমরা পশ্চিম হইতে বঙ্গ সাহিত্যে আমদানি করিয়াছি।" আরো বলেছিলেন যে "পূর্বকালে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবু তিনটি ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন…কিন্তু সেগুলি আকারে ছোটমাত্র। নচেৎ উপন্যাসেরই লক্ষণাক্রান্ত।" প্রভাতকুমার নিজে একজন বিশিষ্ট ছোটগল্পরচয়িতা এবং সাহিত্যবোদ্ধা। তাঁর এই মন্তব্য তাই বিশেষভাবে স্মরণীয়। আমাদের

পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ, বেতালপঞ্চবিংশতি-বত্রিশসিংহাসন, জাতক-কথাকোষ-এর বিপুল গল্পজগতের সঙ্গে কোন যোগ নেই নতুন গল্পধারার ? নতুন গল্পধারা পশ্চিমের আমদানি ? একথা খুবই স্পষ্ট যে পাঠক হিশেবে প্রভাতকুমার প্রাচীন গল্পের সঙ্গে আধুনিক গল্পের পার্থক্যটাই বড়ো করে দেখেছেন। মনে হয় প্রাচীন ও নতুনের এই পার্থক্য হলো মূলত আখ্যান-বর্ণনার কৌশলের পার্থক্য ; কাহিনীর ঘটনার সংস্থাপনের কৌশলের পার্থক্য ; কাহিনীর আরম্ভ ও সমাপ্তির কৌশলের পার্থক্য। প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন ও নতুনের ভেদ শুধু বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যমাত্র নয় ; অন্যান্য ভাষার ছোটগল্পের ইতিহাসেরও বৈশিষ্ট্য। সব ভাষাতেই বহুদিন ধরে নানা রূপের গল্প প্রচলিত ছিল—কৌতুক কাহিনী, পিশাচ কাহিনী, যুদ্ধ কাহিনী, নীতিমূলক কথা, পরীর কথা, অনেক ক্ষেত্রে সমকালীন মানুষের জীবনের কাহিনীও। কিন্তু সেইসব কাহিনীর থেকে স্বতন্ত্রধারায় সৃষ্টি হয়েছিল নতুন-গল্প। এই সৃষ্টির পেছনে নতুন কালের ব্যবহারিক প্রয়োজন যেমন যুক্ত ছিল, তেমনই ছিল নতুন শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা। সে বিষয়ে বলার আগে এই প্রাচীন ও নতুনের সম্পর্কটা আর একটু স্পষ্ট করা দরকার।

নতুন গল্প (বা ছোটগল্প) আধুনিককালের সচেতন সৃষ্টি। প্রাচীন গল্পধারার থেকে তা পৃথক কিন্তু আবশ্যিকভাবেই বিচ্ছিন্ন নয়। সমাজে যে ধরনের গল্প প্রচলিত আছে তাকে স্পষ্টই দুটো প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে পারি। একটি ধারা হলো খুবই ক্ষুদ্রাকৃতি ঘটনা, সব সমাজেই রঙ্গ-ব্যঙ্গ-রসিকতার জন্য এইসব গল্পের প্রচলন। বিশেষত মৌখিক ধারায় এরা প্রবাহিত। আমাদের গোপাল ভাঁড়, কিংবা বীরবল কিংবা তেনালীরাম ; তুরস্কে খোজা প্রভৃতির নামে প্রচলিত গল্পগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এদের নাম দিতে পারি 'চূর্ণক'। আরেক ধরনের গল্প—সব সাহিত্যেই সেই গল্পের প্রভাব বেশি—চূর্ণকের ঠিক বিপরীত। চূর্ণক ক্ষুদ্র, ক্ষিপ্র, অনেক সময়ই ঘনপিনদ্ধ ; একটিমাত্র ঘটনা বা চাতুর্য গল্পের প্রাণ। চূর্ণকের বিপরীত চরিত্রের কাহিনী হলো 'আখ্যানক'—গল্পের পূর্ণাবয়বরূপ। এর আখ্যান ও বর্ণনাভঙ্গি মূলত ইতিহাস বা মহাকাব্যানুগ। অর্থাৎ এখানে প্রধান চরিত্র বা নায়কের জীবনের কোন একটি অংশের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা হয়। (অনেকক্ষেত্রে তাই ভিন্ন ভিন্ন অংশ গেঁথে গল্পমালা তৈরি করা হয় সহজেই)। এখানে প্রধান লক্ষ্য একটি কাহিনীর বিস্তার। কাহিনী মানে হলো যুক্তিবদ্ধ

ঘটনাসংস্থানের কালানুক্রমিক বিস্তার। বলাই বাহুল্য যখন উপন্যাস একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপে আবির্ভূত হলো আখ্যানকই ছিল তার ভিত্তিভূমি (অবশ্যই উপন্যাসের গঠনে আরো নানা বর্ণনাত্মক রচনা—ইতিহাস, মহাকাব্য, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি—ক্রিয়াশীল ছিল)। আর আধুনিক গল্প বা ছোটগল্পের উদ্ভব উপন্যাসের পরে। এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উপন্যাসের জনপ্রিয়তার ফলে উপন্যাস রচনার সংখ্যা স্বভাবতই বেড়েছিল। পত্রপত্রিকার আবির্ভাব এবং উপন্যাসের জনপ্রিয়তার মধ্যে একটা গভীর যোগও ছিল। তার ফলে আরেক ধরনের রচনার আবির্ভাব হতে থাকে যাদের আমরা ক্ষুদ্র উপন্যাস বা 'নভেলা' বলতে পারি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী, ইন্দিরা এবং যুগলাঙ্গুরীয় রচনা তিনটির সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন "সেগুলি আকারে ছোটমাত্র, নচেৎ উপন্যাসেরই লক্ষণাক্রান্ত।" বাংলায় রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোটগল্পের সূত্রপাত হবার আগে তাহলে গল্পে যে তিনটি প্রধান ধারা ছিল তা হোল চূর্ণক, আখ্যানক এবং ক্ষুদ্র উপন্যাস। নতুন গল্পধারা এই তিনটির থেকেই যেমন প্রেরণা সংগ্রহ করেছিল, তিনটি থেকেই তেমনই নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে চেয়েছিল। এই প্রেরণা বিষয়গত নয়, গঠনগত। এই স্বাতন্ত্র্যও বিষয়গত নয়, গঠনগত। ক্ষুদ্র উপন্যাস আকারে ছোট, কিন্তু চরিত্রে উপন্যাস ; অর্থাৎ উপন্যাসের মূল লক্ষণগুলি সেখানে উপস্থিত, বহু চরিত্র, বহু ঘটনা, বহু কাহিনীর জাল, দীর্ঘসময়ের বিস্তার ইত্যাদি ইত্যাদি। যে রচনাগুলিকে গত শতাব্দীর মানুষ ছোটগল্প বলে চিহ্নিত করেছিল তাদের সঙ্গে ক্ষুদ্র উপন্যাস বা নভেলা বা নভেলেট্-এর পার্থক্য প্লটের গঠনে ও জটিলতায়। তার মিল অনেক বেশি আখ্যানকের সঙ্গে কিন্তু অমিলও অনেক। অমিল গল্পবর্ণনার কৌশলে, আর এই কৌশলের তিনটি প্রধান লক্ষণ : দ্রুতগতিতে আরম্ভ, তার চেয়েও বড়ো হলো দ্রুত বিকাশ এবং সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় কাহিনীর সমাপ্তি। অর্থাৎ ছোটগল্প একটি বিশেষ গঠনপদ্ধতির সচেতনতা থেকে জন্ম নিয়েছিল।

এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে যেহেতু গল্পধারার একটি প্রাচীন ঐতিহ্য সব সাহিত্যেই ছিল এবং কোন কোন দেশের সাহিত্যে প্রবলভাবেই ছিল তাই নতুন গল্পধারার মধ্যে এই প্রাচীনের চিহ্ন স্পষ্টভাবেই দেখা দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। আবার উল্টোভাবে বলা চলে প্রাচীন গল্পধারার মধ্যে এক আধুনিকতার বীজ নিহিত ছিল তাই অনেকক্ষেত্রে প্রাচীন-নতুনের ঐক্যই স্পষ্ট। আর যেহেতু

ছোটগল্প উপন্যাসের ধারার পাশাপাশি বয়ে চলেছে, অনেকক্ষেত্রেই ছোটগল্প আক্রান্ত হয়েছে উপন্যাসের লক্ষণে। অর্থাৎ তার এক সীমায় আছে আখ্যানক আর এক সীমায় আছে উপন্যাস। নতুন শিল্পরূপ গড়ে ওঠে এইভাবেই। বিভিন্ন শিল্পরূপের সংঘাতে, সমন্বয়ে। কিন্তু এই যে দুই সীমাপ্রান্ত, এর মধ্যে যে গল্প-জগৎ তাকেও একটি নির্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরশুরাম, তারাশঙ্কর ও সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী ও মহাশ্বেতা দেবী সকলেই ছোটগল্প লিখেছেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় তাঁদের গল্পের গঠন এক। ঐক্য আছে তাঁদের সচেতনতায়, রীতিমনস্কতায়; কিন্তু তাঁরা পৃথক একদিকে যেমন তাঁদের জীবন-বোধে, অন্যদিকে বর্ণনার কৌশলে; চূর্ণক-আখ্যানক-ক্ষুদ্র উপন্যাস-এর রীতি গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষমতায়। তাই কোন একটি বিশেষ গঠনের আদর্শে তাঁদের গল্পের বৈশিষ্ট্যের বিচার ভ্রান্ত হতে বাধ্য। বহু সমালোচক "নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা—নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ / অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ"—বাক্যগুলিকে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ছোটগল্পের সংজ্ঞা মনে করে ছোটগল্প বিচার করতে গিয়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছেন (প্রকৃতপক্ষে এই কবিতার চরণদুটিতে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের সংজ্ঞা দেবার কোন চেষ্টা করেননি; একটি বিশেষ মানসিক অবস্থায়, বিশেষ পরিবেশে তিনি কোন্ ধরনের গল্প লিখতে ইচ্ছুক তার কথা বলেছেন মাত্র)। ছোটগল্পের সাধারণ লক্ষণ অবশ্যই ঘটনার বিরলতা, বর্ণনার বিরলতা, কিংবা বহুদিন আগে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যেমন তুলনা দিয়েছিলেন লণ্ঠনের আলোর—"ছোটগল্প রচনার কৌশল…জীবনের একটি ঘটনার উপর পতিত হইয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে।" ছোটগল্পের সাহিত্যরূপ বোঝার জন্য অবশ্যই শুরু করা যেতে পারে এই সূত্র থেকে। কিন্তু শুরু মাত্র। ভুল করা হবে যদি মনে করি এই এক সূত্রে আমরা গেঁথে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার থেকে মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদী। সুরেশচন্দ্রের মন্তব্য আমাদের বুঝতে সাহায্য করে প্রাচীন গল্প ও আধুনিক ছোটগল্পের সীমান্ত-রেখা। কিন্তু ছোটগল্পের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে গত দেড়শ বছরে, পরিবর্তনের পেছনে আছে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের জীবনবোধ, গল্পবলার কৌশল নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা, অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে (যেমন গীতিকবিতা বা একাঙ্কিকা নাটক, কিংবা পরাবাস্তব ধারার চিত্র) সংঘাত ও সমন্বয়; বিভিন্ন দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তার

প্রভাব ও দাবি। আর অবিরাম এমন পরীক্ষা চলেছে এই সাহিত্যরূপ নিয়ে যে এখন কিছুতেই আর কোন একটি সংজ্ঞাতে এর গঠনের নানা বৈচিত্র্যকে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। বিদেশী কোন কোন সমালোচক 'Short fiction' নাম তাই পছন্দ করছেন, সেই নামের মধ্যে ধরতে চাইছেন চূর্ণক, আখ্যানক, ক্ষুদ্র উপন্যাস এবং 'ছোটগল্প'কে। আকারের ক্ষুদ্রত্বের বোধ কিছুতেই বর্জন করা যাচ্ছে না। এর প্রকৃতির মধ্যেও একটা 'ক্ষুদ্রত্ব' আছে তাতেও সন্দেহ নেই—'ক্ষুদ্রত্ব' অর্থে জীবনের একটি খণ্ডাংশ, সুঠাম পূর্ণআয়তনের বিপরীত।

শিশিরকুমার দাশ

ডকুমেণ্টারি মেথড্—দ্র, বর্ণনা ও বিবৃতি ; পত্রোপন্যাস।
ড্রামাটিক নভেল—দ্র, চরিত্রপ্রধান উপন্যাস।

দার্শনিক বা তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস : বলা হয়ে থাকে প্রাচীন মহাকাব্যের উত্তরাধিকারী আধুনিক কালের উপন্যাস। মহাভারতের অন্তর্গত আমরা পাই দার্শনিক কাব্য ভাগবদ্‌গীতা, যে ভাগবদ্‌গীতার দার্শনিক ভাবনা সমগ্র মহাভারতকে অনুপ্রাণিত করেছে। টলস্টয়ের যে ইতিহাসচেতনা উপন্যাস জগতে মহাভারততুল্য যুদ্ধ ও শান্তির মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে প্রকাশ পেয়েছে সেই ইতিহাসতত্ত্বকে যখন উপসংহারে প্রবন্ধাকারে যুক্ত হতে দেখি তখন সেই উত্তরাধিকারের কথাই মনে পড়ে। অথচ উপন্যাস সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য-শাখা এবং মানবতাবাদের প্রেরণায় তার জন্ম—মানুষ এবং তার পরিবেশের কথাই উপন্যাসের সামান্য বিষয়। তুর্গেনেফ্ তো বলেইছেন, তাঁর সমস্ত উপন্যাসের শুরু চরিত্র থেকে, কদাচ তত্ত্ব থেকে নয়। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে যেমন দাবি করা হয়েছে উত্তম পুরুষের অন্তর্ধান, প্রথম পুরুষের সার্বভৌমত্ব, উপন্যাসের ক্ষেত্রে তেমন দাবি করা হয়নি। তাই ঔপন্যাসিক স্বয়ং বা কোনো পাত্রপাত্রীকে মুখপাত্র করে তার মাধ্যমে কাহিনীতে প্রবেশ করতে পারেন। এই অনুপ্রবেশের সুযোগে ঔপন্যাসিকের তত্ত্বচিন্তা উপন্যাসে প্রাধান্য পেতে পারে।

এই দার্শনিকতা মানে জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র নয়। দৃষ্টিকোণ থাকা সম্বন্ধে মতভেদ বেশি নেই। ফ্লোব্যার ও জর্জ সাঁদের পত্রবিনিময়ে যে মতভেদ দেখি তা আপতিক। ফ্লোব্যারের মতে ঔপন্যাসিক জীবনদর্শন প্রকাশ করেন,

তাকে বিবৃত করেন না ; সাঁদ বলেছেন, সত্যকার চিত্রাঙ্কনে তুলিকার পিছনে আত্মার প্রেরণা থাকে। দুই বক্তব্যে যে বিরোধ নেই, তার প্রমাণ ফ্লোব্যারের পরবর্তী উক্তি,—"If the reader can't find in a book that moral that is to be found there, then either the reader is a fool or else the book is false in its exactness." স্বীয় রচনা থেকে স্বকীয় ব্যক্তিত্বকে বিদূরিত করার জন্য যিনি সর্বাধিক শ্রম করেছিলেন সেই ফ্লোব্যার যখন এই কথা বলেন তখন বোঝা যায় সব ঔপন্যাসিকেরই জীবন দেখার কমবেশি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকে।

কিন্তু কোনো কোনো ঔপন্যাসিক শুধু এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তৃপ্ত নন ; গল্প বলার চেয়ে কাহিনীর মধ্য দিয়ে দার্শনিক চিন্তা ও উপলব্ধিকে প্রকাশেই তাঁদের আনন্দ। অবশ্য উপন্যাসে তত্ত্বের স্থান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাবধান করে বলেছেন, দেখতে হবে তা 'জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে'। লিডেল্‌ও *A Treatise of the Novel* গ্রন্থে সতর্ক করেছেন, "any general philosophy of life, true or false, applied deductively by novelist, to particular instances would be almost certain to have a fatal effect upon his art." কিন্তু যদি অবরোহী পদ্ধতিতে আরোপ না করে আরোহী পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয় তাহলে উপন্যাসে শিল্প ও দর্শনের বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। কেন দার্শনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ঔপন্যাসিক উপন্যাসকে তত্ত্বপ্রকাশের বাহনরূপে ব্যবহার করেন সে সম্বন্ধে লরেন্সের উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে। স্বপ্নসঞ্চরণগ্রস্তের মতো এক ন্যায়-অন্যায় বিবেচনাহীন আদি-কারণ বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করছে, গ্রীক্ ট্র্যাজেডির তুল্য এই নগ্ন দার্শনিক ভাবনায় ভাবিত টমাস্ হার্ডির উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে লরেন্স বলেছেন, "Because novel is a microcosm, because man in viewing the universe must view it in the light of a theory, therefore every novel must have the background or the structural skeleton of some theory of being, some metaphysic." এই জাতীয় সার্থক উপন্যাসে চরিত্রগুলি তত্ত্বকথা বলে না, তত্ত্ব চরিত্রগুলির জীবনের মধ্যে সপ্রাণ হয়ে ওঠে, চরিত্রগুলির অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায় ; গার্হস্থ্য জীবনের সীমানার মধ্যে যেন একটি অপার্থিব আলো এসে পড়ে ; একটি চতুর্থ মাত্রা এসে যেন চরিত্রকে প্রতীকধর্মে আক্রান্ত এবং কাহিনীকে

রূপকের মতো করে তোলে অথচ রূপকের তুল্য হয়েও তা বাস্তবতাকে বর্জন তো করেই না, বরং যেন আরো মহৎ অর্থে বাস্তব হয়ে ওঠে, হারমান্ মেল্‌ভিলের ভাষায় 'more reality than real life iteslf can show.' উপন্যাসের দর্শন যে পুরোপুরি ঔপন্যাসিকের নিজের প্রত্যয় তা নয়—তিনি একটি দার্শনিক সমস্যাকে তুলে ধরেন, নানা চরিত্রের জীবনে তার প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই সমস্যা ও প্রশ্নকে তিনি যেন নানা দিক থেকে দেখান, একাধিক বিরোধী মতের মধ্যে একাধিক পাত্রপাত্রীর মাধ্যমে সংঘর্ষ ঘটিয়ে দেখান নির্বস্তু মতবাদ কীভাবে ব্যক্তিজীবনে রক্তেমাংসে বাস্তব হয়ে ওঠে। দার্শনিক উপলব্ধির জ্যোতিশ্চক্রে ভূষিত পাত্রপাত্রী সংবলিত এই জাতীয় উপন্যাসকে ফর্স্টার 'Prophetic fiction' নাম দিয়েছেন। মনে রাখা দরকার দার্শনিক উপন্যাস আর বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাস এক নয়—হাক্সলির উপন্যাস দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাস জন্ম নিয়েছিল মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল থেকে; সমাজচিত্রণে সে নিজেকে চরিতার্থ মেনেছে। ইঙ্গ-মার্কিন উপন্যাস প্রায় আজ পর্যন্ত এই ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছে; উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম মেল্‌ভিলের 'মবি ডিক' (১৮৫১)। তিমি-শিকারের রূপকের মধ্যে দিয়ে এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে 'a battle against evil conducted too long or in the wrong way.' পাপের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম এই উপন্যাসের বিষয় এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, ইভর উইন্টার্সের ভাষায়, 'the vastness of the physical universe and…the vastness of the idea of universe.' ইংরেজি ভাষায় আর একজন দার্শনিক ঔপন্যাসিক হার্ডি। টলস্টয় 'পুনর্জন্ম' (১৮৯৯-১৯০০) উপন্যাসে নিজের আচরিত ও ব্যাখ্যাত খ্রীস্টধর্মকে রূপায়িত করেছেন। তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তি'র (১৮৬২-৬৯) উপসংহারে যে বিস্তারিত ইতিহাস-চিন্তা তা উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন বা আরোপিত মনে হতে পারে, কিন্তু দস্তয়েভ্‌স্কির উপন্যাসে দার্শনিকতা বিচ্ছিন্ন বা আরোপিত নয়। তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস-চতুষ্টয়, 'অপরাধ ও শাস্তি' (১৮৬৬), 'নির্বোধ' (১৮৬৮), 'ভূতগ্রস্ত' (১৮৭১-৭২) এবং 'কারামাজোভ্ ভ্রাতাগণ' (১৮৭৯-৮০)। অস্বাভাবিক নৈতিক সংকটের মুখোমুখি তাঁর প্রধান চরিত্রগুলি তত্ত্বকথা আওড়ায় না, প্রেতগ্রস্তের মতো তারা তত্ত্বের দ্বারা তাড়িত। মানবব্যক্তিত্বের রহস্য, খ্রীস্টের করুণাময় চরিত্র (মিশকিন), প্রেমে ও করুণায় পাপ থেকে পরিত্রাণ

(জোশিমার ক্ষমা, দ্মিত্রির উদ্ধার)—এইসব ধার্মিক-নৈতিক-দার্শনিক চিন্তা তাঁর উপন্যাসের প্রেরণা ও কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কারামাজোফ্ ভ্রাতাগণের অন্যতম ইভান্-কথিত গ্র্যাণ্ড ইন্‌কুয়াইজেটরের উপাখ্যান বা নীতির সীমা সম্বন্ধে রাস্‌কলনিকফের চিন্তা পড়লে বোঝা যায় দার্শনিকতা বাদ দিয়ে দস্তয়েফ্‌স্কির উপন্যাস অকল্পনীয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপন্যাসে আমরা দার্শনিক চিন্তার প্রভাবমাত্র লক্ষ্য করি। অনুমান করা হয় বের্গসঁর সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তিবাদের প্রেরণায় মার্সেল প্রুস্তের অতীত স্মৃতি (*A la recherche du temps perdu*, ১৯১৩-১৯), ডরোথি রিচার্ডসন ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপন্যাসাবলী বিরচিত। জয়েসের 'ইউলিসিসের' (১৯২২) পিছনে হয়তো য়ুঙের মতবাদ সক্রিয় ছিল। কিন্তু এগুলি দার্শনিক উপন্যাস নয়। আবার উপন্যাসের দ্বারাও যে দর্শন প্রভাবিত হয় তার প্রমাণ, দস্তয়েফ্‌স্কি ও কাফ্‌কার রচনা অস্তিবাদী দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। কাফ্‌কার জগতে ব্যক্তি অধরা, অজ্ঞাতপরিচয় শক্তির কাছে মাথাকুটে বিমূঢ় হয় এবং অস্তিবাদের যে অ্যাবসার্ড-অনুভূতি তাকেই পাই এই অন্ধকার জগতের ভয়াবহ অনিশ্চয়তার পরিমণ্ডলে। অনেকাংশে জিদ্ ও মোরিয়াকে, প্রায় সর্বাংশে সার্ত্রে ও কামুতে ঔপন্যাসিকেরাই দার্শনিক হয়ে উঠেছেন। শেষোক্ত দুইজনের ক্ষেত্রে উপন্যাস অস্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত নয় শুধু, তাঁদের উপন্যাসই অস্তিবাদী, এবং এতদূর পর্যন্ত যে অস্তিবাদকে বলা হয়েছে ঔপন্যাসিকের দর্শন। চার খণ্ডে সমাপ্ত সার্ত্রে'র 'স্বাধীনতার পথে' (*Chemins de la liberte*, ১৯৪৫) নির্বাচনে বা সিদ্ধান্তে অক্ষম অন্ধকারহাৎড়ানো একদল মানুষের দেখা পাই, যারা নিজেদের শূন্যতা সম্বন্ধে সচেতন। 'অচেনা'র (*L'Etranger*, ১৯৪২) অ্যাবসার্ড-পরিবেশের শূন্যতার মধ্যে মানবতাবাদকে নতুন করে আবিষ্কার করে কামু তাঁর 'মড়ক' (*La Peste*, ১৯৪৭), 'পতন' (*La Chute*, ১৯৫৬) নামক উপন্যাসগুলি রচনা করেছেন। জার্মান দার্শনিক নীট্‌সে বিরচিত জরথুস্ত্রের উক্তি (*Also sprach Zarathustra*, ১৮৮৩-৯২) গ্রন্থটি কারো কারো মতে একটি দার্শনিক উপন্যাস। কিন্তু জার্মান ভাষায় শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ঔপন্যাসিক টোমাস্ মান্। তাঁর 'জাদুপর্বত' (*Zauberberg*, ১৯২৭) উপন্যাসে ক্ষয়রোগী নায়ক স্যানাটোরিয়ামের অন্য রোগীদের মাধ্যমে সমকালীন পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এবং প্রেম, মানবিকতাবাদ, মরমীয়াবাদ, মনোবিকলন এই উপন্যাসে দার্শনিক

দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিশ্লেষিত। তাঁর 'ডক্টর ফস্টাসে' (১৯৪০) যদিও লৌকিক পুরাণ ও সংগীতচিন্তার ভিত্তিতে জার্মানির জাতীয় প্রলয় বিম্বিত, তথাপি সমগ্র উপন্যাসের পিছনে এক প্রগাঢ় দার্শনিক মননের অস্তিত্ব অনুভব না করে পারা যায় না।

বাংলা উপন্যাসে প্রথম মনীষাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এক ক্ষুর-ধার মনীষা শুধু উপন্যাসের পিছনে কার্যকর ছিল তাই নয়, তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দর্শনচিন্তাকে উপন্যাসের অন্তর্গত করতে আগ্রহী ছিলেন। মিলের নিয়তিবাদের সঙ্গে হিন্দু কর্মফলবাদ, 'দেবী চৌধুরাণী'তে (১৮৮৩) কোম্‌তের মতবাদ ও গীতার নিষ্কাম ধর্মের তিনি সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুশীলনধর্ম ক্রমেই তাঁর উপন্যাসকে ধূসর দার্শনিকতায় আচ্ছন্ন করছিল, কিন্তু তিনি কল্পনা ও মনীষার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে পারেননি। রবীন্দ্র-নাথের 'গোরা' (১৯০৯) উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার সংলাপের মধ্যে মানবের উল্লেখযোগ্য স্থান আছে বটে কিন্তু পরিণামে জানা যায় গোরার প্রত্যয় যত না উপলব্ধ তার চেয়ে বেশি ভ্রান্ত সংস্কারজাত। এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা দস্তয়েফ্‌স্কির পাত্রপাত্রীর মতো জীবনজিজ্ঞাসার দ্বারা তাড়িত নয়। বরং শচীশ বেশি তাড়িত, তাই 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) কিছুদূর পর্যন্ত দার্শনিক উপন্যাসের সর্ত পালন করে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মননশীলতা আছে, দার্শনিক চিন্তার প্রভাব আছে, কিন্তু 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫) প্রভৃতি উপন্যাস দার্শনিক নয়। অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-৪২) উপন্যাসধারায় পাশ্চাত্য দর্শন-চিন্তার প্রভূত প্রভাব আছে, সুধী ও বাদল স্বতন্ত্র প্রত্যয়ের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের শেষ পর্যায়ের কোনো কোনো উপন্যাসে নৈতিক সমস্যাগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু মানব সভ্যতা সম্বন্ধে যে প্রগাঢ় জ্ঞান, যে প্রবল মনীষার পেশলতা, নৈতিক সংকটের সঙ্গে যে গভীর পরিচয় দার্শনিক ঔপন্যাসিকের প্রয়োজন, তার অনুপস্থিতিতে বাংলায় এখনো এই জাতীয় কোনো সার্থক রচনার আবির্ভাব হয়নি।

অশ্রুকুমার সিকদার

দুর্বৃত্ত: প্রচলিত ধারণায় দুর্বৃত্ত বলতে এমন এক চরিত্রকে বোঝায় যে স্বভাবত প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং যার ধারণা তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে এবং তারই প্রতিবিধান কল্পে সে প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষের সর্বনাশে কৃতসংকল্প।

তার মধ্যে হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় স্বভাবতই ফুটে ওঠে।

সাহিত্যে দুর্বৃত্ত চরিত্রের উৎস সন্ধানে অব্যবহিতভাবে গ্যয়টের মেফিস্টো-ফিলিস-এর কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে তো যথার্থত চরিত্র নয়—অর্ধেক মানব সে অর্ধেক প্রতীক। তার মধ্যে যে মৃত্যুশীতল কঠিনতা কিংবা ধ্বংসোন্মত্ততা দেখি দুর্বৃত্ত সকল চরিত্রে আমরা তা লক্ষ্য করি না অথবা কোল্‌রিজের কথামতো 'উদ্দেশ্যহীন নিষ্ঠুরতা' (motiveless malignity) কিংবা অপরের যন্ত্রণাক্লিষ্ট রূপ দেখে নিঃসংসক্ত আনন্দ (disinterested delight) উপভোগও অধিকাংশ খল চরিত্রে দেখতে পাব বলে ধরে নিই না। পুরনো ধারণায় দুর্বৃত্ত সেই যে ভালোকে ভালো বলেই সহ্য করতে পারে না অথবা মন্দকে মন্দের খাতিরেই ভালোবাসে। আমাদের দুর্বৃত্ত আলোচনায় সেইসব অতিনাটকীয় 'খল' চরিত্রের কথাও বর্জন করা হবে যাদের একবার দেখেই পাষণ্ড বা দুর্বৃত্ত বলে চিনে নেওয়া যাবে। বাংলা কথাসাহিত্যে সত্যকারের দুর্বৃত্ত চরিত্র আমরা কদাচিৎ দেখতে পাই—নারকীয় নিষ্ঠুরতার সাক্ষাৎ তো আরো-ই দুর্লভ।

সত্যকারের শয়তান বা প্রকৃত খল চরিত্র আঁকতে হলে যে ক্ষমতা, প্রখর বুদ্ধি এবং সুউচ্চ কল্পনাশক্তির দরকার বাঙালী কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে তার অভাব বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা যায়। মার্লো যে প্রতিভা নিয়ে 'ডঃ ফস্টাসের' কল্পনা করেছেন, গ্যয়টে যে কলমে 'মেফিস্টোফিলিস' এঁকেছেন, সেক্সপীয়ার গড়েছেন 'ইয়াগো'কে আর মিল্টন চিত্রিত করলেন 'শয়তান'—সে প্রতিভা, সে তীক্ষ্ণতা আমাদের দেশে দুর্লভ। অথবা বলা যায়, ভালো ও মন্দ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস অন্যরকম। তাই নিছক মন্দ চরিত্রও বাঙালী কথাসাহিত্যিকদের কল্পনায় কোমলতা লাভ করে ভালো ও মন্দে মিশে ভদ্ররকমের দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছে। খল চরিত্রে কিছু পরিমাণে শুভচিহ্ন দোষাবহ নয়—কারণ, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, খল চরিত্রও তার খলত্বের চেয়ে বড়ো অর্থাৎ তার মধ্যে দুর্বৃত্ততা ছাড়াও কিছু ভালো গুণ থাকতে বাধা নেই—এই ভালো সবসময় নীতিগত ভালো হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে দুর্বৃত্তকেও যে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, সে তার ভিতরকার ঐ 'ভালো'র জন্য। যখন এই ভালো তার ভিতরকার মন্দ দ্বারা নিরঙ্কুশভাবে আচ্ছন্ন হয় তখন সে ধ্বংস করে অপরকে, কখনও হয়ে ওঠে আত্মনাশা। কারণ দুর্বৃত্তকেও কর্মফল ভোগ করতে হয়, তাতেই রক্ষিত হয় সাহিত্যের মর্যাদা। পরিণামে দুর্বৃত্ত পারে না কখনই জয়যুক্ত হতে।

কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যে দুর্বৃত্ত চরিত্রের মধ্যে সেই বুদ্ধির দীপ্তি, সেই মানসিক শক্তির পরিচয় আমরা কদাচিৎ পেয়েছি যা ঐ চরিত্রের খলত্ব সত্ত্বেও আমাদের মনের প্রশংসা পেয়ে যায়; তবে পাষণ্ডের পাষণ্ডত্ব থেকে তার ভালোত্ব যেহেতু পৃথক করা অসম্ভব তাই নিছক প্রশংসার পাত্র সে নয়, ঐ প্রশংসা ঘৃণা বা ভীতি মিশ্র। আবার এই প্রশংসা-মিশ্র ঘৃণা বা ভীতি জাগালেই হবে না, লেখক তখনই দুর্বৃত্ত চরিত্রাঙ্কনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছেন বলা চলে যখন দুর্বৃত্ততা সত্ত্বেও ঐ চরিত্রের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি কিংবা অনুকম্পা জাগাতে পারেন। সাহিত্যের স্মরণযোগ্য খল চরিত্রগুলির প্রতি আমাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাবে।

বাংলা উপন্যাসের আদিযুগের দু'জন সাহিত্যিক—বঙ্কিমচন্দ্র ও তারকনাথের উপন্যাস থেকে উদাহরণ নেওয়া যাক। 'স্বর্ণলতা'র শশাঙ্ককে আমরা দুর্বৃত্ত বলি। অর্থলোভেই সে স্বর্ণের মত নিষ্পাপ নিষ্কলুষ চরিত্রের সর্বনাশে তৎপর হয়েছিল, যদিও সে অসৎ অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়েছে এবং পাপের বেতন তাকে মিটিয়ে দিতে হয়েছে। শশাঙ্ক যেন খল চরিত্রের মোটামুটি স্থূল লক্ষণ মিলিয়ে আঁকা দুর্বৃত্ত চরিত্র—কিন্তু সে চরিত্রে দৃঢ়তা নেই—নীতিবোধের মাপকাঠিতেই সে খল এইমাত্র বলা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে খল চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষাকৃত পূর্ণতা পেয়েছে বলা যায়। 'কপালকুণ্ডলা'র কাপালিক, 'বিষবৃক্ষ'-র দেবেন্দ্র দত্ত, হীরা, 'রজনী'র হীরালাল —এদের মধ্যে কম বেশি খলত্বের পরিচয় পাই। নির্মম-প্রকৃতি নরঘাতক কাপালিক প্রকৃতপক্ষে ঠিক খল নয়—সে তন্ত্রসাধনার বিকৃত সাধক। পুরনো যুগের খল চরিত্রের সঙ্গে তার কিছু মিল আছে, এইমাত্র। দেবেন্দ্র দত্ত প্রবৃত্তির বশে যে দুষ্কর্মে উদ্যত হয়েছিলেন, তাতে তাকে খল বলেই মনে হয়, কিন্তু তার দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতার দুঃখ যখনই লেখক স্পষ্ট করে তোলেন, তখন তার প্রতি ঘৃণা অপেক্ষা সহানুভূতিই জাগে। এবং ঐ দুষ্কৃতিকে মানব স্বভাবের স্বাভাবিকতা বলে স্বীকার করে তার প্রতি কঠোরতা লঘু হয়ে আসে। 'বিষ-বৃক্ষে'র অপর চরিত্রটি বরং অনেক বেশি খল প্রকৃতির। হীরার মধ্য দিয়ে যে ঈর্ষাকাতর প্রতিহিংসাপরায়ণতার চিত্র ফুটে ওঠে, তাকে প্রতিনায়িকা চরিত্রে দুর্বৃত্ততার চিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতার নিদর্শন বলে গ্রহণ করা চলে। 'সূর্যমুখী সুখী, হীরা দুঃখী', সেইজন্যই সূর্যমুখীকে সে সহ্য করতে পারে না। ক্ষোভ

তার বিধাতার উপরেও,—'বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন?' হীরা তাই প্রতিহিংসাপরায়ণা। অবশ্য অন্তিমে চরম শাস্তি হীরাকেও পেতে হয়েছে। হীরার পাশে হীরালাল দুর্বৃত্ত হিসেবে ম্লান চরিত্র। 'চন্দ্রশেখরে'র তকি খাঁ প্রতিনায়ক হিসেবে শঠ এবং পাষণ্ড চরিত্রের, এবং তাকেও তার কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হয়েছে।

মানুষের মহত্তর পরিচয়ে যাঁর বিশ্বাস অটল, সেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যথার্থ দুর্বৃত্ত বা খল চরিত্রের তেমন পরিচয় যে পাওয়া যাবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবুও তাঁর প্রথম জীবনের রচনা 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট'-এ প্রতাপাদিত্য কিংবা 'রাজর্ষি'র রঘুপতি—ওরই মধ্যে কিছুটা খল চরিত্র হতে পেরেছে। যদিও রঘুপতির মধ্যে লেখক দুর্বৃত্তের সেই বলিষ্ঠ মনোভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে পারেননি বরং অযথা হীনতার আরোপ করেছেন। 'গোরা'র পানুবাবুর মধ্যে অবশ্য তিনি কিছুটা খল স্বভাব ফুটিয়ে তুলেছেন।

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে কখনও নায়ক চরিত্রে কখনও বা পার্শ্বচরিত্রে খলতার পরিচয় পাই। 'দেনাপাওনা'র জীবানন্দ চরিত্রে দুর্বৃত্তের লক্ষণ বেশ স্পষ্ট। তথাপি তার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি হারাতে দেননি বলেই জীবানন্দ দুর্বৃত্ত-নায়ক হয়ে উঠতে পেরেছে। এই উপন্যাসের তারাদাস স্বভাব-খল, জনার্দন দুর্বৃত্ত চরিত্রের লক্ষণাক্রান্ত। 'পল্লীসমাজে'র বেণী গাঙ্গুলী দুর্বৃত্ত প্রকৃতির, 'বিজয়া'র রাসবিহারীকে খল বলতে পারি।

সুখেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

দৃষ্টিকোণ: উপন্যাসের নানা প্রচলিত আদর্শই প্রমাণ করে, ঔপ-ন্যাসিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের শিল্পসৃষ্টিকে দেখেছেন। উপন্যাসের গঠনশৈলী, আখ্যান, সংলাপ ও পরিবেশের সম্পর্ক, ঔপন্যাসিকের নৈতিক আদর্শ এবং তাঁর শিল্পিত চরিত্রের মধ্যে পরিমাণ-সামঞ্জস্য এখনো বিধিবদ্ধ সংজ্ঞায় নিরূপিত হয়নি। তাই ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকোণ কত বিচিত্র হতে পারে, তার সীমা আজও অনির্ণীত। তবু ইদানীংকাল পর্যন্ত রচিত উপন্যাসের উপস্থাপনারীতি বিশ্লেষণ করলে প্রধানত কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের পরিচয় মেলে।

১. **চিত্ততোষণ বা Entertainment :** আদিতম গল্পের মতো উপন্যাসেরও প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য আখ্যানবিবৃতি অর্থাৎ প্লটের আকর্ষণীয় বিন্যাস। চরিত্র ও ঘটনার চিত্তহারী বর্ণনা-কৌশলে পাঠকচিত্তে বাস্তবের প্রতীতি সঞ্চার করাই

অনেক ঔপন্যাসিকের আকাঙ্ক্ষিত। ই. এম. ফর্স্টার উপন্যাসের নরনারী (People), ঔপন্যাসিকের স্বকৃতভাষ্যকে প্রাধান্য দিয়েও পরিহাসচ্ছলে মেনেছেন—'Yes, oh dear yes—the novel tells a story.' অন্য আর্টের মতো উপন্যাসও হবে চিত্তবিনোদক। প্রথম ইংরাজি উপন্যাস 'পামেলা'-র লেখক রিচার্ডসনের এবং স্মলেট, ট্রলপ, ডিকেন্স, হার্ডিরও অন্যতম গুণ পরিণাম পর্যন্ত আকর্ষণকারী কাহিনীবিন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও ঘটনা-সমাবেশ-কৌশল এবং কাহিনীগ্রন্থন-নৈপুণ্যই প্রধান। যোগবলে রজনী ও শৈবলিনীর প্রেমাস্পদ পরিবর্তন, রোহিণীর জীবনে নিশাকরঘটিত কলঙ্ক, সীতারামের নিরুদ্দিষ্ট পরিণাম নিঃসন্দেহে গ্রহণীয় নয়। কিন্তু অমরনাথ, লবঙ্গলতা ও রজনীর আত্মকথাভঙ্গিতে বিবৃত কাহিনীর অপূর্ব নাটকীয়তা, শৈবলিনীর দুর্মোচ্য আত্ম-সংকট, বিধবার হৃদয়ে সলজ্জ প্রেমের বিকাশ, সীতারামে একাধিক উপকাহিনীর সমাবেশ কখনই উপন্যাসের ঔৎসুক্যমূল শিথিল করে না। প্রকৃতপক্ষে 'ঘরে-বাইরে'র পূর্ব পর্যন্ত বাঙালী উপন্যাসিকের দৃষ্টি মূলত আনন্দবিধায়কের—তাই প্লটের চমৎকারিত্বেই লেখকেরা বেশি আগ্রহী।

২. **ফলিত মনস্তত্ত্ব**: অনেকে উপন্যাসকে মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। 'As in Psycho-analysis the patient is isolated from external stimuli that his mind may play over his past and link it to the present'—ঔপন্যাসিকও মনোবিদের মতো তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলির আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করেন। মনস্তত্ত্ববিদের কাজ বিশেষ প্রেক্ষিতে ব্যক্তির আচরণ-প্রবণতার কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার; ঔপন্যাসিকও ব্যক্তির শোচনীয় জীবনপরিণামের হেতুমূলসন্ধানী। প্রভেদ উভয়ের নিরীক্ষাপ্রণালীতে এবং তার ফলাফল প্রকাশের ভঙ্গিতে। একজনের অন্বিষ্ট আর্ট, অন্যের বিজ্ঞান। অবশ্য ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বচর্চার পূর্বে এহেন মনঃসমীক্ষার প্রাধান্য ঔপন্যাসিকদের লক্ষ্য ছিল না—মনস্তত্ত্বসম্মত চরিত্র বিশ্লেষণ উপন্যাসে উনিশ শতকেরই উত্তরাধিকার।

৩. **অসংগতিশোধন**: আবার সামাজিক অসংগতিশোধন, রাজনৈতিক, বা নৈতিক সংস্কারসাধনকেও অনেক ঔপন্যাসিক শিল্পের দৃষ্টিকোণরূপে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য ঔপন্যাসিক সমাজসংস্কারক বা নীতিপ্রবক্তা নন। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করবেন, কোনো সমাধান দেবেন না। এই ধারণানুযায়ী ঔপন্যাসিক সমাজসংস্কারকদের প্রেরণাদাতা। অ্যান্টন চেখভের মতে, 'An Artist (ঔপ-

ন্যাসিক) observes, selects, guesses, combines—these in themselves pre-suppose questions ; if from the very first he had not put a question to himself, there would be nothing to define nor to select.' বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত স্মরণীয় : 'কাব্যের (সাহিত্যের সকল বিভাগ সম্পর্কেই প্রযোজ্য) উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন।' শরৎচন্দ্র চেখভের মতোই সমাজ-সচেতন শিল্পী। তাঁর গল্প-উপন্যাসে অনেক সময় সংস্কারবাসনা মুখ্য হয়েছে। যেমন 'পল্লীসমাজ', 'নিষ্কৃতি', 'অরক্ষণীয়া'। কিন্তু শেষের দুটি রচনায় শিল্পগুণের অপকর্ষ ঘটেনি। 'আনন্দমঠ' ও 'পথের দাবী' উপন্যাসে রাজনৈতিক সংস্কারপ্রয়াসের নিদর্শন। মিসেস স্টো-র 'আঙ্কল টমস্ কেবিন', রমেশচন্দ্র দত্তের 'সমাজ' ও 'সংসার' অসংগতি-শোধনের উদ্দেশ্যেই রচিত। বিশেষ আইডিয়াকে উপন্যাসে রূপায়িত করাই এখানে ঔপন্যাসিকের প্রেরণার উৎস। অধিকাংশস্থলেই এরূপ বহিঃপ্রেরণায় রচিত উপন্যাস শিল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। রুশ সাহিত্যে টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি', ম্যাক্সিম গোর্কির 'জননী' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। বিশেষ যুদ্ধের পটভূমিতে সমগ্র কাহিনীর উপস্থাপনা সত্ত্বেও একটি স্থান-কাল নির্বিশেষ নৈতিক আদর্শ—Tolostyeanism-ই 'যুদ্ধ ও শান্তি' পাঠের ফলশ্রুতি ; 'জননী' উপন্যাসে গোর্কি সেকালের বৈপ্লবিক চেতনাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

উপন্যাসে লেখকের আইডিয়ার রূপায়ণ সম্পর্কে বাল্জাকের মত—'The idea personified in a character, shows a finer intelligence.' বলা-বাহুল্য প্রকৃতিবাদী বাল্জাকের ঔপন্যাসিক বাস্তবতার পটেই এই উক্তির তাৎপর্য বিচার্য। টুর্গেনেভ্ চরিত্রকে 'idea personified' বা আদর্শপুত্তলমাত্র করেননি ; বরং তিনি এই ধারণার বিরোধী। তিনি চরিত্রকে মনে রেখেই উপন্যাস আরম্ভ করেন, আইডিয়া সেই চরিত্রবিকাশের অপরিহার্য লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। সংস্কার-বাসনা এবং উপন্যাসে তার সংস্রব সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয়ত সত্য বলে চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত করে তোলার মত পাপ অল্পই আছে।' অন্যত্র, 'কিন্তু তাই বলে আমরা সমাজসংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই।'

৪. **বাতায়নদর্শক :** কোনো কোনো ঔপন্যাসিক যেন বাতায়ন দিয়ে পার্শ্ববর্তী জগৎকে প্রত্যক্ষ করেন। জীবনের উপকরণের মধ্যে থেকে তার স্বরূপকে চেনা যায় না, কারণ জীবনের সবটুকু আমরা কাছে থেকে দেখতে পাই না, হয় খণ্ডকেই সত্য ভাবি, নতুবা তাৎপর্যহীন ঘটনাকেও সত্যের মহিমা অর্পণ করি। হেন্‌রী জেম্‌স বাতায়ন-দর্শকের (watcher at the window) দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর অভিমত, 'ব্যক্তিগত প্রবণতা ও অভিপ্রায়ের দ্বারা উপন্যাসসৌধের জানালাগুলি খোলা যায়, সে-জানালাও তো একটি নয়, অজস্র ; অনেক জানালা আজও খোলা হয়নি।' জেম্‌সের *Golden Bowl*, *Ambassadors* বাতায়ন-দর্শকের ভঙ্গিতে লেখা উপন্যাস। বাংলায় এ-ধরনের উপন্যাস সম্প্রতি লেখা হচ্ছে। কোনো ঔপন্যাসিকই বাতায়ন-দর্শকের ভঙ্গিকে সমগ্রভাবে এখনো গ্রহণ করেননি।

৫. **আগন্তুক :** সাহিত্যে কামু-সার্ত্র অনুসৃত অস্তিবাদের (Existentialism) প্রভাবেই আগন্তুকের দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস লেখা হচ্ছে। বিশেষত কামুর *Outsider* উপন্যাস থেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। এর নায়ক মিউরসল্ট বৃদ্ধাদের এক আশ্রমে মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে কর্মস্থল থেকে রওনা হয়েছে, সারারাত সে মায়ের কফিনের পাশে বসে থেকেছে, কখনো জেগে কফি খেয়েছে। পরদিন সকালে যথারীতি মাতৃকৃত্য সেরে একটি সরোবরে সাঁতার দেখতে গিয়ে হঠাৎ অফিসের জনৈকা পুরনো টাইপিস্ট্‌ মেরি কর্ডোনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তারা নির্মেঘ আকাশের নীচে দেহলগ্ন হয়ে রইল, সন্ধ্যায় একটি হাসির চলচ্চিত্র দেখল। মিউরসল্টের যেমন শোক নেই, মেরি কর্ডোনার তেমনি সহানুভূতি নেই। তারা বিবাহ করেনি, কিন্তু দেহোপভোগে কোনো বাধা হয়নি। 'অন্তরঙ্গ আত্মভাবণ' আগন্তুক ভঙ্গির উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। বাংলায় দু-একটি উপন্যাস-গল্পে এই দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছে ; কিন্তু যে দার্শনিক প্রত্যয়ে (Philosophy of the absurd) এই আগন্তুক চেতনার মূল প্রোথিত, তার সঙ্গে যোগ না থাকায় আগন্তুক দৃষ্টিকোণ এখনো সার্থক হতে পারেনি।

৬. **চেতনাপ্রবাহ :** প্রখ্যাত দার্শনিক উইলিয়াম্‌ জেমস্‌ তাঁর *Principles of Psychology* গ্রন্থে বলেছেন, "Consciousness, then does not appear to itself chopped up in bits such words as 'chain' or 'train' do not describe fitly as it presents itself in its first instance.···Let

us call it the stream of thought, of consciousness, or of subjective life." ১৯১৩ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে ফ্রান্সের মার্সেল প্রুস্ত, ইংল্যাণ্ডের ডরোথি মিলার্ রিচার্ডসন, আয়ার্ল্যাণ্ডের জেম্‌স্ জয়েস্ চেতনাপ্রবাহ-ধর্মী উপন্যাস রচনা করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ফলিত মনস্তত্ত্ব-ধারণারই যুগোপযোগী পরিবর্তন। এঁদের মতে, আমাদের মনোজগতে সুস্থিরভাবে কোনো চিন্তার উদয় হয় না, তারা পরস্পরসম্পৃক্ত, সম্পূরক, কখনো অসম্বদ্ধ এমনকি স্ববিরোধীও হতে পারে। তারা অস্থির, সর্বদাই চলেছে জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যের দিকে—বহতা নদীর মতো। সাধারণত এই দৃষ্টিভঙ্গির ঔপন্যাসিক উত্তমপুরুষে কাহিনী বিবৃত করেন। লেখক ও নায়ক প্রায় একাত্ম, পাঠককেও নায়কের অন্তর্জগতের শরিক করতে চান ('This kind of Novel seemed to turn the reader into an author')। Internal monologue বা অস্ফুট আত্ম-গত ভাষণ চেতনাপ্রবাহধর্মী ঔপন্যাসিকের বৈশিষ্ট্য। অনেকে চার্লস ডিকেন্সের 'staccato accents' বা লরেন্স স্টার্নের ট্রিস্ট্রাম স্যাণ্ডির বর্ণনা-রীতিকে আত্মগত বচঃবৃত্তির উৎস বলেছেন। এই Internal monologue-এর চূড়ান্ত রূপ 'ইউফোনি' ও 'এপিফ্যানি'তে। জেম্‌স্ জয়েস্, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারক, জয়েসের 'ইউলিসিস্' এই ধারার মহাকাব্যোপম উপন্যাস। কিন্তু জে. বি. প্রিস্টলে ইউলিসিস্ এবং ফিনাগানস্ ওয়েকের আলোচনায় বলেছেন, 'But they are both outside Fiction,' গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'সৃষ্টি' এই দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বাংলা সার্থক উপন্যাস। চেতনাপ্রবাহধর্মী উপন্যাসের সময়-অতিক্রমণ সম্পর্কে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যা উদ্ধারযোগ্য : 'প্রথম পরিচ্ছেদের [সৃষ্টি] প্রথমাংশে ১৯৪৩-এর ছয়মাস একসঙ্গে উপস্থিত। শুধু তাই নয়, ১৯৪৪ সনও এসে উঁকি দিচ্ছে। অনায়াসে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তিছাড়া এমন অভিজ্ঞতা আর কার আছে ? আমি বলব, আর যারই থাকুক, দীপায়নের [উপন্যাসের নায়ক] তেমন বিভূতি নেই।··· আমাদের চন্দ্র-সূর্য, দিনক্ষণ, ঘড়ি-তারিখ নিত্য ধাবমান, কিন্তু দীপায়নের একটি ঘটনা—গান্ধীজির উপোসের একটি মুহূর্ত—ওর মনে সুস্থিত এবং সুস্থির। মন যে-ঘটনায় নিবদ্ধ তা যখন নিশ্চল হলো, তখন সময় নামক বস্তুটিকেও সেই ঘটনার স্থির বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে।'

৭. **রোমান্সরসিক :** বাস্তবের সংকীর্ণ সীমা থেকে অনেকে চিত্তের মুক্তি

খোঁজেন উপন্যাসে। তাঁদের কাছে রোমান্স-রসাস্বাদই উপন্যাসের আকর্ষণ। এই রোমান্সরসিকের দৃষ্টি স্কট্ কখনো ত্যাগ করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসেও রোমান্স-প্রভাব আছে। অবশ্য 'কপালকুণ্ডলা'র পর তাঁকে যথার্থ রোমান্সরসিক বলা যায় না। আধুনা বাংলা উপন্যাসে বর্তমান সমস্যাজর্জর জীবনের পরিবর্তে পার্বত্য আদিবাসী, আরণ্যসমাজ, ইতিহাস-কিংবদন্তিকে নিয়ে নতুনভাবে রোমান্সরস পরিবেশনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

৮. **প্রকৃতি-নিরীক্ষা :** 'প্রকৃতির কবি' অভিধাটি সুপ্রচলিত, 'প্রকৃতির ঔপন্যাসিক' প্রয়োগও যুক্তি-সম্মত। কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধই অনেক ঔপন্যাসিকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সূচিত করে। উপন্যাসমাত্রেই প্রকৃতি পরিবেশ বর্ণনা থাকে। সেই বর্ণনা হয়তো ঔপন্যাসিকের কবি-কল্পনার সুস্পষ্ট পরিচয়বহ, তবু স্থানবিশেষের বর্ণনা প্রকৃতিনিরীক্ষা নয়। উপন্যাসে ইতিহাস প্রেক্ষিতের মতোই প্রকৃতিবর্ণনা চরিত্র-পরিস্ফুটনের উপায়; যেমন সমুদ্রসৈকতে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎকার, 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ-শৈবলিনীর সন্তরণদৃশ্যে চন্দ্রালোকিত ভাগীরথী, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বারুণীতীরে বসন্ত। শরৎচন্দ্রের 'আঁধারের রূপ'-এ শ্মশান বর্ণনা, 'ধাত্রী দেবতা'য় তৃষ্ণার্ত মাটির বক্ষঃবিদীর্ণ চিত্র উপভোগ্য। কিন্তু বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র বা তারাশঙ্কর কেউ 'প্রকৃতির উপন্যাস' লেখেননি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় সার্থক প্রকৃতি-নিরীক্ষার কথাশিল্পী। 'বনে পাহাড়ে', 'পথের পাঁচালী' ও 'দেবযান' প্রকৃতি-নিরীক্ষার উপন্যাস। এখানে প্রকৃতি-নিরীক্ষণ শিল্পীর জীবন-নিরীক্ষণেরই অন্যতম প্রকাশ। প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ থেকে তার অন্তরস্থ আত্মাকে অনুসন্ধান করেছেন বিভূতিভূষণ। তারই পরিণতি আধিমানসিকতায় 'দেবযানে'। হেমিংওয়ের অনেক উপন্যাসে, হার্ডির কোনো কোনো উপন্যাসে প্রকৃতি-নিরীক্ষা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে—বলা যায় লেখকের জীবনদর্শনই ব্যক্ত করেছে।

এ ছাড়া অসংখ্য দৃষ্টিকোণ থেকে ঔপন্যাসিক তাঁর শিল্প ও জীবনকে দেখতে পারেন। এ বিষয়ে শেষ কথা, কিছু নেই, উপন্যাস জীবনের অজস্র জটিলতাকে আত্মসাৎ করছে—তার ফলে নতুন প্রকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির অভ্যাগম।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

নাটক ও উপন্যাস—দ্র. উপন্যাস ও নাটক।

নামকরণ : নামের উদ্দেশ্য গুণাত্মক নয়, নির্দেশাত্মক। কিন্তু ভারতীয় দর্শন তো কোথাও কোথাও এ কথাও বলে নাম এবং নামী যেখানে অভিন্ন সেখানেই নামের সার্থকতা। বস্তুত সাহিত্যজগতে এই অভিন্নতার তাৎপর্যের মধ্যেই নামকরণের সার্থকতা খুঁজতে হয়। বাস্তব জগতে নামকরণ হয়তো অনেক-ক্ষেত্রেই নির্দেশাত্মক, কারণ শিশু-সন্তানের ভবিষ্যৎ না জেনেই নিরুপায় বাবা-মা সেখানে মূক মেয়েকে 'সুভাষিণী' নাম দিয়ে ফেলেন, কিন্তু সাহিত্যজগতে উপন্যাস-স্রষ্টা তাঁর সন্তানের সমস্ত অভিজ্ঞতার জগৎটাকে পেরিয়ে আসেন বলেই তাঁর নামকরণ নিরুপায় নয় ; কেবল নামের জন্যই নাম নয় অর্থাৎ নাম সেখানে কেবল নির্দেশাত্মক নয়, গুণাত্মক, অন্তত লেখকের কাছে পাঠকের অনেক-ক্ষেত্রেই সেইরকম প্রত্যাশা থেকে যায়। এই সম্ভাবিত প্রত্যাশা থেকেই দেখা দেয় নামকরণের সার্থকতার প্রশ্ন। সমস্ত উপন্যাস শেষ ক'রে আর একবার ফিরে আসতে ইচ্ছে করে উপন্যাসের প্রচ্ছদপটে, নামের সঙ্গে বিষয়ের নিগূঢ় সম্পর্কের সেতুটা খুঁজে দেখতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সম্পর্কের সেতু যে কেবল একটা নয়, তা বাংলা সাহিত্যে প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিকের নামকরা উপন্যাসগুলির দিকে তাকালেই ধরা পড়ে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য কি ? ঘটনা না চরিত্র ? বিতর্কের আসরে এর শেষ সমাধান খুব কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু তর্কের যুক্তিগুলো নিঃসন্দেহে প্রমাণ ক'রে দেয় যে উপন্যাসে উভয়ের প্রাধান্যই লক্ষ্যভেদের গুরুত্বের ক্ষেত্রে সমমাত্রিক। আর উপন্যাসের নামকরণ যদি সেই লক্ষ্যজয়ের বিজয়পতাকা হয় তবে তার দণ্ডটা হবে হয় ঘটনাকেন্দ্রিক নয়তো চরিত্রকেন্দ্রিক। অন্তত ঊনবিংশ শতকের বাংলা উপন্যাসে এইই ছিল প্রত্যাশিত দিকমুখ। প্রথমে ঘটনাকেন্দ্রিকনাম-করণের কথাই ধরা যাক। কাকে বলি ঘটনা ? চরিত্রের গতিকে নিয়তি-নির্ধারিত ক'রে চালিত করে যে-অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা তাকেই। কিন্তু সেই ধারাবাহিক গতি বৃত্তায়িত অথবা রেখায়িত যাই হোক্ না কেন তার একটা নিয়ামক বিন্দু আছে, তাকেই বলা যেতে পারে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা। ঘটনাকেন্দ্রিক উপন্যাসের নামকরণ সেই কেন্দ্রীয় ঘটনাকেই প্রধানত আশ্রয় করে। যেমন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের

উইল', রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি', শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল'। কৃষ্ণকান্তের উইল, নৌকাডুবি ও বৈকুণ্ঠের উইল উপন্যাসকে সম্ভাবিত পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে, আর অঙ্গুরীয় বিনিময়, উপন্যাসের পরিণতিতে নিয়তির মতো বর্তমান থেকে আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনাকে মোহনায় ডেকে এনেছে। বাংলা উপন্যাসে চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণের বাহুল্য আধুনিক উপন্যাসে চরিত্র-প্রাধান্যকেই সম্ভবত সমর্থন করে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অর্থাৎ যে চরিত্র উপন্যাসের ঘটনানিয়ামক বিধাতা ও ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য, লক্ষ্যভেদের পর উপন্যাসের শিরোদেশে তাকে টাঙিয়ে রাখাই চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তের অভাব নেই, যেমন 'কপালকুণ্ডলা', 'রাজসিংহ', 'স্বর্ণলতা', 'কাদম্বরী', 'গোরা', 'শ্রীকান্ত'। চরিত্রকেন্দ্রিক উপন্যাসের নামকরণের উদাহরণ স্বরূপ নায়ক-নায়িকার নামের সমানুপাত এখানে দেখানো হলেও, বাংলা উপন্যাসে নায়িকা-কেন্দ্রিক নামকরণই বেশি, এবং এটা বোধহয় বিশেষ ক'রে আবার মনে করিয়ে দেয় যে বাংলা উপন্যাসে শ্রেষ্ঠ চরিত্রচিত্রণের সম্মানে পুরুষচরিত্রকে নারীচরিত্র চিরকালই ছাড়িয়ে গেছে।

কিন্তু উপন্যাসের নামকরণের কি এটাই শেষ সীমা? ঘটনাকেন্দ্রিকতা আর চরিত্রকেন্দ্রিকতাই কি উপন্যাসের নামকরণের একমাত্র পারস্পরিক বিকল্প। উপন্যাসের সম্ভাবনা কি অনন্ত নয়? এবং যে-কোনো আধুনিক উপন্যাস কি ঘটনা ও চরিত্রকে স্বীকার ক'রেও অনেক পরিমাণে পরিবেশনির্ভর এবং বক্তব্য-নির্ভর নয়? উপন্যাসের গঠন-সুমিতিও বোধহয় উপন্যাসের সার্থক হয়ে ওঠার একটা প্রধান অঙ্গ। সুতরাং উপন্যাসের নামকরণও উপন্যাসের মতোই অনন্ত সম্ভাবনাময়।

ঘটনার প্রতিকূল স্রোতে চরিত্রগুলোকে মাছের ডিমের মতো ছেড়ে দিয়ে পরিশেষে তাদের ফুটিয়ে তুলে মাছের মতো চঞ্চল ও জীবন্ত ক'রে তোলাই ছিল ঊনবিংশ শতকের উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য। ঘটনার মধ্য দিয়ে চরিত্রবিকাশই প্রধান লক্ষ্য এবং চরিত্রের ফুটিয়ে-তোলা ব্যক্তিমূর্তিটাই প্রধান লক্ষ্যভেদ বলে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলোর নামকরণ অনেকক্ষেত্রেই চরিত্র-কেন্দ্রিক। কিন্তু একমাত্র 'গোরা' ছাড়া অন্য উপন্যাসের, বিশেষ ক'রে 'গোরা'র পরবর্তী উপন্যাসগুলির নাম যে রবীন্দ্রনাথ কখনও চরিত্র-কেন্দ্রিক তো নয়ই এমনকি চরিত্রের বিশেষণ-নির্ভরও রাখেননি, তার কারণ কি এই নয় যে বঙ্কিমের মতো রবীন্দ্রনাথের

উপন্যাসের চরিত্রগুলি কোনোরকম স্থাপত্য বা ভাস্কর্যশিল্প নয়, কারণ তাঁর চরিত্রগুলি প্রতিমুহূর্তেই নিজেকে অতিক্রম ক'রে একটা মহৎ ভাবনার জগতে চলে যেতে চায় ; তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নামকরণ প্রধানত থীম্ নির্ভর অর্থাৎ ভাবাত্মক বা সাঙ্কেতিক। আবার এই একই কারণেই মনে হয় না কি, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র চেয়ে 'বিষবৃক্ষ' অন্য যে-কোনো কারণেই পিছিয়ে পড়ে থাক্ না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসই নাম-করণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আধুনিক, 'চোখের বালি'র অগ্রদূত হিসেবে উনবিংশ শতকের থেকেও বিংশশতকীয়। 'বিষবৃক্ষ'ই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র থীম্-নির্ভর ভাবাত্মক নামকরণ—সম্ভবত উনবিংশ শতকের একমাত্র নিদর্শন। আবার এর সঙ্গে এটা মনে না হয়েও পারে না, 'বউঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'তে রবীন্দ্র-নাথ অনেক বিষয়ে বঙ্কিমকে অনুসরণ ক'রেও অনেক বিষয়ের মতো এই নাম-করণের ক্ষেত্রেও প্রথম থেকেই স্বাতন্ত্র্য দেখিয়ে এসেছেন। বিংশ শতকে রচনা ক'রেও রবীন্দ্রনাথ কেবল একবারই পিছিয়ে গেছেন উনবিংশ শতকে, কী উপন্যাসে এবং কী তার নামকরণে,—ঘটনাকেন্দ্রিক নাম যার সেই 'নৌকা-ডুবি'তে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথও 'চোখের বালি', 'ঘরে-বাইরে'র থীম্-নির্ভর নামকরণের মধ্যে শেষপর্যন্ত আবদ্ধ থাকতে চাইলেন না। তাই থীম্-নির্ভর নাম 'চোখের বালি', ঘটনাকেন্দ্রিক নাম 'নৌকাডুবি' এবং চরিত্রচিহ্নিত নাম 'গোরা'কে ছাড়িয়ে চলে এলেন আরও আধুনিক নামকরণে—উপন্যাসের গঠন-নির্ভর নামে, 'চতুরঙ্গ' এবং 'চার অধ্যায়ে'। জ্যেঠামশাই, শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস ছোটগল্প চারটির অঙ্গ জুড়ে সৃষ্টি হলো চারটি শিরোনাম-ভূষিত পরিচ্ছেদ নিয়ে 'চতুরঙ্গ'। আর রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব রীতিকেই সমর্থন ক'রে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাসের নামকরণও হলো 'চার অধ্যায়'—যার প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে চারটি ক্রমিক সংখ্যা স্পষ্টই নির্দেশ করা আছে।

তবুও বাকি রইল। যে উপন্যাসে ঘটনাও প্রধান নয়, কোনো একটা চরিত্রও প্রধান হয়ে ওঠে না, গঠন এবং থীম্ও নামকরণের পক্ষে উল্লেখযোগ্য নয়, অথচ সমস্ত উপন্যাসের আবেষ্টন-পরিবেশ নিজেই যেখানে একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে, সেই ধরনের উপন্যাসের নামকরণের জন্য পরবর্তী কালের ঔপন্যাসিকগণ পরিবেশাত্মক নাম আনলেন—যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের 'আরণ্যক', তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'।

এই মূলসূত্র পাঁচটি নির্ধারণ করার পরেও হয়তো আরও সম্ভাবনার ক্ষেত্র পড়ে থাকে, কারণ উপন্যাস যেহেতু নিজেই সমস্ত সাহিত্যিক সূত্রের বন্ধন ছাড়িয়ে অনন্ত সম্ভাবনাময়। কিন্তু এই নির্ধারিত সূত্রগুলিই কি সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ? বরং অনেক ক্ষেত্রেই নামকরণের এই সূত্রগুলির পারস্পরিক টানাপোড়েনেই উপন্যাসের নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের নাম-করণ কি গৃহদাহ ঘটনাচিহ্নিত হয়েও শেষপর্যন্ত একইসঙ্গে নষ্টনীড়ের ব্যঞ্জনায় ভাবাত্মক হয়ে ওঠে না?

সুতরাং উপন্যাসের মতোই উপন্যাসের নামকরণকে কোনো বিধিবদ্ধ রীতিতে আবদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ শেষপর্যন্ত নামকরণের সমস্ত সূত্রসন্ধান-প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ ক'রে বিধাতার মতো ঔপন্যাসিকও পরমকৌতুকে নিজের প্রতিভাকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী এবং নিয়তি-নিয়ম-রহিতা বলেই প্রমাণ করেন।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নায়ক-বিচার: সাহিত্য-মহীরুহের কথাসাহিত্য শাখাটি আজ বর্ণবহুল পুষ্পশোভায় সমৃদ্ধ, অথচ অর্বাচীন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কথাসাহিত্যের একটি প্রাচীন ধারা বর্তমান থাকলেও, আধুনিক ছোটগল্প-উপন্যাস বলতে যা বুঝি তা এক স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলংকারিকেরা কাব্যতত্ত্ব ও নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করলেও কথাসাহিত্য সে আলোচনার অঙ্গীভূত হয়নি। এদেশে ওদেশে নায়ক-বিচার নিয়ে আলোচনার অপ্রতুলতা নেই। কিন্তু কথাসাহিত্য সম্বন্ধে তা কোথায়? অধুনাতন কালেও কথাসাহিত্যের রূপাঙ্গিক, গঠন-বৈচিত্র্য বহু সমালোচকের সমালোচ্য বিষয় হলেও, নায়ক-বিচার সম্বন্ধে তাঁরা তেমন মনোযোগী নন। কাব্য, নাটক বা মহাকাব্যের তুলনায় কথাসাহিত্য জটিলতর শিল্পকর্ম বলেই নায়ক-বিচার হয়তো সেখানে উপেক্ষিত। রূপনির্মিতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও কাহিনী পরিকল্পনা, চরিত্র চিত্রণ, রসসৃষ্টির দিক থেকে নাটক ও কথাসাহিত্য অভিন্ন। তাই নাটকের নায়ক-বিচার পদ্ধতির প্রয়োগ কথা-সাহিত্যে অসংগত নয়।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নায়কের গুণাবলীর সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে। নায়ক হবে সদ্বংশজাত, আদর্শবান, মহৎ ব্যক্তি। গুণের প্রকারভেদে তারা আবার ধীরো-

দাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীর ললিত ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। নৈতিক উচ্চাদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে এই নায়ক-বিচার চেষ্টা। বস্তুত নায়ক-বিচারের এই মানদণ্ড সর্বথা গ্রহণীয় নাও হতে পারে। সংস্কৃত আলংকারিক বিশ্বনাথের নায়ক-বিচার প্রণালীটি অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ। তাঁর মতে কাব্যের অঙ্গীরসের আলম্বন বিভাবই নায়ক। গ্রীক্ মনীষী আরিস্টটল ট্রাজিডি-নাটকের নায়ক নির্ণয় করতে গিয়ে তার উন্নত পদমর্যাদার কথা যেমন বলেছেন, তেমনি তার অসাধারণত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। অসাধারণ হলেও তাকে ত্রুটিহীন দেবত্বের অলৌকিক মহিমায় উন্নীত করেননি। ভালো মন্দে মিশিয়ে তাকে মানবোচিত ত্রুটি, দুর্বলতার অধীন করেছেন। অবশ্য তাঁর আলোচনায় নায়কের প্রাধান্য সূচিত। নায়কের অনমনীয় পৌরুষ হয় প্রবলভাবে কর্মতৎপর, না হয় অবাঞ্ছিতভাবে নিদারুণ দুর্দশাগ্রস্ত। এই আলোচনাকে ভিত্তি করেই উত্তরকালে নাট্যকাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র, প্রধান চরিত্র, ক্রিয়াশীল বা নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিত্ববান চরিত্রকে নায়করূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

কথাসাহিত্যে যে-চরিত্রটি প্রধান, ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রে যার অধিষ্ঠান অর্থাৎ যাকে কেন্দ্র ক'রে ঘটনাধারা আবর্তিত, সাধারণত তাকেই নায়ক বলা হয়। ঘটনাপ্রবাহের গতিনিয়ন্ত্রণের শক্তি নায়কে সম্ভাবিত। কেবল ঘটনাপ্রবাহই নয়, কাহিনীর অন্তর্গত অপরাপর চরিত্র পরিচালনায় নায়কের ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। ছোটগল্প-উপন্যাস ঘটনামুখ্য, চরিত্রমুখ্য, দার্শনিক, নাট্যধর্মী—যা-ই হোক্ না কেন, যে চরিত্রটি কথাশিল্পীর সহানুভূতিধন্য, পাঠকমনে সর্বাধিক প্রভাব-বিস্তারী, নায়কের মর্যাদা তারই প্রাপ্য। জীবনসমুদ্র মন্থন-জাত বিষামৃতের যে পূর্ণ ফলভোগী, পাঠকচিত্তে কৌতূহল জাগাতে এবং পাঠকের প্রীতি-সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সে-ই সক্ষম। তাকে নির্দ্বিধায় নায়ক বলা চলে। কথাবস্তুর মূল ভাব বা রসের অবলম্বন যে-চরিত্রটি সে-ই তো নায়ক। কথাসাহিত্যে একক চরিত্রের প্রাধান্য সূচিত হলে নায়ক নির্ণয় সহজসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু যে-কথা-সাহিত্যে কথাশিল্পীর সহানুভূতি দুই বা ততোধিক চরিত্রে দ্বিধা বা বহুধাবিভক্ত হয়ে আপতিত, নায়ক নির্ণয়ের সমস্যা আসলে দেখা দেয় সেখানেই।

ছোটগল্পে এরকম সমস্যা উদ্ভবের অবকাশ কম। কারণ তাতে একক চরিত্রের প্রাধান্য। উপন্যাস একটি জটিল শিল্পকর্ম। গঠনকৌশলের দিক দিয়েও উপন্যাসের বিচিত্র রূপ। ঘটনামুখ্য উপন্যাসে বহু চরিত্রের মধ্যে একটি চরিত্র

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। কাজেই নায়ক-নির্ণয়ের সমস্যা এখানে তেমন নেই। কিন্তু চরিত্রমুখ্য উপন্যাসে বিচিত্র চরিত্রের শোভাযাত্রা। এ চরিত্রগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন. প্রত্যেকে স্ব-তন্ত্র। কোনো চরিত্রই উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম নয়। নির্দিষ্ট-লক্ষ্যহীন, শিথিলবদ্ধ মন্থরগতি কাহিনীর সঙ্গে অসম্পৃক্ত এই জাতীয় বহু চরিত্রের মধ্যে নায়ক বলা যাবে কাকে? কোনো কোনো সমালোচক এই ধরনের উপন্যাসকে নায়কহীন উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন। থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ার', বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' এই বিচারে নায়কহীন উপন্যাস। বস্তুত উপন্যাস নায়ক-বিহীন হতে পারে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। 'আরণ্যকে'র অরণ্য-প্রতিবেশকে কেউ কেউ নায়ক বলেছেন। বলা-বাহুল্য 'আরণ্যকে'র অরণ্য-প্রকৃতি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক, তদুপরি ঔপন্যাসিকের সহানুভূতি-সমর্থিত। তথাপি প্রাসঙ্গিকভাবে একটা জিজ্ঞাসা উন্মুখ হয়ে ওঠে: প্রতিবেশ বা ঘটনার চমৎকারিত্ব থাকলেও মানবচরিত্র ছাড়া এদের নায়ক হবার যোগ্যতা আছে কিনা। বস্তুত চরিত্রগুণ, ব্যক্তিত্ব, অন্তরের দ্বন্দ্বসংঘাত, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বলে ঘটনার পরিচালন ক্ষমতা আছে একমাত্র মানব চরিত্রেরই। সুতরাং একমাত্র মানবচরিত্রই নায়ক হবার যোগ্য। প্রকৃতি, নিয়তি, বা বিধাতাপুরুষ যতই শক্তিশালী হোক্—তা এক অজ্ঞেয় অন্ধ শক্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোমুগ্ধকর, রহস্যঘন হলেও তার মধ্যে কোথায় বিবর্তনলীলা, কোথায় চরিত্রগুণ, কোথায়ই বা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ? শক্তি ও পরমায়ুর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানবজীবনে হৃদয়-মনের যে বিচিত্র বর্ণচ্ছটার সমুদ্ভাস, প্রকৃতিতে তা কোথায়? মনে হয় 'আরণ্যক' কতকগুলি ছোটগল্পের সমষ্টি, যে-কথামালার কথক ছদ্মনামে বিভূতিভূষণ। 'আরণ্যক' অরণ্য-কথা নয়, আরণ্যক জীবন-গাথা। সমুদ্র পটভূমিকে বাদ দিলে হেমিংওয়ের 'দি ওল্ড ম্যান এ্যাণ্ড দি সী' গল্পের পরিকল্পনা অসম্ভব। তবু তার নায়ক সমুদ্র নয়, বৃদ্ধ জেলেটিই। নায়কবিচারের সমস্যা আরও আছে। কোনো কথাসাহিত্যে আবার দুটি (কখনো ততোধিক) চরিত্র বিভিন্ন দিক থেকে সমান প্রধান। এদের একটি চরিত্র হয়তো কেন্দ্রীয়, অপরটি অধিক ক্রিয়াশীল। এক্ষেত্রে কারো কারো মতে নায়কদ্বৈত স্বীকার্য; কেউবা একজনকেই ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে নায়করূপে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। বাংলা কথাসাহিত্যে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর', রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'। কর্মতৎপরতা, না উচ্চ

নৈতিক আদর্শ—কোন্‌টি নায়ক-বিচারের মানদণ্ড হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত আজও অলভ্য।

দেখা গেল, কথাসাহিত্যে নায়ক-বিচারের পথটি সমস্যাকণ্টকিত। তবু নায়ক-বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। ঘটনাসমূহের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে নায়ক রূপে গণ্য করলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম, কিন্তু ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে ঘটনাপ্রবাহের পরিচালন ক্ষমতার আদর্শে নায়ক-বিচার করতে গেলে ভুল হওয়া সম্ভব। কেননা, কোনো কোনো কাহিনীতে নায়কের পরিবর্তে প্রতিনায়ক অধিক ক্রিয়াশীল। যদি কেন্দ্রীয় চরিত্র ও প্রধান চরিত্র একই হয় এবং সে-ই ঘটনাপ্রবাহের পরিচালক হয় তবে তার নায়কত্ব অবিসংবাদিত। ছোটগল্প বা উপন্যাসের গঠনপ্রণালী প্রকাশভঙ্গি যেমনই হোক, দেখতে হবে, তার অন্তর্গত মূল ভাব বা রসের প্রকাশক পরিপোষক কোন্ চরিত্রটি। ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতায়, আদর্শের বলিষ্ঠতায়, সংকল্পের দৃঢ়তায়, লক্ষ্যাভিমুখী গতিচাঞ্চল্যে, প্রাণের দীপ্তিতে কথাসাহিত্যের অন্তর্গত কোন্ চরিত্রটি সমুজ্জ্বল ; যে-চরিত্রটি উক্ত গুণের অধিকারী প্রকৃতপ্রস্তাবে সে-ই কথাসাহিত্যের নায়ক। পরিশেষে একথাও বলতে হয়, যেহেতু উপন্যাস বর্ণনাত্মক সাহিত্য, ট্রাজেডি-নাটকের মতো তাতে সর্বত্র ক্রিয়া ও গতির তীব্রতা পরিলক্ষিত হয় না, সেহেতু উপন্যাসবিশেষে নায়কের অস্তিত্ব অপরিহার্য নাও হতে পারে।

অমূল্য সরকার

নিরীক্ষণ-বিন্দু (পয়েণ্ট অব্ ভিউ) : পাশ্চাত্য সমালোচকরা যাকে বলেছেন 'পয়েণ্ট অব্ ভিউ' বাংলায় তাকে বলা চলে 'নিরীক্ষণ-বিন্দু', কিংবা আরো সহজ অভিধায়—'দৃষ্টিকোণ'। নাটক এবং কথাসাহিত্য সাহিত্যের এই দুটি শাখাই একটি কাহিনীকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। কিন্তু নাটকের সঙ্গে গল্প-উপন্যাসের মৌল পার্থক্যের অন্যতম লক্ষণ হলো—নিরীক্ষণ-বিন্দু। নাটকে এর কোন ভূমিকা নেই অথচ কথাসাহিত্যে এই নিরীক্ষণ বিন্দু অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কথাসাহিত্যে এর যথার্থ পরিচয়টি পরিস্ফুট হয়েছে সমালোচকপ্রবর পার্সি লাবক্-এর উক্তিতে : "The whole intricate question of method, in the craft of fiction, I take to be governed by the question of the point of view—the question of the relation in which the narrator stands to the story" অর্থাৎ কাহিনীর

কথক যে বিশেষ অবস্থান বা কোণ থেকে গল্পটি বিন্যস্ত করেন—তাই হলো কথাসাহিত্যের নিরীক্ষণ-বিন্দু। এই সংজ্ঞা বা পরিচিতি থেকে বোঝা যায় কথা-সাহিত্যে যে কোনো ভাবেই হোক একজন কথককে অনুভব করা যায়। নাটকের আত্যন্তিক 'অবজেকটিভ' বা তন্নিষ্ঠ রূপের জগতে সেই কথকের কোন অবস্থান বা ভূমিকা উপলব্ধি করা যায় না।

উপন্যাসে বিবৃত কাহিনীর সঙ্গে তার কথকের সম্পর্কের বিষয়টি নিছক প্রকরণগত ব্যাপার নয়। এটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঔপন্যাসিকের জীবন-সংক্রান্ত মূল্যচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির গূঢ়তর প্রশ্নটিও। আর ওই গূঢ়তর প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে সংবেদনশীল পাঠককে জানতেই হয়, পাঠকের কাছে বিষয়-বিন্যাস করেন কে? একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সব-কাহিনীই বস্তুত লেখকের জানা। তিনি গল্পের আগাগোড়া খুঁটিনাটি সবই জানেন। কিন্তু সর্বদা, সব গল্পে-উপন্যাসে তিনি নিজে কাহিনী বিবৃত করেন না। কাহিনী-বিন্যাসে তিনি নানান পদ্ধতি অবলম্বন করেন। সেইসব পদ্ধতির অন্যতম ও সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হলো—'সর্বজ্ঞ' (omniscient) লেখকের বিন্যাস-পদ্ধতি। লেখক নিজেই গল্প-উপন্যাসের সব নরনারীর কাহিনী পরিবেশন করেন বস্তুনিষ্ঠ ভঙ্গিতে। একেই বলতে পারি, প্রথম পুরুষের (Third Person-এর) নিরীক্ষণ-বিন্দু। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী', 'ইন্দিরা' ব্যতীত অন্য সব উপন্যাসেই এই 'পয়েণ্ট অফ ভিউ' প্রযুক্ত। এখানে পাঠক অনুভব করেন যে, সর্বজ্ঞ লেখকের অজানা কিছুই নেই, তিনি তাঁর ইচ্ছামতো কাহিনীকে ক্রমশ উন্মোচিত করেন, তাদের মনের কথাও তিনি বিশ্লেষণ করতে পারেন প্রয়োজনবোধে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'যোগাযোগ', শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ' ইত্যাদি উপন্যাস শুধু নয়, দেশ-বিদেশের অধিকাংশ উপন্যাসেই মুখ্যত এই নিরীক্ষণ-বিন্দু ব্যবহৃত।

এই রীতির দু'একটি অসুবিধা আছে। কোনো কোনো উপন্যাসে দেখা যায় কাহিনী বিবৃত করতে করতে হঠাৎ গল্প থামিয়ে লেখক পাঠকপাঠিকার উদ্দেশে কিছু মন্তব্য বা ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। এর ফলে বলা বাহুল্য, কাহিনীর যে মায়াবী প্রাসাদ এতক্ষণ পাঠকচিত্তে গড়ে উঠছিল তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। এই ধরনের সর্বজ্ঞতাকে বলা হয় 'সম্পাদকসুলভ সর্বজ্ঞতা' (Editorial omni-science)। এছাড়া লেখকের অতি-সর্বজ্ঞতার ভঙ্গির ফলে ওই কাহিনী তথা চরিত্র সর্বদা পাঠকের কাছে তেমন বিশ্বাসযোগ্য না-ও মনে হতে পারে। কোনো

একজনমাত্র মানুষ, হতে পারেন তিনি লেখক,—তিনি সব জানেন, কাহিনী ও চরিত্রের খুঁটিনাটি সব, এটা পাঠক সবসময় মেনে নিতে চায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-পাঠকালে আধুনিক পাঠকের মনে জাগে আপত্তিবোধ।

এই অসুবিধার জন্য 'সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ'কে কিছুটা বাস্তবমুখী ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে লেখক ব্যবহার করেন 'সীমিত সর্বজ্ঞতার' নিরীক্ষণ-বিন্দু। এ ধরনের গল্প-উপন্যাসেও প্রথমপুরুষের দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়। তবে সেখানে বিশেষ একটি মুখ্যচরিত্রের চোখ দিয়ে যেন সব ঘটনা ও চরিত্রকে দেখানো হয়। লেখক নিজে সব কাহিনী ও চরিত্রের খুঁটিনাটি যেন জানেন না এমন ভঙ্গি করেন। কেবল ওই একটি বিশেষ চরিত্রের অভিজ্ঞতার ও উপলব্ধির পরিধিতে যেটুকু ধরা পড়ে, কেবল সেটুকুই ওইসব রচনায় পরিবেশিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় বহুলাংশে এ ধরনের নিরীক্ষণ-বিন্দু ব্যবহৃত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ ধরনের উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হেনরী জেমস্ রচিত *The Ambassadors*। পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের দিক থেকে এই রীতির সার্থকতা যথেষ্ট।

কোনো উপন্যাসে সর্বদা যে একটিমাত্র চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনা ও অন্য চরিত্রকে দেখানো হয়, এমন নাও হতে পারে। একই উপন্যাসে পরিচ্ছেদ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিকোণেরও বদল ঘটতে পারে। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে ভিন্ন পরিচ্ছেদে কখনও সতীশ, কখনও সাবিত্রী, কখনও বা অন্য চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই ধরনের রীতিকে বলা হয় 'পরিবর্তমান নিরীক্ষণ-বিন্দু' বা 'shifting point of piew'। এ ও কাহিনীকে বাস্তবধর্মী ও বিশ্বাস্য করে তোলার অন্যতম প্রয়াস। চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসে এই রীতির সমধিক ব্যবহার চোখে পড়ে। অবশ্য নিরীক্ষণ-বিন্দুর পরিবর্তন যথাযথ না হলে, উপন্যাসের গঠন শিথিল হয়ে যেতে পারে। 'চরিত্রহীনে'র গঠনে এই ত্রুটি লক্ষিত হয়।

কথাসাহিত্যের দৃষ্টিকোণে উত্তমপুরুষের প্রয়োগের রীতি বিভিন্ন। এ ধরনের রচনায় কথক আত্মকথনের ভঙ্গিতে কাহিনী ও অন্যান্য চরিত্র রূপায়িত করেন। এখানে সর্বজ্ঞ লেখক অনুপস্থিত। সমগ্র কাহিনী কেবল একজনের দৃষ্টির দর্পণে প্রতিফলিত তথা উদ্ঘাটিত। উপন্যাসে এরকম নিরীক্ষণ-বিন্দু-বাহিত-বিন্যাস প্রধানত তিন ধরনের হতে পারে—

(ক) আত্মস্মৃতিধর্মী

(খ) পত্রধর্মী

(গ) ডায়েরিধর্মী

আত্মস্মৃতিধর্মী উপন্যাসে সাধারণত দু'ধরনের চরিত্রের নিরীক্ষণ-বিন্দু প্রযুক্ত হয়। এক, নায়ক বা নায়িকার। দুই নায়ক-নায়িকা ব্যতীত অন্য কোনো চরিত্রের। ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' বা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' প্রথমোক্ত শ্রেণীর আত্মস্মৃতিধর্মী উপন্যাসের দৃষ্টান্ত। এ ধরনের উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণযুক্ত উপন্যাসের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য (অসুবিধাও বটে)— এখানে যিনি কথক, তাঁর চরিত্র সাধারণত তেমন পরিস্ফুট হয় না, বরং অন্যান্য চরিত্র তাঁর দৃষ্টির আলোয় অনেক বেশি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'ডেভিড কপারফিল্ড' উপন্যাসে ডেভিডের নিজের চরিত্রের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় চরিত্র মিঃ মিকবার ও তাঁর স্ত্রী, কিংবা ইউরায়া হিপ্ বা বেট্‌সি ট্রটউড্। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্রীকান্তের চেয়েও আমরা আকৃষ্ট হই রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি, ইন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রধান-অপ্রধান অনেক চরিত্রের প্রতি। তারা যেন আরও বেশি জীবন্ত।

বাংলা উপন্যাসে নায়ক-নায়িকা ব্যতীত অন্য কোন চরিত্রের নিরীক্ষণ-বিন্দুর প্রয়োগ চোখে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। এখানে প্রায় সমগ্র উপন্যাসটি ('জ্যাঠামশায়' অধ্যায়ের অংশবিশেষ ব্যতীত) নায়ক শচীশের বন্ধু শ্রীবিলাসের উত্তমপুরুষের জবানীতে বিবৃত। এখানেও দেখি কথক শ্রীবিলাস নিজেকে অনেকখানি আড়ালে রেখে শচীশ ও দামিনীকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। বস্তুত এই উদ্দেশ্যেই লেখক এই উপন্যাসের নায়কের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার না করে, তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর উত্তমপুরুষ-বাহিত কথনরীতি প্রয়োগ করেছেন। কারণ চতুরঙ্গ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনার মূল আশ্রয় শচীশ ও দামিনী,— শ্রীবিলাস নয়।

পত্রধর্মী উপন্যাস বা **পত্রোপন্যাস** (Epistolary Novel) দৃষ্টিকোণের বিচারে অভিনব। সমগ্র উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে। আসলে সমগ্র রচনাটিই একধরনের সংলাপ-উপন্যাস। প্রত্যেকেই অন্যের সঙ্গে দূর থেকে কথা বলছে যেন। এর ফলে আংশিক নাট্য-লক্ষণও ফুটে ওঠে এখানে। শুধু তাই নয়, এই রীতির উপন্যাসে যে-চরিত্র

যখন চিঠি লিখছে, তখন সেই পত্রে বর্ণিত ঘটনাগুলি বিশেষভাবে সজীব মনে হয়, এবং সেইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত পত্রলেখক বা লেখিকার অনুভূতিগুলি তাৎক্ষণিকতার উষ্ণতায় জীবন্ত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। তবে এর সম্ভাব্য ত্রুটির কথাও বলা দরকার। উপন্যাসের প্রতিটি পত্রকারই তাদের জীবনের যে কোনো ঘটনা উপলক্ষে সর্বদাই চিঠি লিখতে বসছে এবং সেই সমস্ত চিঠিই তারা এমন ভাবে সংরক্ষণ করছে—যার ফলে একটি সুগ্রথিত কাহিনী শেষপর্যন্ত রচিত হচ্ছে—এতটা বোধ হয় স্বাভাবিক বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া উপন্যাসের পত্রগুলিতে পত্রলেখক-লেখিকা যখন অন্য কোন ব্যক্তির সুদীর্ঘ সংলাপ স্মৃতি থেকে পুনরুদ্ধার করে লেখেন তখন সেই স্মৃতিশক্তি অতিমানবিক বলে মনে হয় যেন। এইসব কারণে পত্রোপন্যাসে ব্যবহৃত উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ কিছুটা কৃত্রিম।

ইংরেজি উপন্যাসের সূচনাপর্বে রিচার্ডসন আবির্ভূত হয়েছিলেন পত্রোপন্যাস নিয়ে। অষ্টাদশ শতকে প্রকাশিত তাঁর 'পামেলা', 'ক্ল্যারিসা হার্লো' প্রভৃতি পত্রোপন্যাস হিসাবে আজও স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'স্ত্রীর পত্র' গল্পসাহিত্যে পত্রলেখিকার নিরীক্ষণ-বিন্দুর প্রয়োগের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখ্য। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্র স্বতন্ত্র কোনো পত্রোপন্যাস না লিখলেও তাঁদের বিভিন্ন উপন্যাসে পত্রের যথেষ্ট ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঘটনা ও চরিত্র পরিস্ফুটনের বহুল প্রয়াস চোখে পড়ে। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চোখের বালি', 'শ্রীকান্ত' এর দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র শেষ পত্র-কবিতাটি পত্রলেখিকার দৃষ্টিকোণ প্রয়োগের দিক থেকে অনন্য।

আধুনিক কালে পত্রোপন্যাসের মাধ্যমে নতুন দৃষ্টিকোণ প্রয়োগের প্রচেষ্টার দিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' এবং সন্তোষকুমার ঘোষের 'শ্রীচরণেষু—মা-কে' বহুলাংশে সার্থকতার দাবি রাখে।

উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডায়েরিধর্মী উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। ডায়েরিধর্মী উপন্যাসে পত্রোপন্যাসের মতো কোনো প্রত্যাশিত পাঠক-পাঠিকা থাকে না, যে পত্রের মতো ডায়েরি পড়বে। ডায়েরি-লেখক সম্পূর্ণ আত্মগতভাবেই ডায়েরি লেখেন। স্বীয় জীবনের ঘটনা ও অন্য চরিত্রসমূহ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং সেইসঙ্গে আত্মসমীক্ষা,—এরই রূপায়ণ থাকে এ ধরনের উপন্যাসে। প্রশ্ন হতে পারে, এরকম উপন্যাস লেখার প্রয়োজন কী?—এর

উত্তরে বলা চলে, একজন ব্যক্তির আপন সত্তার যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটনের সুযোগ এখানেই সবচেয়ে বেশি। ব্যক্তিমানুষ যখন একা, আত্মমগ্ন, তার কথা সেখানে আর কেউ শুনবে না, জানবে না—সেইসব মুহূর্তে মানুষের যে আত্মদর্শন, যে স্বীকারোক্তি—তার মধ্য দিয়েই সবচেয়ে শুদ্ধরূপে ফুটে উঠতে পারে তার সত্তার পরিচয় এবং সেইসঙ্গে তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা ও নরনারী সম্পর্কে তার মনোভাব-প্রতিক্রিয়া। আধুনিক ঔপন্যাসিক যে 'সার্চ ফর আইডেনটিটি' বা 'সত্তার পরিচয় অন্বেষণ'-এর প্রয়াসী—এই ডায়েরিধর্মী উপন্যাসে প্রযুক্ত 'দৃষ্টিকোণ' সেক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

ফরাসি ঔপন্যাসিক আঁদ্রে জিদ্-এর *Strait is the Gate* উপন্যাসটি পুরো-পুরি ডায়েরি-উপন্যাস নয়। এটি নায়ক জেরোমের আত্মস্মৃতিমূলক কাহিনী। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় উপন্যাসটির শেষ অধ্যায়টি সম্পূর্ণভাবে নায়িকা অ্যালিসার 'জার্নাল' বিশেষ। এই জার্নাল বা ডায়েরির অংশেই নায়কের কাছে নায়িকার গূঢ় মানসিক যন্ত্রণা ও উত্তরণের চিত্রটি অপরূপ শিল্পমহিমায় উদ্ঘাটিত হয়েছে। অলড্যাস হাক্সলির *Point Counter Point* উপন্যাসের দু'টি অধ্যায়ে (একুশ ও ছাব্বিশ) ফিলিপ কোয়ার্ল-এর 'নোটবুক' বা ডায়েরির অর্থবহ প্রয়োগ এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

উপন্যাসে কেবল একজনের ডায়েরি নয়, একাধিক ব্যক্তির ডায়েরির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণের অসামান্য সার্থক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। 'রজনী' উপন্যাসে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মুখ্যত বহিরঙ্গ ঘটনারই পরিচয় দিতে পেরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু 'ঘরে বাইরে'তে যেমন একই ঘটনা একাধিক ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল বিবৃত নয়, বিশ্লেষিতও হয়েছে, তেমনি আবার কোনো চরিত্র একইসঙ্গে অন্যের চরিত্র ও আপন সত্তার গূঢ় সমস্যারও সমীক্ষায় প্রয়াসী হয়েছে। এর দ্বারা বলা বাহুল্য উপন্যাসটিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মনোজীবনের ছবি এক অভিনব প্রযুক্তির দর্পণে শিল্পিত সার্থক রূপ পেয়েছে।

আধুনিক জীবনের জটিলতা যত বাড়ছে, গল্পকার ও ঔপন্যাসিকের রচনা ততই তার যথাযথ রূপায়ণের জন্য দৃষ্টিকোণের প্রয়োগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈচিত্র্যও দেখা দিচ্ছে। এর একটি বিশিষ্ট উদাহরণ দিই। উইলিয়ম ফকনারের

As I lay dying উপন্যাসে মুখ্যত একটিমাত্র 'সিচুয়েশন' সম্পর্কে উনিশটি চরিত্রের মানস-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে উনষাটটি অংশে বিভক্ত আত্মকথন পদ্ধতির মাধ্যমে।

কথাসাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে 'নিরীক্ষণ-বিন্দু'-প্রয়োগের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন পার্সি লাবক্, একথা আগেই বলেছি। কিন্তু এই বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য দক্ষতা স্বীকার করেও ফর্স্টার বলেছেন যে, উপন্যাসে 'পয়েন্ট অব্ ভিউ'-এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ 'Bouncing' যার সাহায্যে লেখক পাঠককে বাধ্য করেন (বলা নিষ্প্রয়োজন, শিল্পসম্মত উপায়ে) তাঁর জীবন বিষয়ক বক্তব্য সঠিক অনুধাবন করতে। ফর্স্টার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, ডিকেন্সের *Bleak House* উপন্যাসের। উপন্যাসটিতে নিরীক্ষণ-বিন্দুর কোনো নির্দিষ্টতা নেই, তা অত্যন্ত এলোমেলো, বিস্রস্ত। তবু ডিকেন্স আশ্চর্য শিল্পদক্ষতায় ওই উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের পরিপূর্ণ রসরূপটি সার্থকভাবে পৌঁছে দেন পাঠকচিত্তে। ফর্স্টারের বক্তব্যের গুরুত্ব স্বীকার করেও একথা সবশেষে বলতেই হয় যে, উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের সুষ্ঠু বিন্যাসের ক্ষেত্রে লাবক্-কথিত পয়েন্ট অব্ ভিউ-এর ভূমিকা সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

নেপথ্যবিধান এবং স্মৃতিচারণা : কাহিনী-গ্রন্থন উপন্যাসের একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এই ব্যাপারে ঔপন্যাসিকের সব্যসাচীর ভূমিকা—একদিকে ঘটনার গ্রন্থনে তাঁর সুচতুর সারথ্য, অপরদিকে কলানিপুণ শিল্পীর রূপদক্ষতা—এই দুইয়ের মণিকাঞ্চন যোগে উপন্যাসে কাহিনীর বয়নকার্য সম্পন্ন হয়। কাহিনী বিবৃতিধর্মী হলে ঔপন্যাসিকের কাজ সহজসাধ্য, কিন্তু চতুর পাঠক এবং রীতিসচেতন লেখক উভয়েই জানেন তথ্যধর্মী সরল বিবৃতি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এপিকধর্মী বৃহৎ উপন্যাস, ক্ষিপ্রগতির কাহিনী কিংবা পাঠকভোলানো সরল আটপৌরে গল্পে একটানা বিবৃতি স্বাভাবিক। কিন্তু কাহিনী যখন বিসর্পিল গতিতে জটিলতার অরণ্যে কিংবা সমুদ্রোপম গভীরতায় পথ হারাতে বসে, কিংবা স্থান-কাল-পাত্রের নতুন ভূগোল আবিষ্কার করতে চায়, সেখানে ঔপন্যাসিককে ভিন্নতর রীতির কথা চিন্তা করতে হয়। যে ক্ষেত্রে ঘটনা পংক্তিবদ্ধ সেনানীর মতো বর্তমানের প্রত্যক্ষ ভূমিতে চকখড়ির সীমানা

আঁকা পথ ধরে হাঁটে না, ঘটনা সে ক্ষেত্রে অন্তঃচারী। লেখক বিভিন্ন উপায়ে কাহিনীর নেপথ্যলোকে আলোকপাত করেন।

অন্তরালবর্তী ঘটনার গ্রন্থনে কাহিনীর নেপথ্যবিধানের (flash back) প্রয়োজন তাই অপরিহার্য। বিশেষ করে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে কিংবা আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাসে নেপথ্যলোকের বিবৃতি ব্যক্তিমনের রহস্যকে তুলে ধরে। চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসে ঘটনার একমাত্র অস্তিত্ব নায়কের চেতনলোকে। দ্রুত অপস্রিয়মাণ ঘটনাগুলি যেন চলন্ত ট্রেনের জানালা থেকে দেখে নেওয়া স্থাণু দৃশ্যাবলী। নায়কের দ্রুতগামী চেতনার কক্ষ থেকে আলো ফেলে বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে জীবনের একটি সামগ্রিক রূপ দেবার চেষ্টা করেন লেখক।

কাহিনীর সঙ্গে নেপথ্যবর্তী ঘটনার সংযোগ গড়ে তোলার সার্থক মাধ্যম স্মৃতিচারণা। আত্মজীবনীমূলক এবং চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসে স্মৃতির মধ্য দিয়ে বিস্তৃত পটভূমিকা গড়ে ওঠে, সেখানে স্থান ও কালের সংকীর্ণতা অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। স্মৃতিচারণার বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতের সার্থকতা বোঝা যায় ফরাসি ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্ত-এর লেখা *Remembrance of Things Past* বইয়ের প্রথম পর্ব *The Swan's Way*-তে। এই খণ্ডে বক্তা মার্সেল বর্ণনা করেছে তার বাল্য ও কৈশোরের যৌবনস্মৃতি। বলাবাহুল্য এই স্মৃতি প্রুস্ত-এর জীবনকথা। এখানে অতীত শুধুমাত্র ধারাবাহিক বিবৃতি নয়, স্মৃতি এখানে কাল-পরিধি। সেই পটভূমিকায় দৃশ্যগোচর হয়েছে এক হারানো জগৎ। সময়ের এই পরিধির মধ্যে বিধৃত জীবনের এক পূর্ণ রূপ। প্রুস্ত নিজেই বলেছেন—'Memory, by introducing the past into the present without modification, as though it were the present, eliminates precisely that great Time-dimension in accordance with which life is realised.'

গোপাল হালদারের 'একদা'-য় প্রতি মুহূর্তের চিন্তার মধ্য দিয়ে বর্তমান ও অতীত পাশাপাশি এসে হাত মিলিয়েছে। এখানে উপন্যাসের ভঙ্গিতে নাটকের দ্রুতগতি সঞ্চারিত। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে স্মৃতিচারণা এক বিশেষ ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। অভিজ্ঞতার দুর্লভ মণিমাণিক্য, ব্যক্তিগত অনুভূতির তপ্ত স্পর্শ, অপসৃত দিনগুলির জন্য সকরুণ দীর্ঘশ্বাস সব মিলিয়ে আবেগে-উত্তাপে, রঙে-রসে আনন্দ ও বিষণ্ণতায় মেশা সে এক বিচিত্র মায়ালোক। সেই জগতের

সৌরভ পাওয়া যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এর পাতায়, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বে। নতুনতর নেপথ্যবিধান দেখা যায় ইংরেজ লেখক সমারসেট্ মমের গল্পে ও উপন্যাসে। তাঁর অনুসরণে বাংলা সাহিত্যে বিমল মিত্রের লেখায় এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। এঁরা কথকতার রীতিতে গল্প বলার কৌশলে কথার প্রসঙ্গে অতীতের সূত্র টেনে এনেছেন। স্মৃতি এখানে সূত্রধার—গ্রন্থনা তার কাজ। সন্তোষকুমার ঘোষের 'মুখের রেখা'য় স্মৃতি এক বৃহৎ কাল-পরিধি। একটি দিনের আত্মচিন্তার মধ্য দিয়ে জীবন পরিক্রমা শেষ হয়েছে। স্মৃতিচারণার সার্থক প্রয়োগরীতি সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কার।

অনীতা গুপ্ত

ন্যাচারালিজম্—দ্র, প্রকৃতিবাদ।

পটভূমি : উপন্যাসের পটভূমি বলতে ঘটনা ও চরিত্রের নেপথ্যে স্থান, কাল, প্রবহমান সমাজ-জীবন, প্রাকৃতিক-পরিবেশ ইত্যাদির সংস্থান বোঝায়। এক কথায় উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের নেপথ্যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক—সাধারণত এই দু'রকমের পটভূমি ব্যবহৃত হয়। মহাকাব্যোপম উপন্যাসের পটভূমি সুবিস্তৃত—দেশ-কাল-পাত্রের সুবৃহৎ ভূখণ্ডের পটভূমিতে এ জাতীয় উপন্যাস রচিত হয়। তুলনামূলকভাবে অধিকাংশ আধুনিক উপন্যাসের পটভূমি সংকীর্ণ। স্থান, কাল, সমাজ-জীবন ও প্রাকৃতিক-পরিবেশের সুবিস্তীর্ণ অধ্যায় নয়—এগুলির একটি বা দুটি দিক নিয়ে আধুনিক উপন্যাসের পটভূমি রচিত হয়। দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের পটভূমি নিয়ে রচিত উপন্যাস, শ্রমিক-সমাজ নিয়ে রচিত উপন্যাস, কৃষিজীবী-সমাজ নিয়ে রচিত উপন্যাস, সমাজজীবনের বিশেষ একটি অংশ—যথা মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে রচিত উপন্যাস, নাগরিক জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস বা পল্লীজীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস—ইত্যাদি নানা শ্রেণীর উপন্যাসে পটভূমির এক একটি দিক প্রাধান্য পায়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে পটভূমি সাধারণত দু ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—প্রথমত, একটি বিশেষ পরিবেশের মধ্যে পাত্রপাত্রীর জীবনযাত্রাকে সীমাবদ্ধ রাখা; দ্বিতীয়ত, একটি প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে বৈপরীত্যসূত্রে পাত্রপাত্রীর জীবনযাত্রাকে উপস্থাপিত করা। যেভাবেই হোক না কেন পটভূমি রচনার শিল্পগত উৎকর্ষ নির্ভর করে বিশেষ পরিবেশে মানুষের

স্বভাব, জীবনযাত্রা; পদ্ধতি, চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণের নিঁখুত ও যথার্থ বর্ণনার উপর।

পটভূমি রচনায় বর্ণনার শিল্পমূল্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সাহিত্যে 'চিত্রধর্মিতা' বা 'সংগীতধর্মিতা'র বিরুদ্ধে প্রতিকূল সমালোচনার সূত্রপাত হয়েছে। রবার্ট লিডেল্ উপন্যাসে পটভূমি রচনায় বর্ণনা-প্রীতির প্রতি সমালোচকদের পক্ষপাতিত্বের মূলে কয়েকটি ভ্রান্তি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে সমালোচক ও ঔপন্যাসিকদের অত্যধিক পরিমাণে পটভূমি বর্ণনা-প্রীতির মূলে রয়েছে উপন্যাসকে একান্তভাবে একটি শিল্প হিসাবে না দেখার প্রবণতা। দ্বিতীয়ত, মানবজীবনের বৈচিত্র্যের রূপকার হিসাবে উপন্যাসকে না দেখা। উপন্যাসের মধ্যে জীবনজিজ্ঞাসাকে প্রতিফলিত দেখতে না চাওয়ার ফলে প্রকৃতিতান্ত্রিকতার প্রতি সমালোচক ও লেখকদের অত্যধিক প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তৃতীয়ত, প্রকৃতির বর্ণনার দিকে সমালোচকদের পক্ষপাতিত্বের আরও একটি কারণ উপন্যাসের 'বিষয়বস্তু' এবং 'স্টাইলে'র মধ্যে এক সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা। এই দৃষ্টিতে 'স্টাইল'কে 'বিষয়বস্তু' থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা কাহিনী ও চরিত্র-নিরপেক্ষ কোন প্রকৃতিবর্ণনাকে লেখকের স্টাইল হিসাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।

রবার্ট লিডেলের মতে উপন্যাস মানবজীবনের রূপকৃতি মাত্র, আর উপন্যাসের পটভূমি রচনায় নিসর্গচিত্র একটি আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র। ভ্রমণকাহিনীতে পরিস্থিতি বিপরীত, সেখানে নিসর্গচিত্র মুখ্যস্থান অধিকার করে থাকে। এবং এ জাতীয় পটভূমি-প্রধান কাহিনীতে কাল্পনিক চরিত্র নিশ্চয়ই প্রাধান্য পেতে পারে—কিন্তু তা একান্তভাবে পটভূমি-নিয়ন্ত্রিত-উপন্যাসের চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ-চিন্তা-ভাবনা-সমস্যার মতো নয়। তবে এ জাতীয় কাল্পনিক চরিত্র সম্বলিত নিসর্গচিত্র-মূলক কাহিনীর বিচারের মানদণ্ডও স্বতন্ত্র—উপন্যাস বিচারের মানদণ্ডের সঙ্গে তা একাসনে বসতে পারে না।

যথার্থ উপন্যাসে, যেখানে ঘটনার স্রোতে ভাসমান চরিত্রই প্রধান, সেখানে পটভূমির মূল্য, রবার্ট লিডেলের মতে, অস্তিবাচক নয়, বরং নেতিবাচক। অর্থাৎ কাহিনী এবং চরিত্রের মধ্যে যতটুকুমাত্র প্রয়োজন, কেবল ততটুকু পটভূমিই উপন্যাসের পক্ষে সংগত। এই পটভূমিটুকুর প্রয়োজনও সীমাবদ্ধ—অর্থাৎ চরিত্র ও ঘটনার অবস্থানকে একটা স্থৈর্যে বিন্যস্ত রাখা মাত্র, যার ফলে আমাদের

মনোযোগ চরিত্র ও ঘটনার উপর কেন্দ্রীভূত হতে পারে। এবং যখনই আমরা চরিত্র ও ঘটনার উপর মনোনিবেশ করতে পারি, তখনই আমাদের দৃষ্টি থেকে পটভূমি অন্তর্হিত হয়ে যায়। চরিত্র এবং ঘটনাকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেই নিজে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে পটভূমির সার্থকতা। এবং যদি পটভূমি-বর্ণনা চরিত্র ও ঘটনাকে আচ্ছন্ন করে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় তবে পাঠক হিসাবে আমরা বরং বিরক্তিই বোধ করি—তা সে প্রকৃতিবর্ণনার নিজস্ব মূল্য যত চিত্রধর্মী বা কাব্যধর্মীই হোক না কেন।

এই দৃষ্টিকোণে উপন্যাসে পটভূমির ব্যবহার প্রধানত দুরকমের হতে পারে। তন্ময় ও মন্ময়দৃষ্টিতে উপস্থাপিত পটভূমি। তন্ময়দৃষ্টিতে উপস্থাপিত পটভূমির একমাত্র সার্থকতা ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা। সেখানে পটভূমিবর্ণনার ও উপস্থাপনার মধ্যে সংযম অবশ্যপালনীয় শর্ত। কারণ যেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার দিকে প্রবণতা থাকে সেখানে পটভূমি অনেকসময় ঘটনাকে অতিক্রম করে যায়—জীবনজিজ্ঞাসু পাঠকের দিক থেকে তা ক্লান্তিদায়ক, অতএব উপন্যাসের দিক দিয়ে তা অবান্তর। দ্বিতীয়ত, মন্ময়দৃষ্টিতে উপস্থাপিত পটভূমির সার্থকতা কেবল ততটুকুই যতটুকু তা চরিত্রের মনোভঙ্গির সঙ্গে অন্বিত। লেখকের মন্ময় দৃষ্টিতে উপস্থাপিত পটভূমির ভূমিকা কোনো উপন্যাসে অবান্তর। অবশ্য লেখকের মন্ময়দৃষ্টিতে উপস্থাপিত পটভূমির সার্থকতা কেবল সেখানেই যেখানে লেখক কাহিনীর মধ্যে মহাকাল বা নিয়তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কোনো সাংকেতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেন।

উপস্থাপনা পদ্ধতির দিক দিয়ে উপন্যাসে পটভূমি নানাভাবে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। প্রথমত, ইতিহাসগত পটভূমি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের পটভূমি মূলত ইতিহাসগত। ঐতিহাসিক উপন্যাসে একদিকে থাকে প্লট ও চরিত্রের নাটকীয় বিন্যাস, অন্যদিকে থাকে একটি বিশেষ দেশকালের সামাজিক রাজনৈতিক প্রাকৃতিক পটভূমি। সাধারণত ত্রিবিধ উপায়ে পটভূমিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসে ব্যবহার করা হয়। এক, ঐতিহাসিক উপন্যাসে পটভূমির তথ্যসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা থাকার ফলে, অনেকসময় লেখক তাঁর মূল কাহিনী ও চরিত্রের পরিণতি দান করেন চিরন্তন মানবিক সমস্যার আলোকে। জীবন-রসই লেখকের অন্বিষ্ট, ইতিহাসের পটভূমি সেখানে দৃশ্যপটমাত্র। দুই, অনেকসময় দেখা যায় ইতিহাসের পটভূমিটুকুই প্রাধান্য লাভ করে বেশি ; ঘটনা ও চরিত্রের উপস্থাপনা কেবলমাত্র

ঐ পটভূমিকেই আলোকিত করার উদ্দেশ্যে। এখানে ইতিহাসের ভূমিকা কেবল-মাত্র নেপথ্যচারিতা নয়, চিরকালীন কোনো জীবনরসও লেখকের অন্বিষ্ট নয়—বলা যায় ইতিহাস-রস সৃষ্টিই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। ইতিহাসের পটভূমি এখানে দৃশ্যবস্তুর ভূমিকা গ্রহণ করে। তিন, উপর্যুক্ত দুই পদ্ধতির সমন্বয়ে, অর্থাৎ ইতিহাসের পটভূমিকে শুধুমাত্র দৃশ্যপট হিসাবে না রেখে, বা শুধুমাত্র দৃশ্যবস্তু হিসাবে না রেখে—এতদুভয়ের সম্মিলনে যুগপৎ যুগরস ও জীবনরস পরিস্ফুট করে তোলা হয়। ইতিহাসের সীমাবদ্ধ স্থান-কাল-পাত্রের কোনো বিষয়বস্তু চিরন্তন জীবনসত্যের বাণীরূপ লাভ করে। অতীতদিনের জীবনযাত্রার একটি কাহিনীকে প্রত্যক্ষ করে তোলাতেই শুধু নয়—জীবনের প্রাণস্পন্দন তথা ব্যক্তির সংঘাতময় বিকাশকে মুখ্য করে তোলাতেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান পরিচয়। শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে এই দ্বৈতভূমিকা বিদ্যমান।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে পটভূমির বিন্যাস যেরকমেরই হোক না কেন, মূল উদ্দেশ্য কোনো বিগতদিনের জীবনযাত্রার অন্ধকার গহ্বরে আলোকপাত করা—সেজন্য প্রয়োজন সত্যসন্ধী তথ্যানুগত পটভূমির নিখুঁত বর্ণনা। আর প্রয়োজন লেখকের এক বিশেষ সৃজনশীল কল্পনা, যাকে বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক কল্পনা, যার সাহায্যে ইতিহাসের একটি মৃত অধ্যায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, তথ্যের ভারমুক্ত-জীবনের সত্য পাঠকের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাফল্য নির্ভর করে ইতিহাসগত পটভূমির যাথার্থ্যের উপর, এবং সেই সঙ্গে জীবনসত্য আবিষ্কারের উপর। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসগত পটভূমির একটি ভ্রান্তির উল্লেখ করা প্রয়োজন—যাকে বলে **কালানৌচিত্য দোষ**। ঔপন্যাসিক যদি তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের পটভূমির উপর তাঁর স্ব-কালের বা ভিন্ন কালের ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা আরোপ করেন তবে সেখানে কালানৌচিত্য দোষ ঘটবে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে এ জাতীয় পটভূমি-গত ভ্রান্তি যথার্থ ইতিহাস-রস সৃষ্টির পক্ষে বাধাস্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, উপযোগমূলক পটভূমি। ঘটনা ও চরিত্রের রূপনির্মিতির প্রয়োজনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপন্যাসে সামাজিক বা প্রাকৃতিক পটভূমি আমন্ত্রিত হয়। ঘটনার স্রোতে ভাসমান চরিত্রই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, পটভূমির ভূমিকা সেখানে গৌণ। তাই যথার্থ ভালো পটভূমি হবে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সংক্ষিপ্ত আবেগবর্জিত পটভূমি—চরিত্র ও ঘটনার দিকে পাঠকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেই

নিজে অন্তর্হিত হবে। চরিত্র ও ঘটনাকে পরিস্ফুট করার দিক দিয়ে অর্থাৎ নিতান্তই উপযোগিতার দিক দিয়ে পটভূমি-উপস্থাপনার যতটুকু সার্থকতা। উপন্যাসে পটভূমি যদি তদতিরিক্ত কোনো ভূমিকা গ্রহণ করে, এককথায় পটভূমি যদি উপযোগবাদের অন্তরায় হয়ে ওঠে তবে সে জাতীয় পটভূমির কোনো শিল্পমূল্য নেই। নিছক চিত্রধর্মী পটভূমি, যেখানে বর্ণনাই মুখ্য স্থান অধিকার করে থাকে বা ফোটোগ্রাফিক পটভূমি, যেখানে পটভূমির পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপচিত্র নির্মাণই লেখকের অন্বিষ্ট—সে জাতীয় পটভূমি, উপন্যাসের জীবনজিজ্ঞাসামূলক আবেদনের পরিপন্থী। উপযোগমূলক পটভূমি কখনও ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে সমান্তরালভাবে, কখনও বা বৈপরীত্যসূত্রে উপস্থাপিত করা হয়।

তৃতীয়ত, সাংকেতিক পটভূমি। নিসর্গচিত্রের সংস্থাপন অনেকসময় মানবমনের প্রেক্ষিতে সংকেতধর্মী করে উপস্থাপিত করা হয়। অবশ্য সেখানে নিসর্গের রূপ-বৈচিত্র্য বড় কথা নয়, বড় কথা মানবমন। বর্ষার বর্ষণধারা মানবমনের অজস্র কান্নারই প্রতিফলন সেখানে, শীতের শিহরণ মানবমনের আশঙ্কার দ্যোতক হয়ে ওঠে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে পটভূমি-বর্ণনার অতিরেক হলে মূল মানবকাহিনী যে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয় তা অস্বীকার করা যায় না। তাই সাংকেতিক পটভূমির উপস্থাপনা যত সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞ্জনাধর্মী হয় ততই ভালো।

চতুর্থত, পটভূমি-সর্বস্বতা। পটভূমি-সর্বস্ব উপন্যাস আদৌ উপন্যাস কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। এ জাতীয় উপন্যাসে পটভূমিই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ; চরিত্র থাকে, ঘটনাও থাকে—কিন্তু চরিত্রগুলি পটভূমিলালিত, ঘটনা-গুলি পটভূমি-নিয়ন্ত্রিত। ঘটনা বা চরিত্রের নিজস্ব কোনো ভূমিকা থাকে না, জীবন-জিজ্ঞাসাকে এড়িয়ে, জীবনের দ্বন্দ্ব যন্ত্রণা সমস্যাকে এড়িয়ে জীবনবিবিক্ত বিষয়বস্তু এখানে প্রাধান্য পায়। তাই উপন্যাসের যোগ্যতা অর্জনের অধিকার এই জাতীয় পটভূমি-সর্বস্ব কাহিনীতে নগণ্যমাত্র। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' এই জাতীয় পটভূমি-সর্বস্ব উপন্যাস। 'আরণ্যকে'র বিষয়বস্তু একটি শিশুসুলভ স্বপ্নের জগৎ, কৌতূহলের জগৎ, রূপকথার জগৎ। ছায়াহীন জ্যোৎস্না রাত্রি এবং ছায়াহীন নির্জন দুপুরের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে অরণ্যজগৎ একটা রহস্যময় জগৎরূপে উদ্ভাসিত। এবং আরণ্যকের আদিম পরিবেশের মধ্যে অতি-প্রাকৃতের ব্যবহারও সেই রহস্যঘেরা জগতেরই পরিপূরক। কিন্তু উপন্যাসের অন্বিষ্ট যে জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবনের অন্তহীন সমস্যা তা 'আরণ্যকে' পরিহার করা হয়েছে

সযত্নে। লেখক তাই জমি বিলির ফলে আরণ্যক জীবনের পটে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেবার সম্ভাবনা ছিল তাকে পরিহার করেছেন, জীবনের ও জীবিকার মৃত্তিকাবদ্ধ মানুষের স্বরূপ এখানে অনুপস্থিত। চরিত্রগুলির অধিকাংশই জীবিকা সংলগ্ন মানুষ নয়—রাজু পাঁড়ে ভক্ত কবি এবং দার্শনিক, যুগলপ্রসাদ জঙ্গলে গাছ লাগায়, বেঙ্কটেশ্বর কবি, ধাতুরিয়া নাচে, মটুকনাথ পণ্ডিতমানুষ। অরণ্যের গাছপালা, ফলফুল, সরস্বতী কুণ্ডী ইত্যাদি যেমন অরণ্যের এক একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, চরিত্রগুলিও তদনুরূপ। অর্থাৎ এখানে যে জীবন তা মানব-জীবন নয়, অরণ্যজীবন। মানবজীবনকে সচকিত করে তোলে যে সমস্ত নৈসর্গিক ঘটনা, যেমন বর্ষা বা ঝড়, তা লেখক সযত্নে বর্জন করেছেন। দাবানলের ঘটনাটিও যেন জীবনকে সচকিত করার জন্য নয়, অরণ্যের রূপনির্মিতির একটি অঙ্গবিশেষ। 'আরণ্যক'-এ অরণ্য-পটভূমি একটি বিস্ময়মিশ্রিত মুগ্ধতার দৃষ্টিতে দেখা বিষয়বস্তু মাত্র, জীবনজিজ্ঞাসা-বর্জিত পটভূমি-সর্বস্ব চলচ্চিত্র মাত্র। এ জাতীয় পটভূমি-সর্বস্ব কাহিনীর নিজস্ব একটি মূল্য আছে একথা ঠিক, কিন্তু উপন্যাস হিসাবে এগুলির সার্থকতা কতখানি তা বিচার্য বিষয়।

পঞ্চমত, মানসিক পটভূমি। পটভূমি-বিধৃত চরিত্র যেমন উপন্যাসের অন্যতম অন্বিষ্ট, অন্যদিকে চরিত্রের মানসজগতে স্মৃতিতে, স্বপ্নে, আশাআকাঙ্ক্ষায় এমন একটি দেশকালের পটভূমি থাকতে পারে যাকে আমরা চরিত্রের দ্বিতীয় পটভূমি বলতে পারি। এক্ষেত্রে চরিত্রগুলি বাস্তব পটভূমির চেয়ে কল্পনার জগতে এই দ্বিতীয় পটভূমিতে বিচরণ করতে বেশি ভালোবাসে। বৈপরীত্যমূলকভাবে মনোরাজ্যের এই দ্বিতীয় পটভূমি কখনও হাস্যরস কখনও করুণরস সঞ্চারের সহায়ক হয়।

ষষ্ঠত, বিচিত্রদৃষ্ট (Kaleidoscopic) পটভূমি। আধুনিক কালে উপন্যাসে বিচিত্রদৃষ্ট পটভূমি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেখানে ঔপন্যাসিক ভাবানুষঙ্গ বা চেতনাপ্রবাহ অনুসরণে উপন্যাস রচনা করেন সেখানে চরিত্রের পটভূমিতে শুধুমাত্র বাস্তব দেশকালের পটভূমি বিদ্যমান নয়, বা মনোরাজ্যের দ্বিতীয় দেশ-কালের পটভূমি বিদ্যমান নয়—সেখানে বিচিত্রদৃষ্ট পটভূমি বিদ্যমান, একইসঙ্গে কয়েকটি জগৎ চরিত্রের পটভূমিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ সমস্ত উপন্যাসে প্রচলিত স্থান ও কালের সংজ্ঞা উপেক্ষিত হয়। কারণ আধুনিক মানুষের মানসিকতা স্থান ও কালের ক্রমন্যাসকে স্বীকার করে না। চেতনাপ্রবাহ বা ভাবানুষঙ্গ অনুসারে চরিত্র একই কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্তমান থাকতে পারে,

আবার একই কালে অবস্থিত হয়েও ভিন্ন ভিন্ন কালে সে বিদ্যমান থাকতে পারে। এই দৃষ্টিতে কাল ক্রম-অগ্রসরশীল নয়, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ স্থানের মতোই একসঙ্গে প্রসারিত। স্থান ও কালের এই পরিবর্তিত সংজ্ঞার ফলে চরিত্রের পক্ষে একই স্থান-কালের সন্ধিতে অবস্থিত থেকেও ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন কালে বাস করা সম্ভব। এটা সম্ভব হয়, কারণ একইসঙ্গে মানুষ বহু ব্যক্তিত্বের সমবায়ে গঠিত একটি জটিল জীবন। দৃষ্টিকোণের এই বহুমুখী চেতনার ফলে আধুনিক উপন্যাসে চরিত্রের পটভূমি বিচিত্রদৃষ্ট। বুদ্ধদেব বসুর 'নীলাঞ্জনের খাতা'র একটি অংশ—"একদিকে আমি নীলাঞ্জন দে, য়ুনেস্কোর প্রতিনিধি, নিউ-ইয়র্কে কেনা ঢিলেঢালা আরামদায়ক জামা কাপড় পরা—আর অন্যদিকে নীলু, নীলাঞ্জন, বেদনা, বিবেক ও অনুভূতিতে ভরা একটি মানুষ।" অনুভূতির বিশেষ একটি লগ্নে নীলাঞ্জনের অতীত এবং বর্তমান একই সঙ্গে প্রসারিত, হনলুলুগামী প্লেন আর বাংলা দেশের একটি গ্রাম একইসঙ্গে উদ্ভাসিত। বনফুলের 'সে ও আমি' উপন্যাসটিতে "বাস্তব ঘটনা, অতীত ও বর্তমান, তীব্র-আকুতিপ্রসূত স্বপ্ন-বিভ্রম, উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনাজাল, অন্তর-সত্তার দ্বিধা-বিভক্ত বহিঃপ্রকাশ—সবই অঙ্গাঙ্গীরূপে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া মনোলোক-গহনতার একটি রূপক চিত্র রচনা করিয়াছে।" এ সমস্ত ক্ষেত্রে চরিত্রের একটি বিশেষ মনোভঙ্গির আলোকে পরস্পরবিরোধী কয়েকটি ভিন্ন জগৎ একইসঙ্গে পটভূমিরূপে সক্রিয়।

শ্যামাপ্রসাদ সরদার

পরিবেশপ্রধান উপন্যাস—দ্র, পটভূমি।

পত্রোপন্যাস (এপিস্টোলারি নভেল): উপন্যাস লেখার প্রচলিত রীতি প্রধানত তিনটি, প্রত্যক্ষ-বর্ণনাধর্মী, আত্মকথনধর্মী ও তথ্যাশ্রয়ী প্রামাণিকতাধর্মী। পত্রোপন্যাস শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে অনেকসময়ে একই উপন্যাসে তিনটি পদ্ধতির মিলন-মিশ্রণ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' বা 'ইন্দিরা', রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' বা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে মিশ্ররীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

পত্রোপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এইভাবে নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, বর্ণিত ঘটনা ঘটার সময়ে এবং তার ভবিষ্যৎ ফলাফল জানার আগে পাত্র-পাত্রীর মনে যেসব অনুভূতির উদয় হয় পত্ররীতির উপন্যাসে তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিগত

প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। পত্রলেখক-চরিত্ররা যখন যা যেমনভাবে অনুভব করেছে তাদের সেই মুহূর্তের অনুভূতি, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে তারা ঠিক সেইভাবে চিঠির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। এইদিক দিয়ে পত্রোপন্যাস আত্ম-চরিতমূলক কিংবা প্রত্যক্ষ বর্ণনাধর্মী উপন্যাসের থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। পত্রোপন্যাসে ঔপন্যাসিক যিনি ঘটনাপ্রবাহের বাইরে থাকেন তিনি বাইরে থেকে সেই বিচিত্র অনুভূতির বিচার ও বিশ্লেষণ করেন। ফলে পত্রোপন্যাসে চরিত্ররা নিজেদের বহুবিচিত্র অনুভূতিকে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে পত্রের মাধ্যমে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে ব'লে পাঠকেরা এক্ষেত্রে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে যে মানসিক নৈকট্য অনুভব করে, প্রত্যক্ষ-বর্ণনাধর্মী উপন্যাসে তার সুযোগ অনুপস্থিত। অন্যদিকে আত্মচরিতমূলক উপন্যাসে আমরা কেবলমাত্র একটি চরিত্রের মুখে অতীত ঘটনার বিশ্লেষণ শুনি, কারণ ঔপন্যাসিক যিনি সাধারণত বিভিন্ন চরিত্রের বিষয়ে ও বর্ণিত ঘটনার ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করেন, তিনি নিজে এক্ষেত্রে উত্তমপুরুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ফলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশে অপারগ। যাবতীয় ভবিষ্যৎ ঘটনা যতক্ষণ না ঘটে যাচ্ছে, অতীতে পর্যবসিত হচ্ছে, ততক্ষণ আত্মচরিতের উত্তমপুরুষ কোন মন্তব্য প্রকাশে অক্ষম, যেহেতু তিনি (তথা ঔপন্যাসিক নিজে) এক্ষেত্রে ঘটনা-প্রবাহে ভাসমান অন্যতম চরিত্র। শুধু তাই নয়, উত্তমপুরুষের ক্ষমতা ও জ্ঞানের বাইরে যে বিশাল বস্তুজগৎ, তার প্রতিফলনও আত্মচরিতমূলক উপন্যাসে সম্ভব নয়। ফলে এ রীতির উপন্যাসের বিস্তারও খুব বেশি নয়। পত্রোপন্যাসের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে রিচার্ডসন তাঁর 'ক্লারিসা'র ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন—'Much more lovely and affecting must be the style of those who write on the height of the present distress, the mind tortured by the pangs of uncertainty, than the dry narrative, unanimated style of a person relating difficulties and dangers surmounted, the relater perfectly at ease; and if himself unmoved by his own story, then not likely greatly to affect the reader'. দ্বিতীয়ত, পত্রোপন্যাসে অন্য-রীতির উপন্যাসের থেকে ঔপন্যাসিক বহুল পরিমাণে নৈর্ব্যক্তিক হতে পারেন, লেখক ও চরিত্রের মধ্যে একটা রসঘন দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারেন এবং শিল্পী-জনোচিত নিষ্ঠার কঠোরতা ও আন্তরিকতার লাবণ্যে রচনাকে উজ্জ্বল করে

তুলতে পারেন। উত্তমপুরুষে বিবৃত কাহিনী যেন একটি চরিত্রের লেখা দীর্ঘ চিঠি পড়ে যাওয়া, কিন্তু একাধিক জনের পত্রসংকলনে প্রত্যক্ষ বিবরণধর্মী রচনার সজীবতা ও বৈচিত্র্য যেমন পাওয়া যায়, তেমনি অনেক সঙ্গীর সম্মিলিত উপস্থিতিতে কোনো একজনের বিয়োগান্ত পরিণতি প্রত্যক্ষ করা যায়। তৃতীয়ত, পত্রোপন্যাসে পাঠক এক পক্ষের বক্তব্য শোনবার পর অন্য পক্ষ সে সম্পর্কে কি ভাবছে সেই কল্পনায় নিজেকে নিরন্তর নিয়োজিত রাখে, এবং শেষ পর্যন্ত সে যা কল্পনা করেছে, অপরপক্ষ বাস্তবিকই তা ভাবছে কিনা তা জানার জন্য সবিশেষ উদগ্রীব হয়ে ওঠে। উপন্যাসের সামগ্রিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে পাঠকচিত্তের এই যে উদগ্র কৌতূহল তা পত্রোপন্যাসের একটি বিশেষ গুণ বলা যেতে পারে। চতুর্থত, পত্ররীতির উপন্যাসে বিশ্লেষণী মন্তব্য ও স্বচ্ছন্দ ভাবপ্রকাশের (যা অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিকতার কারণ হয়) সুযোগও প্রশস্ত। পঞ্চমত, পত্রোপন্যাসে রচনাশৈলীর পরাকাষ্ঠা দেখানোর সুযোগও অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে বেশি। এখানে প্রতিটি চরিত্রই স্বতন্ত্রভঙ্গিতে আত্মকথনে মগ্ন। ফলে রচনার প্রসাদগুণ বাড়ে এবং সমগ্র রচনাটিই আশ্চর্য নাটকীয়তা লাভ করে। এজন্যই ফরাসি সাহিত্যে পত্ররীতির বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ষষ্ঠত, শুধু রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যের দিক থেকেই নয় দুটি পত্রের মধ্যবর্তী অনিবার্য সাময়িক বিরতির দিক থেকেও এ রীতি লেখককে অধিক পরিমাণে আনন্দ ও সাময়িক তৃপ্তি দান করে। এই সাময়িক বিরতি ঘটে 'by the omission or loss of letters'। সপ্তমত, এ রীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, পাপড়ি ঘেরা পদ্মকোরকের মতো জীবনের অতি মৌলিক অনুভূতি ও প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থিত চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। অষ্টমত, উপন্যাসে যে 'ইলিউসন অফ রিয়ালিটি' আমরা প্রত্যক্ষ করি, বাস্তবের সেই মায়াসৃষ্টি ও তা বজায় রাখার দিক থেকে এই পত্ররীতি বিশেষ কার্যকর।

অবশ্য পত্রোপন্যাসের কতকগুলি দুর্বল দিকও আছে। যেমন, নাটকে কাহিনীকার বা কথকের অভাবে পাঠক যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, তা এই জাতীয় উপন্যাসেও উপস্থিত। তদুপরি সাধারণত মানুষ যে সব কথা বলে না বা প্রকাশ করে না, এখানে পত্রলেখক-চরিত্র নিজের সম্পর্কে সেই সমস্ত কিছুই বেআব্রু করে বলে। এমনকি কখনও কখনও তাকে আত্মপ্রশংসার পুনরুক্তিতে মুখর হতেও দেখি, অথচ ব্যক্তিগত জীবনে আমরা দেখি মানুষের সৌজন্যবোধ আত্মপ্রশংসা গোপন করারই পক্ষপাতী। রিচার্ডসন যিনি ইংরেজি সাহিত্যে

পত্ররীতির উপন্যাসের প্রবর্তক, তাঁর সম্পর্কে সমালোচকদের বক্তব্য হলো তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের দেখে মনে হয়, তারা যেন চিঠি লেখার বাতিকে (ম্যানিয়া) ভুগছে। এমনিতে তাদের যত কাজই থাকুক, চিঠি লেখার ব্যাপারে তাদের সময় যেন অফুরন্ত এবং যে জগতে তারা বাস করে সেখানে যেন সব কিছুরই অনুলিপি ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে ফাইলবদ্ধ অবস্থায় আছে। রিচার্ড'সন তাই পত্র লেখার সম্পর্কে পামেলার প্রগাঢ় অনুরাগের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। 'স্যার চার্লস গ্র্যাণ্ডিসন' উপন্যাসের মিস বাইরন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেসলি ষ্টিফেন বলেছেন যে, ২২শে মার্চ তিনি ছাপার অক্ষরে চোদ্দ পৃষ্ঠার একটা চিঠি লেখেন। ঐ একই দিনে তিনি আরো দুটো চিঠি লেখেন যথাক্রমে ছয় ও বারো পৃষ্ঠার। পরের দিন আরও দুখানা—যথাক্রমে আঠারো ও দশ পৃষ্ঠার। ২৪ তারিখে আরও দুটো, সর্বসাকুল্যে ত্রিশ পৃষ্ঠার এবং এত লেখার পরেও সর্বশেষ তাঁর সক্ষোভ মন্তব্য যে কলম থামাতে তাঁকে বাধ্য করা হলো! তা সত্ত্বেও তিনি আরও ছয় পৃষ্ঠা সংযোজন করেন, অর্থাৎ তিন দিনে তিনি ছাপার অক্ষরে সর্বসাকুল্যে ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা লেখেন!

অতএব পত্রোপন্যাসের এইসব ত্রুটিগুলি বর্জন করতে পারলে, বিশেষ করে পত্ররচনা বিষয়ে চরিত্রদের বাতিকগ্রস্ত মনোভাব বাস্তবানুগ হলে এবং সেই সঙ্গে রচনার পরিমিতিবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকলে পত্ররীতি যে উপন্যাস রচনায় মূল্যবান শিল্পকৌশল বিবেচিত হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

পিকারেস্‌ক্‌ নভেল: 'পিকারেস্‌ক্‌' শব্দটি এসেছে 'পিকারো' থেকে। ভবঘুরে প্রতারক যে-সব মানুষ নানাবিধ চাতুর্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, স্পেনীয় ভাষায় তাদের বলা হয় 'পিকারো'। পিকারেস্‌ক্‌ নভেল-এর প্রথম উদ্ভব হয় স্পেনে। ১৫৫৪ সালে কোনো এক অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত *Lazarillo de Tormes* নামে বইটিতে প্রথম পিকারেস্‌ক্‌-এর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায়। তার পঞ্চাশ বছর পর Mateo Aleman-এর লেখা দুই খণ্ডের *Guzman d'Alfarache* (১৫৯৯-১৬০৪) প্রকাশিত হলো যখন, তখন থেকে স্পেনীয় সাহিত্যে পিকারেস্‌ক্‌ নভেলস একটি বিশেষ ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল।

স্পেনীয় পিকারেস্‌ক্‌ নভেল অনূদিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এবং

জার্মানিতে। ফলে সেসব দেশের সাহিত্যেও এই জাতীয় নভেল রচিত হতে থাকে। বলা যেতে পারে, স্পেনীয় পিকারেস্‌ক্‌-এর অনুবাদের ভিতর দিয়েই ফরাসি ও ইংরেজি নভেলে বাস্তবতার সূচনা। পিকারেস্‌ক্‌ নভেলের ধারা ইয়োরোপীয় সাহিত্যে কয়েক শতাব্দী ধরে প্রচলিত থেকেছে। ইংরেজি সাহিত্যে এই ধারার শীর্ষস্থানীয় উপন্যাস ড্যানিয়েল ডিফো রচিত *Moll Flanders* প্রকাশিত হয় ১৭২২ সালে। প্রায় সমসময়েই ফরাসি সাহিত্যেও এই ধারার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তিন খণ্ডে রচিত *Gil Blas* (১৭১৫, ১৭২৪, ১৭৩৫) নামে সেই উপন্যাসটির রচয়িতার নাম Lesage। জার্মান ভাষায় এই ধারার সেরা উপন্যাসটি পেয়েছি আমরা সম্প্রতিকালে টমাস মান্‌-এর লেখা *The Confessions of Felix Krull* (১৯৫৪)। এর সমকালে প্রকাশিত আমেরিকার লেখক সল বেলো রচিত *The Adventures of Augie March* (১৯৫৩) এই শতকের আরেকটি প্রসিদ্ধ পিকারেস্‌ক্‌ নভেল।

পিকারেস্‌ক্‌ নভেলের গঠনগত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ভবঘুরে নায়কের বিভিন্ন স্থানে এবং কালে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয় বলে এ জাতীয় উপন্যাসে একটি বড়ো কাহিনীর পরিবর্তে পাওয়া যায় বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কাহিনীর সমষ্টি। ফলে এর কোনো বদ্ধ প্লট নেই। বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে সংহতি দেয় নায়কের চৈতন্য। উত্তম-পুরুষের কথনে নায়ক তার ছদ্ম-আত্মজীবনী বর্ণনা করে। কোথাও কোথাও উত্তম-পুরুষ-জবানি পরিত্যক্ত হলেও পিকারেস্‌ক্‌ নভেলে নায়কের জীবন তার নিজের চৈতন্য দ্বারাই পরিশ্রুত। এর শিরোনাম তাই নায়কের নাম-অনুসারেই হয়ে থাকে।

বাইরের গড়নে মিল থাকলেও এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায়, এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক কাল থেকে অন্য কালে সাহিত্যের অর্থময়তা ভিন্ন হয়ে যায়। পিকারেস্‌ক্‌ নভেলেও বৈচিত্র্য ঘটেছে, ঘটেছে নায়ক চরিত্রের বৈচিত্র্য অনুসারে। কোথাও কোথাও নায়ককে আমরা দুরাচারী হিসেবেই পাই, প্রথম যুগের স্পেনীয় পিকারো যেমন, যারা জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সামাজিক মান-সম্মান পাবার জন্যেই সমাজবিরোধী কাজ করে। আবার এমনও নায়ক আছে যারা সামাজিক যে-কোনো পুরস্কারকে অস্বীকার করে বলেই অসামাজিক, বিদ্রোহী। কোনো কোনো নায়ক সম্পূর্ণ অনৈতিক, আবার কোনো কোনো নায়ক বাইরে প্রথাগত নৈতিকতার বিরুদ্ধতা করলেও ভিতরে সন্ত-সুলভ প্রকৃত

নৈতিকতার ধারক। কোনো কোনো উপন্যাসে দুরাচারী নায়কের সঞ্জীবনে যেন পুনর্জন্ম ঘটে।

এইভাবে, বহুবছর ধরে নানাবিধ ভিন্ন মনোভঙ্গি নিয়ে পিকারেস্‌ক্‌-এর নায়ক বর্ণিত হয়েছে। তবু তারও অভিজ্ঞতার একটি বিশিষ্ট ছাঁদ আছে। শিকড়হীন, গৃহপলাতক সেই নায়ক, সমাজের বাইরে থেকে সমাজের ক্ষমতা-চাপের মোকাবিলা করে। সেই নায়ক একইসঙ্গে তুচ্ছ মানুষ এবং মহান্‌ মানুষ, একইসঙ্গে কমিক এবং ট্রাজিক। এরকম স্ববিরোধী বলেই সেই নায়ক আজকের এই স্ববিরোধী যুগের যোগ্য প্রতিনিধি। এ যুগের নায়কের মধ্যে মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার প্রকাশই যে শুধু দেখা যায়, তা নয়, মানুষের একান্ত দুর্বলতার প্রকাশও দেখা যায়, এমনকি তার পাপেরও।

বাংলা সাহিত্য থেকে পিকারেস্‌ক্‌ নভেলের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মনে হয়, পিকারেস্‌ক্‌ নভেলের আদর্শ নিয়েই যেন শরৎচন্দ্র লিখতে শুরু করেছিলেন 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সেই প্রথম পর্বে নাম থেকে শুরু করে বৃদ্ধ কথকের উত্তমপুরুষ-জবানিতে লেখা আত্মকাহিনীর ধরন, একটি কাহিনীর পরিবর্তে কাহিনী-সমষ্টি—সবই পিকারেস্‌ক্‌ নভেলের লক্ষণ-যুক্ত। শ্রীকান্ত চরিত্রটিতেও পিকারেস্‌ক্‌ নায়কের বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট। পরিবারের বন্ধনহীন সামাজিক মান-মর্যাদাহীন তুচ্ছ মানুষ শ্রীকান্ত যেখানে অন্ধকারের রূপ উপলব্ধি করে, সেখানে সে সন্তের মতোই মহান্‌। শ্রীকান্ত উপন্যাসের পরের খণ্ডগুলিতে অবশ্য 'এপিসোডিক' ধরন ততটা আর বজায় থাকেনি। সঠিকভাবে বলতে গেলে প্রথম খণ্ডটিকেই শুধু 'পিকারেস্‌ক্‌' আখ্যা দেওয়া যায়।

সুতপা ভট্টাচার্য

প্রকৃতিবাদ : বাস্তববাদ ও প্রকৃতিবাদ সমার্থক কোনো মতবাদ নয়। বরং প্রকৃতিবাদ বা 'Naturalism is the logical result of realism. One is a process and other is the aim'। এই দুটি মতবাদের অভিন্নতার বিভ্রান্তিকর অনুসন্ধান এখনও অব্যাহত বলেই দামিয়ান গ্রাণ্টের সতর্ক বিশ্লেষণ —'realism' derives from philosophy and describes an objetive, the attainment of the real ; 'Naturalism' derives from natural philosophy or science and describes a method which shall

conduce to the attainment of real. Admittedly usage does not always make this clear ; realism is spoken of as a technique and naturalism as a tendency." বাস্তববাদ থেকে প্রকৃতিবাদের ভিন্নতা বৈজ্ঞানিক নিমিত্তবাদ বা মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় নিয়তিবাদের পরিগ্রহণে, যা কিনা প্রকৃতিবাদী লেখককে মানুষের নৈতিক বা মানবিক গুণাবলী অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি নির্ধারণে প্রণোদিত করে।

এই প্রকৃতিবাদকে কেউ কেউ যথাযথবাদ বা পরিবেশবাদ বলেও আখ্যা দিয়েছেন। এই অভিধার নিহিতার্থ অস্পষ্ট নয়। পরিস্থিতি বা পরিবেশের ফোটোগ্রাফি প্রকৃতিবাদের বৈশিষ্ট্য। জীবন ও শিল্পের সম্বন্ধ বা দূরত্ব নিয়ে প্রকৃতিবাদী ভাবিত নন। হয়তো সচেতন নন। জীবন ও সমাজের প্রতিমূর্তি রচনায় প্রকৃতিবাদীর স্বস্তি ও তৃপ্তি।

সাধারণভাবে বাস্তববাদ, স্বভাবত মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা বা 'psychological realism' (স্তাঁদাল) ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা বা 'Socio-economic realism' (বালজাক) রোমান্টিকতা বা ভাববাদের আতিশয্য-জনিত প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট। অন্যদিকে এই রোমান্টিকতা-বিরোধী মানসতা থেকে এবং ডারউইনী জীবতত্ত্ব ও বস্তুতান্ত্রিক জীবনদর্শনের সমীকরণে প্রকৃতিবাদের প্রতিষ্ঠা। তাহলে বোঝা গেল 'পরিবেশবাদ, বংশগতিতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ' যেমন প্রকৃতিবাদের উৎস তেমনি জীববিজ্ঞান ও অর্থনীতি প্রকৃতিবাদীর কাছে অচ্ছুৎ নয়। প্রকৃতিবাদীর ধারণা, মানুষ নিয়তির কাছে অসহায়, ব্যক্তি-চরিত্রসমূহ 'helpless products of heredity and environment,' জড়-বিশ্বের ফাঁদে সে বন্দী, নিয়তিনির্ধারিত তার দেহের দাবি, 'পঞ্চভূতের ফাঁদে মানবমন চিরশৃঙ্খলিত। রক্তমাংসের দেহের কামনা, আকাঙ্ক্ষা ও তার জড়-বিধান মানুষের জীবনে একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি।' বাস্তববাদের যে পরিণতি প্রকৃতিবাদে অথবা যে প্রকৃতিবাদ 'পরিণত বাস্তবতাবাদ'—শিল্পসাহিত্যে সেই প্রকৃতিবাদের প্রথম প্রবক্তা দার্শনিক মনোবিজ্ঞানী হিপোলাইট টেইনের বিশ্লেষণ প্রভাবসঞ্চারী ভূমিকা নিয়েছে, তাঁর মতে মনকে আধ্যাত্মিক রহস্যময়তার মোড়কে বাঁধা বলে ধরা যায় না। বরং মানতে হয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রভাব মনের উপর ক্রিয়াশীল। টেইনের ধারণা এই মহাবিশ্ব বস্তুত একটি 'Great mechanism', মানুষ, মানুষের নৈতিকজীবন এবং কর্মকাণ্ডসমূহ—এই সব, সব কিছুই বোঝা

যেতে পারে কার্য ও কারণের সম্বন্ধসূত্রে। এখানে অলৌকিকতার স্থান নেই। এভাবেই গড়ে উঠছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। মনোবিজ্ঞানী টেইনের বিশ্লেষণ চিকিৎসাবিজ্ঞানী লুকাসের বংশগতিতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে জোলার 'The Experinental Novel' (১৮৮০) শীর্ষক রচনাটি প্রকৃতিবাদের ম্যানিফেস্টো হিসাবে গৃহীত হয়েছে, যেখানে তিনি বোঝাতে চান প্রকৃতিবাদী ঔপন্যাসিক কেবল জগৎ ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করবে না, সমস্ত অনুপুঙ্খের রেকর্ড সংকলন করবে, চরিত্রসমূহের রুচি, আবেগ, সংবেদনশীলতা নিয়ে রাসায়নিকের মতন বস্তুর কারবারী হবে।

ফরাসি উপন্যাসক্ষেত্রেই, ১৮৫০ সালে প্রকৃতিবাদের প্রথম প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। বাস্তববাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিতেই এই প্রকৃতিবাদের 'উদ্গাতা' হয়তো ফ্লোবেয়ার, কিন্তু তিনি যে 'রিয়ালিজম' বা বাস্তববাদের 'গুরু' এবিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর 'মাদাম বোভারি' যেমন বিশ্বসাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে, অভিযোগ থেকে মুক্তও হয়েছে, তেমনি চিন্তাজগতে প্রবল নাড়া দিয়েছে। রোমান্টিকতার প্লাবন যখন অসহ্য ও একঘেয়েমিতে বৈচিত্র্যহীন ও ক্লান্তিকর মনে হয়েছে, তখনই প্রতিবাদী ফসল 'মাদাম বোভারি'র মতন বাস্তববাদী উপন্যাস; যদিও সেখানে সমাজ ও জীবনের প্রেক্ষাপটে তীব্র আশাবাদের বিচ্ছুরণ হয়তো লক্ষ্য করা যায় না, সমকালীন নেপোলিয়নের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ শোনা যায় না, কিন্তু পাওয়া যায় একধরনের বাস্তবধর্মী নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি। মানব-ইতিহাসের স্তর-বিভাজন সূত্রে 'শূকরধর্মী' স্তরে ফ্লোবেয়ার এর বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। তাঁর কাছ থেকে তাই শোনা গেল—'Human life is a sad show, undoubtedly, ugly, heavy and complex'। মাদাম বোভারি 'ফরাসি উপন্যাসের গতিপথে নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক যাত্রাবদল—সে যাত্রা অকুণ্ঠ বাস্তবধর্মিতায়', যার চুলচেরা বিশ্লেষণে লাভ করা যায় অবশ্যই প্রকৃতিবাদের স্বাদ।

প্রকৃতিবাদী ঔপন্যাসিক হিসাবে জোলাকে 'অথরিটি' গণ্য করা হলেও গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের সৃষ্টিকর্মে প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত। প্রকৃতিবাদী লেখক সাধারণভাবে জনসাধারণের মৌলিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, দাবি, চাহিদা তুলে ধরেন না, বরং অবকম্পিত সমাজের ফোটোগ্রাফিতে যেন আশ্বস্ত বোধ করেন। এই-ধরনের ঔপন্যাসিক তাঁদের সৃষ্টিতে গুরুত্ব দেন—১. Sociological enquiry

২. Exact psychological Investigation ৩. Methods of Scientific Workmanship ; এই কারণে এডমণ্ড গঁকুরের হাতে জন্ম নেয় 'Woman of Paris'—প্যারিসের গণিকাজীবন, গণিকা পল্লীর অবিকল প্রতিলিপি। এখানে প্রকৃতিবাদীর প্রত্যাশিত 'frankness'ও 'documentation' দুর্লভ নয়। কিন্তু তদতিরিক্ত কিছু পাওয়া কঠিন ; কেননা এডমণ্ড গঁকুর ও তাঁর ভাইয়ের বক্তব্যই ছিল—'The novel of today is made with documents narrated or selected from nature as history is based on written documents.'

টেইনের দর্শনচিন্তা বা লুকাসের বংশগতিতত্ত্বই নয়, ডারউইনের জীবতত্ত্ব (*Origin of Species*, ১৮৫৭) বিষয়ক যুগান্তকারী ব্যাখ্যা ও অগাস্ট কোম্‌টের ঐহিকতাবাদ (positivism)-এর প্রসারও ফরাসি কথাসাহিত্যে প্রভাবসঞ্চারী হয়েছে, যার ফলশ্রুতি জোলার সৃষ্টিকর্ম, বিশেষত ২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ *Rougon-Macquart* (১৮৭১-৯৩) উপন্যাসমালা। এখানে মানবিক অধিকারে বিশ্বাসী জোলা আধ্যাত্মিক সত্তাকে অস্বীকার করেছেন। অস্বীকার করেননি রক্তমাংসের দেহকে কেন্দ্র করে মানবমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আসক্তি, বেশ্যাসক্তি, 'অন্তর্লীন পাশবিকতা', কামনা ও যৌনবুভুক্ষা, মদ্যাসক্তি, সর্বোপরি বেদনা ও আর্তনাদ। 'পজিটিভিস্ট, এভলুসনিস্ট ও মেটিরিয়ালিস্ট'-রূপে যেমন জোলার আত্মঘোষণা ছিল, তেমনি আকাঙ্ক্ষা ছিল 'to be naturalist'। তাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। তথাপি সামগ্রিক অর্থে জর্জ লুকাসের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ধরা পড়ে, প্রকৃতিবাদী 'পরীক্ষামূলক' উপন্যাসে জোলা 'writer' থেকে 'mere spectator'-এ অবনমিত হয়েছেন। মার্কস-এঙ্গেলসের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ লাফার্গ-ও বালজাকের প্রতিতুলনায়, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, বাস্তবতা সম্বন্ধে জোলার দৃষ্টিভঙ্গি 'newspaper reporter' সদৃশ হয়ে গেছে। লুকাস বা লাফার্গের সমালোচনার অন্তঃসার অস্বীকার করা না গেলেও এবং জোলা সমালোচিত হলেও তাঁর লেখা *Germinal* (১৮৮৫) উপন্যাসে তাঁর শিল্পীসত্তার সত্যতাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এই উপন্যাস কয়লাখনির অভ্যন্তরে খনিশ্রমিকের কিরূপ কর্মধারা, কিভাবে কয়লা কাটা হয়, কিভাবে রন্ধ্রপথে জলের অনুপ্রবেশ ঘটে, ধ্বস নামে, যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি রক্তাক্ত খনিশ্রমিকের ধর্মঘটের পূর্ণাঙ্গ চিত্রায়ন ঘটেছে।

শ্রেণীসমাজে যা স্বাভাবিক, তাই প্রতিফলিত হয়েছে সেকালের পটভূমিকায়, পরিস্ফুট হয়েছে একটি রাজনৈতিক প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি ধনবাদী সমাজব্যবস্থার শোষণে পিষ্ট খনিশ্রমিকদের বঞ্চনা ও আর্তনাদের অবিকল প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন, অগ্নিগর্ভ প্রতিবাদী খনিশ্রমিকদের প্রতিবাদী মিছিলের রুদ্ধশ্বাস বিবরণ দিয়েছেন, পাশাপাশি মালিকশ্রেণীর অভ্যন্তরে একটা 'মানুষ'কে খুঁজেছেন। এক্ষেত্রে পরিবেশবাদ বা যথাযথবাদ অর্থাৎ আলোচ্য প্রকৃতিবাদের বৈশিষ্ট্যে অন্বিত উপন্যাসে বাস্তববাদের ডাইমেনশন বেড়েছে, তাও অগ্রাহ্য করা যায় না।

লাফার্গ বা লুকাসের সমালোচনা সত্ত্বেও জোলার উপন্যাসে অন্তর্নিহিত রোমান্টিকতা, যা মূলত প্রকৃতিবাদী জোলারই স্ববিরোধিতা, তা তাঁর স্বীকারোক্তিতে সুস্পষ্ট। রোমান্টিকতার বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়ায় বাস্তববাদ এবং সেই সূত্রে প্রকৃতিবাদের আত্মপ্রকাশ, একথা সত্য, কিন্তু প্রকৃতিবাদী সাহিত্যেও ক্লান্তিকর একঘেয়েমি দুর্লক্ষ্য নয়। জর্জ লুকাস দেখিয়েছেন, একদিকে পতনোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিমূর্তি অঙ্কন অপরদিকে তা থেকে শিল্পসম্মত উত্তরণের স্বপ্নে আবিষ্ট হওয়া—একটি অদ্ভুত রোমান্টিক দ্বৈততায় আক্রান্ত হতে হয়েছে ফরাসি প্রকৃতিবাদী সাহিত্যকে।

জোলা যেমন প্রকৃতিবাদী সাহিত্যের অগ্রনায়ক তেমনি এই পথেই ভ্যানগার্ড বলা যায় মোপাসাঁকে। তাঁর *Une Vie* (১৮৮৩), *Bel-Ami* (১৮৮৫), *Pierre Jean* (১৮৮৮), *Fort Comme la mort* (১৮৮৯) ইত্যাদি উপন্যাস ও দুশ পঁচিশটিরও বেশি গল্পে প্রকৃতিবাদের অজস্র উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। 'স্বোপার্জিত, ব্যাধি ও Melancholia'-য় অভিশপ্ত ব্যক্তিজীবন ; ফলে নারী সম্পর্কে, সমাজের নানাস্তরের মানুষ সম্পর্কে, জীবনের সর্ববিষয়ে রূঢ় সত্য উন্মোচনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর *Bel-Ami* তে যেমন ফ্রান্সের 'অভিজাত সম্প্রদায়ের নৈতিক অধঃপাত' পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করেছে, তেমনি তাঁর যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়ের রক্তাক্ত প্রতিবিম্বন ঘটেছে 'চর্বির গোলা' (Boul de Suif) গল্পে। তাঁর অসংখ্য গল্পের মধ্যে একটি আনুবীক্ষণিক প্রক্রিয়ায় চরিত্রের উন্মোচনে বা রূপায়ণে মোপাসাঁর প্রকৃতিবাদী ভূমিকা নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাঁর গল্পেও অবলীলায় গণিকাপল্লী, গণিকাজীবন, নীচুতলার সমাজ স্থান পেয়েছে। কিন্তু ফ্লোবেয়ার বা জোলার মধ্যে রোমান্টিক মানসতা প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নরূপে যদি বা

পাওয়া যায়, মোপাসাঁর মধ্যে তা একান্তই দুর্লভ। 'অবক্ষয়িত নাগরিকতা' ও 'মনোব্যাধির আচ্ছন্নতা' হয়ত মোপাসাঁর গল্পকে প্রকৃতিবাদের অন্তঃসারে নিষিক্ত করে নেয়, তথাপি ছোটগল্পে তাঁর শিল্পচরিতার্থতা তলস্তয়ের দৃষ্টিতে মুগ্ধতা সঞ্চারিত করেছে।

ফ্লোবেয়ার, গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়, জোলা, মোপাসাঁই নয়, মার্কিন সাহিত্যেও প্রকৃতিবাদ বিলম্বে হলেও বিকাশ ঘটেছে হ্যামলিন গারল্যাণ্ড, ষ্টিফেন ক্রেন, ফ্রাঙ্ক-নরিস এবং জ্যাক লণ্ডন-এর সাহিত্যকর্মে। জার্মান সাহিত্যে ইমারমান, গুস্তাফ ফ্রিটাকের উপন্যাসে কিংবা রুশী বুনিনের '*The Vigil*' শীর্ষক ব্যতিক্রমী উপন্যাসে।

এভাবেই সমাজবিকাশের ধারায় পুরনো ও নতুন সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্বে, ব্যবস্থার অন্তর্গত শ্রেণীদ্বন্দ্বে, যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সংকটে, মূল্যবোধের রূপান্তরে, অতীন্দ্রিয়তায় ঋদ্ধ রোমাণ্টিক রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরোধিতায় বাংলা গল্প-উপন্যাসে দখল নিল বাস্তবতা, অনিবার্য সূত্রে প্রকৃতিবাদ, যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদ ও বিষণ্ণ-বাস্তবতা। 'রিয়ালিটির কারিপাউডার' ছড়িয়ে দেওয়া হলো সাহিত্যের আঙিনায়। গোগোল-পুশকিন-তলস্তয় থেকে গর্কি যেমন স্বীকৃত হলো, তেমনি বালজাক ফ্লোবেয়ার-জোলা-মোপাসাঁ সাদরে গৃহীত হলো। নুট হামসুনও বাদ গেলেন না। যুদ্ধোত্তর কালের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সমস্যা, আশাহীনতা, জীবন সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিদ্রোহ দ্রুত গ্রাস করতে থাকে প্রকৃতিবাদী সাহিত্য-রচয়িতাদের সৃষ্টিসমূহ। এমিল জোলার ঘোষণাই যেন ঘুরেফিরে বেজে উঠতে থাকে, 'The metaphysical man is dead ; our whole domain is transformed with the coming of the physiological man।' রচিত হতে থাকে বেদে, বিবাহের চেয়ে বড়ো, প্রাচীর ও প্রান্তর (অচিন্ত্যকুমার), পাঁক (প্রেমেন্দ্র মিত্র), মেঘনাদ, লুপ্তশিখা (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত), রতি ও বিরতি, অসাধু সিদ্ধার্থ (জগদীশ গুপ্ত), এরা ওরা আরও অনেকে (বুদ্ধদেব বসু)। যৌনমনস্কতা, নৈরাশ্য, তিক্ততা, ঘৃণা, নারী সম্পর্কিত ভাবনার রূপান্তর, জৈব তাড়না, 'পাপের দিকটার চিত্রণ'—সব মিলিয়ে প্রকৃতিবাদী সাহিত্যের প্রভাব অস্পষ্ট রইল না। জোলা প্রমুখের এধরনের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। 'প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হতে পারে কিন্তু সে কি ছবি?' শরৎচন্দ্রের এ প্রশ্ন সংগত কারণেই তাঁর মনোধর্ম

অনুযায়ী উচ্চারিত হয়েছে, কেননা তিনি মানতেন 'Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়।' রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বিরোধিতার জন্যই নয়, সাহিত্য ও সমাজসম্পর্ক, দেশকাল-পরিবেশের কার্যকারণেই এ অবস্থা বেশিদিন বাংলা সাহিত্যে বিরাজ করেনি। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সামগ্রিক অর্থেই প্রকৃতিবাদী সাহিত্য-আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্তরেও দীর্ঘজীবী হতে পারেনি। তবে এই ঐতিহাসিক সাহিত্য আন্দোলন আমাদের চিন্তাজগতে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, সমৃদ্ধ করেছে শিল্পের দিক থেকেই বাস্তববাদকে।

শুভঙ্কর ঘোষ

প্রতীক উপন্যাস : প্রতীকমাত্রেই বাস্তব সত্য ও কল্পনার সংমিশ্রণে সৃষ্ট, এতে চেতন ও অবচেতন মনের লীলা চলে। কেবল চেতন মনের সৃষ্টি হলে তা প্রতিরূপকে (allegory) পরিণত হতো ; আবার অবচেতন মনের কার্য মাত্র হলে সেটা হতো নিছক পাগলামি। চেতন ও অবচেতন মনের যোগে সৃষ্টি হয় বলেই প্রতীকে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

কাব্যে বা নাটকে প্রতীকের প্রচুর প্রয়োগ হয়েছে আর তা হওয়াও সম্ভব। বাস্তব যখন চোখে আঙুল দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে দেখায় তখন প্রতীকের হয় মৃত্যু। কাব্যের সুরের জগতে তাই প্রতীক সৃষ্টির সুযোগ এত বেশি—যে-সুর সেখানে ধ্বনিত হয় তা মানুষকে বাস্তব জগৎ থেকে বহুদূরে নিয়ে যেতে সক্ষম ; এখানে মোহজাল বিস্তার সম্ভব বলেই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত সহজসাধ্য।

নাটকও প্রতীকধর্মিতার বিশেষ উপযোগী—এখানে অভিনয়ের সাহায্যে ভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। মঞ্চের উপরের অভিনেতারা দৃশ্যকৌশল, আলোকসজ্জা এবং পরিবেশ রচনার দ্বারা দর্শকদের অন্য জগতে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু নাটক কেবলমাত্র দৃশ্যকাব্যই নয়, তা পাঠও করা হয়। পাঠ্যকাব্য হিসেবে দেখলে আর অভিনেতাদের ভ্রান্তি সৃষ্টির কথা আসে না। সুতরাং বাস্তব থেকে সরিয়ে নিয়ে মায়ার জগৎ সৃষ্টি এক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে পড়ে। বৃহদায়তন পঞ্চাঙ্ক নাটক তো কিছুতেই এ কাজের উপযোগী হয় না। প্রতীকের মায়াজগতে বেশিক্ষণ কাউকেই ধরে রাখা যায় না ; তাই প্রতীক নাটককে ছোট হতেই হয়। তাতে মায়াজগতের বাধাসৃষ্টিকারী অঙ্ক-বিভাগ থাকে না, দৃশ্য-বিভাগও কমে যায়।

প্রতীকতায় মায়াজগৎ সৃষ্টি করতে হয় বলেই সম্পূর্ণ উপন্যাস কখনই প্রতীক হতে পারে না। উপন্যাসের ভিত্তি যদি বাস্তবতা এবং জীবন বিশ্লেষণ হয় তবে

মূলেই এই ভাবের সঙ্গে প্রতীকতার বিরোধ লক্ষ্য করতে পারি। উপন্যাস একা পাঠ করতে হয়—দু'চারজন শ্রোতা কখন কখন থাকে না এমন নয়। কিন্তু নাট্যমঞ্চের মতো ভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ এখানে নেই ; উপন্যাস পাঠেও বেশ সময় লাগে—এতটা সময়ও প্রতীকতা সৃষ্টির পক্ষে প্রায় অসম্ভব। গদ্যে ছন্দ থাকে সত্য কিন্তু এতে কাব্যের সুরময় জগৎ সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং প্রতীক সৃষ্টিতে কাব্য এবং নাটকের যে সুবিধেগুলো আছে উপন্যাস-সাহিত্য তা থেকে বঞ্চিত।

উপন্যাস যদি বাস্তবভিত্তিক না হতো, যদি তাতে জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ না থাকত অর্থাৎ যদি রোমান্সরূপেই তা আমরা পেতাম তবে হয়তো প্রতীক উপন্যাস পাওয়া যেত। নিশ্চয়ই তার আয়তন হতো ছোট, ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যেতাম তার শেষ পৃষ্ঠায়। কিন্তু যেহেতু উপন্যাস বাস্তবভিত্তিক এবং মানবজীবনের বিশ্লেষণেরই সেখানে প্রাধান্য সেইহেতু প্রতীক উপন্যাস কখনও রচিত হতে পারে না ; তবে প্রতীক রোমান্স রচনা করা যেতে পারে একথা অবশ্য তত্ত্বগতভাবে স্বীকার করা চলে।

প্রতীক রোমান্সও কেউ রচনা করেছেন বলে মনে হয় না, যদিও বহু রোমান্টিক উপন্যাসে নানাস্থানে প্রতীকের সন্ধান পাওয়া যায়। খাঁটি উপন্যাসেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতীকের প্রয়োগ সম্ভব। হেমিংওয়ের 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সি'তে মাছধরার ব্যাপার নিয়ে বৃদ্ধ জেলে স্যান্টিয়াগোর মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীক দ্যোতনাও নিতান্ত অল্প করা হয়নি। তবে মনো-বিশ্লেষণ সত্ত্বেও গ্রন্থটিকে সাধারণ উপন্যাসের সমপর্যায়ে ফেলা যায় না, ওকে রোমান্টিক আখ্যা দেওয়াই বিধেয়। নানাভাবে এই গ্রন্থের প্রতীকের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা সম্ভব। মমের 'দি ম্যাজিসিয়ান' আর একটি রোমান্টিক উপন্যাস ; এতে এক অজ্ঞাত রহস্যময় জগতের কথা আছে। এই গ্রন্থেও প্রতীকের সন্ধান পাওয়া যায়। উপসংহারে সুসি এবং আর্থার-এর ভবিষ্যৎ নবজীবনের সম্ভা-বনাকেই হয়তো প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে :

"Arthur what have you done ?" asked Susie, in a tone that was hardly audible.

He did not answer directly. He put his arm about her shoulder again, so that she was oblized to turn round.

"Look the sun is rising."

In the east, a long ray of light climbed up the sky, and the sun, yellow and round, appeared upon the face of the earth.

বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'তে পথের চটিতে নবকুমার এবং মতিবিবির আলাপের সময় 'প্রদীপ নিভিয়া গেল' যে প্রতীকই তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুতরাং বলা চলে যে উপন্যাস এবং বিশেষ করে রোমান্সে প্রচুর প্রতীকের প্রয়োগ সম্ভব হলেও প্রতীক উপন্যাস কথাটি স্ববিরোধী।

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

প্যানরমিক প্লট—দ্র. প্লট।

প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্য : ভারতীয় জীবনের মূল লক্ষ্য—ধর্ম ও মোক্ষ। ধর্ম-মোক্ষের বন্ধনীতেই অর্থ ও কামচিন্তা। এদেশের সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক। কিন্তু এই ধর্মের পটভূমিতে অর্থ-কামের অভীপ্সাদ্যোতক সাহিত্যের আবেদন কোনক্রমেই তুচ্ছ নয়। এরই ভিতর রূপায়িত হয়েছে লোক-জীবনের বিচিত্র কাহিনী, মানুষের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সুখদুঃখের কথা। অজস্র সুভাষিত, অসংখ্য উপকথা রূপকথা রসকথায় এই কাহিনীগুলি প্রাণময়। এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা ও লোকের মনোরঞ্জন। জন-জীবনের জীবনভূমি থেকেই এই কাহিনীগুলির জন্ম। এইগুলিই এদেশের কথাসাহিত্য।

কথাসাহিত্যের আদি লগ্ন স্থির করা অসম্ভব। সৃষ্টিতে যেদিন থেকে মানুষের আবির্ভাব, যেদিন থেকে তার জীবনসংগ্রামের শুরু, সেইদিন থেকেই কথার সূত্রপাত। তারপর মানবসভ্যতা যত অগ্রসর হয়েছে, কথাও চলেছে সেই অগ্রগতির পথ ধরে। শেষপর্যন্ত এই কথা ধরা পড়েছে ইতিহাসের আলোকে। মানুষের জীবন-চেতনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কথার রূপ বদলে গেছে, লক্ষ্যও পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক কথা হারিয়ে গেছে, কিছু কথা সংকলিত হয়েছে। এই সংকলিত কথাগুলি থেকে পণ্ডিত-গবেষকগণ সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। ভারতীয় কথাসাহিত্যের ইতিহাসও এই ক্রমেই রচিত হয়েছে।

এই ইতিহাস রচনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথার স্থান অতি অল্প। তার কারণ, উপাদানের অভাব। এদেশে আর্য-পূর্ব জাতিদের মধ্যেও যে উচ্চতর

সভ্যতা প্রচলিত ছিল, তার ঐতিহাসিক নজির আছে। সিন্ধুউপত্যকার সভ্যতায় তাদের শিল্পকীর্তির নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের নিদর্শন নেই। তাদের ভিতর নিশ্চয়ই বিচিত্র কথার প্রচলন ছিল। আদিবাসীদের বর্তমান বংশধর কোল, ভীল, সাঁওতাল, ওরাওঁ ও কোচ প্রভৃতির ইতিহাস থেকে অতি প্রাচীন কথার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

তবু বেদ থেকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনার সূত্রপাত এবং সংগৃহীত আর্য সাহিত্যই যেমন সে সাহিত্যের পরিচয়-পঞ্জী, ভারতীয় কথা-সাহিত্যের শুরুও তেমনি বৈদিক যুগ থেকে এবং তারও পরিচয়স্থল সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত সাহিত্য। খ্রীস্টপূর্ব দুইহাজার বছর আগে থেকে খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্যের যুগ। বেদের আখ্যান-সূক্ত বা সংবাদসূক্তগুলির মধ্যেই এদেশের কথাসাহিত্যের আদি অঙ্কুর নিহিত রয়েছে। ঋগ্বেদের অক্ষসূক্ত বা পুরুরবা-উর্বশীসংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লৌকিক জীবজন্তুর দৃষ্টান্ত সম্বলিত মন্ত্রগুলিতে কথাসাহিত্যে ধৃত জন্তুকাহিনীরও আভাস পাওয়া যায়, যেমন ঋগ্বেদের 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' [১, ১৬৪, ২০] মন্ত্রটি।

কথাসাহিত্যের আবেদন মূলত ধর্মবাহ্য হলেও, ভারতীয় কথাসাহিত্যে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। এদেশে লোকপ্রচলিত কথা ধর্মপ্রচারের বাহনরূপে পরি-গৃহীত। এইজন্য কি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আদর্শ প্রচারে, কি জৈনধর্মের নীতি ব্যাখ্যায় বা বৌদ্ধধর্মের ধর্মচক্রপ্রবর্তনে লোক-কথা একটি প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। কালানুক্রমে এদের কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও—ভারতীয় কথাসাহিত্যের ভাণ্ডার হিসাবে এদের প্রত্যেকেরই মূল্য অবিসংবাদিত।

প্রথমেই মনে পড়ে পালি ভাষায় গ্রথিত বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যের কথা। কেউ কেউ মনে করেন, জাতক কাহিনীই ভারতবর্ষের উপকথা-রূপকথার প্রাচীনতম সংকলন। গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে বোধিসত্ত্বরূপে পাঁচশত পঞ্চাশ জন্ম অতিক্রম করেছিলেন। জাতককথার অতীতবস্তু সেইসব জন্মের আশ্চর্য কাহিনী। কোন জন্মে বোধিসত্ত্ব তির্যক যোনি আশ্রয় লাভ করেছিলেন, কোন জন্মে বা মানব। কাজেই জাতকে একদিকে যেমন পাওয়া যায় ভারতীয় প্রাণি-কাহিনীর বৃত্তান্ত, তেমনি পাওয়া যায় অজস্র মানব-কাহিনী। প্রাণি-

কাহিনীগুলির ভিতর 'নিগ্রোধমিগ জাতক', 'সুবন্নহংস জাতক', 'সুংসুমার জাতক', 'কচ্ছপ জাতক', 'জাসকুণ জাতক' বহুখ্যাত। পরবর্তী সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রাদি কথাসাহিত্যেও এই গল্পগুলির সংকলন পাওয়া যায়। জাতকের মানব-কাহিনী-গুলি জীবনের স্বাদে পূর্ণ। বৌদ্ধ ধর্মদেশনার সূত্রে অহিংসা, ত্যাগ, তিতিক্ষা প্রভৃতি শীলাদি নীতি পরিবেশিত হলেও সংসারজীবনের অন্যান্য চিত্রও এতে দুর্লভ নয়। 'উম্মদন্তী', 'মহাজনক' প্রভৃতি জাতকে মানবচরিত্রের বিভিন্ন দিক প্রকট হয়েছে। জাতকের প্রসঙ্গে বৌদ্ধ অবদান সাহিত্যেরও নাম করতে হয়। নেপাল থেকে যে বিপুল সংস্কৃত-বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিচয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থে দিয়েছেন, তাতে ভারতীয় গল্পসাহিত্যে বৌদ্ধ অবদান সাহিত্যের দানকে তুচ্ছ করা যায় না। এগুলির ভিতর 'মহাবস্তু', 'অবদানশতক' ও 'দিব্যাবদান' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ এই সকল গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে 'চণ্ডালিকা', 'রাজা' নাটক রচনা করেন।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'ইতিহাস-পুরাণ'ও কথাসাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডার। ইতিহাস বলতে বোঝায় রামায়ণ-মহাভারত। পুরাণও ইতিহাস, কিন্তু তা বিস্মৃতপ্রায় সুদূর অতীতের ইতিহাস। এগুলি একহিসাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লৌকিক বেদ। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের মূলকথা প্রচারের উদ্দেশ্যেই এগুলি রচিত হয়েছিল। সেইসূত্রে বহু লোক-কথাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইতিহাস-পুরাণ কাহিনী সর্বস্ব। তত্ত্ব, নীতি ও ধর্ম কাহিনীর আকারেই লোকসমাজের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। আর সেইসঙ্গে অতি প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রেম, বীরত্ব, দান-ধ্যান, ত্যাগ তিতিক্ষার চিত্তরঞ্জক উপাখ্যান। পুরাণের সংখ্যা আঠারো; এই অষ্টাদশ পুরাণে জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির উপদেশছলে অজস্র কাহিনী সংকলিত হয়েছে। হিন্দুজীবনের শাশ্বত লক্ষ্য সত্য ও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করাই পুরাণ-কথার উদ্দেশ্য। অষ্টাদশ পুরাণের সার অষ্টাদশ পর্বযুক্ত মহাভারত। মহাভারতও ভারতীয় কথাসাহিত্যের অনর্ঘ রত্নকোষ। এদেশের ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাজ-নীতি ও কামনীতি বিষয়ক যুগ-প্রাচীন কথার বর্ণনায় পর্বগুলি মুখর। বিশেষত মহাভারতের বনপর্ব, শান্তিপর্ব ও অনুশাসন পর্ব; এগুলি যেন কথার অনন্ত সমুদ্র। যে-কোন বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্' (এ বিষয়ে ইতিহাস-পুরাণ এই উদাহরণ দেয়) বলে মহাভারতকার কথার মালা

গেঁথেছেন। এই সকল অসংখ্য কথার ভিতর প্রাণি-কাহিনীরূপে কুণিক বর্ণিত শৃগাল-ব্যাঘ্র-মূষিক-বৃক-নকুলকথা, (আদি. ১৪১), শিশুপাল বর্ণিত বৃদ্ধহংস ও ভূলিঙ্গ নাম্নী পক্ষিণীর কথা (সভা. ৪১, ৪৪), শান্তিপর্বের দীর্ঘসূত্রী শকুল মৎস্যের কাহিনী প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রেমের কাহিনী হিসাবে মহাভারতের রুরু-প্রমদ্বরা (আদি. ৮-৯), তপতী-সংবরণ (আদি. ১৬৫.২৫) প্রভৃতি কাহিনী বিশুদ্ধ প্রণয়ের চমৎকার উদাহরণ। মহাভারতীয় কথার চরিত্রা-লেখ্যগুলি অতি জীবন্ত ও পাষাণরেখার মতো দৃঢ় রেখায় মুদ্রিত। কথার বর্ণনায় কঠিন পৌরুষচিহ্নই মহাভারতীয় কথাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত জৈন শাস্ত্র-সাহিত্যেও বহু কথার সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয় সংখ্যাধিক্যে জৈন কথাসাহিত্যের দাবি সর্বাগ্রগণ্য। মূল অঙ্গাদি শাস্ত্রের একটি বৃহৎ অংশ কথারই সমষ্টি। অঙ্গগ্রন্থের অন্তর্গত 'নায়াধম্মকহাও', 'উবাসগদসাও' প্রভৃতি গ্রন্থে কাহিনীই প্রধান। শ্বেতাম্বর জৈন গ্রন্থের 'মূলসুত্ত'খানিরও অধিকাংশই গল্প ; তন্মধ্যে 'উত্তরজ্-ঝয়ণ'-এর কাহিনীগুলি অতি প্রাচীন ও নানাদিক থেকে মনোজ্ঞ। মূলসুত্তের অন্তর্গত 'নিজ্জুত্তি' নিরুক্তজাতীয় গ্রন্থ ; এতেও ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রাচীন কথা বর্ণিত হয়েছে। অঙ্গবাহ্য শাস্ত্র নিয়ে জৈন সাহিত্য বিপুলাকার। এদের মধ্যে 'পুরাণ' বা 'চরিউ' বহুখ্যাত। এগুলি মহাপুরুষ চরিত্রের কল্পভাণ্ডার। জৈন সাহিত্যের 'ধম্মকহা' কথাসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। এগুলি মহাকাব্যাকারে গ্রথিত। তাছাড়া 'কথানক' নামে এদের যে শাস্ত্রশাখা আছে, তাও বিচিত্র ছোট ছোট গল্পের সমষ্টি।

জৈনধর্মের মূলাদর্শ প্রচার করার লক্ষ্যেই কথার অবতারণা। কিন্তু কথাগুলি যেন কল্পলোকের দ্বার উদ্ঘাটন করে দেয়। জৈন কথাসাহিত্যে পশু-পক্ষীর স্থান অতি অল্প ; চৌষট্টি মহাপুরুষ এবং অন্যান্য জৈন সাধকদের অলৌকিক কাহিনীই এদের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু এই কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে জৈন কথাকারগণ এক বিচিত্র রমা-লোক সৃষ্টি করেছেন। সেখানে প্রেম ও বীরত্বের নানা খেলা, মানবজীবনের সুউচ্চ কল্পনারম্য আকৃতির প্রকাশ। বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী, সমুদ্রতল, গন্ধর্বলোক মিলিয়ে সে যেন বিস্ময়কর রূপকথার রাজ্য। আবার এদেরই সঙ্গে আছে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, ত্যাগ-বৈরাগ্যের সুন্দর কাহিনী। এ যেন কল্পনা ও বাস্তবের রহস্যময় সঙ্গম।

বৌদ্ধ জাতক, হিন্দু পুরাণ বা জৈন শাস্ত্র সাহিত্য থেকে যে-কথাসাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে ধর্মপ্রচারের লক্ষ্যই মুখ্য। এইজন্য সাহিত্যের আনন্দ-লোকের পঙ্‌ক্তি-ভোজে তারা প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয়। রস-সাহিত্যের অন্তর্গত কথা-সাহিত্যের সূচনা ভূতভাষার কথাকার গুণাঢ্য থেকে। কিন্তু গুণাঢ্য ও তাঁর রচনা 'বৃহৎকথা' আজ নামমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। কারণ, তাঁর প্রাকৃত মূল আজও আবিষ্কৃত হয়নি। গুণাঢ্য আজ বেঁচে আছেন সংস্কৃত রূপান্তরের ভিতর দিয়ে ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে'। সে কথার রূপ ও রস প্রচলিত কথাসাহিত্যের রূপ-রস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেগুলি রম্যকথা —মানুষের প্রেম ও বীরত্ব অভিযানের অপূর্ব কাহিনী। উদয়ন-নরবাহনদত্তের সে কাহিনী একদিকে যেমন মনকে রঙিন কল্পনার রাজ্যে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি আবার জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেগুলি গল্পের গল্প, উপন্যাসের উপন্যাস। মনে হয়, কালিদাস-কথিত উদয়ন-কথা-কোবিদগণ এই গল্প বলেই আসর জমাতেন; ভাস ও হর্ষের কতকগুলি নাটক এই কথার বীজকে অবলম্বন করেই নাট্যাকারে গ্রথিত হয়েছিল; এমনকি দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' ও বাণের 'কাদম্বরী'ও গুণাঢ্যের কথার ছায়াতেই রচিত হয়েছিল। খুব সম্ভব গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' ছিল জীবনরসোচ্ছল রস-কথার আকর। পরবর্তী কালের অনেক নাটক ও গদ্যকাব্য এর কাছে ঋণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মূল আজ লুপ্ত, আছে শুধু তার ফুল ও ফল।

প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্যের যে রূপগুলি আজ লোকসমাজে প্রচলিত, তাদের স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: হিতকথা ও রম্যকথা। আচার্য কীথ্‌ এদের নাম দিয়েছেন Fable ও Tale. তিনি মনে করেন, নীতিশিক্ষার দিক থেকেই Fable-এর আবেদন, আর Tale-এর আবেদন রস-কথার দিক থেকে; কিন্তু কথাসাহিত্যে এ দুটি উপাদান এমনভাবে মিশে আছে যে একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করা প্রায় অসম্ভব। তবু আলোচনার সুবিধার জন্য ভাগ দুটি স্বীকার করা হলো।

Fable বা হিতকথার সংকলন হয়েছিল 'কলাবোধনার্থ' অর্থাৎ শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে শিশু কোমলমতি শিশু নয়, পাকা শিশু। কারণ, শিক্ষার লক্ষ্যে এখানে যে নীতির কথা বলা হয়েছে, তা জীবন-নীতি,—অর্থনীতি, রাজনীতি, কামনীতি। মনু, বৃহস্পতি, শুক্র, ব্যাস, চাণক্য ও বাৎস্যায়নকে

ছেঁকে এতে সারোদ্ধার করা হয়েছে। প্রচারের পাত্র-পাত্রী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পশু-পক্ষী, কোথাও বা মানুষ। কাজেই কাহিনীগুলিও কোথাও জন্তু-কাহিনী, কোথাও বা মানব-কাহিনী। জন্তু-কাহিনীর নায়ক-নায়িকা সিংহ, হস্তী, বানর, শৃগাল, কুকুর, মার্জার, মূষিক, সর্প, মৎস্য, মশক, মৎকুণ, হংস, বক, কাক, কপোত, ময়ূর, চটক, টিট্টিভ প্রভৃতি। কিন্তু জন্তু বা পক্ষী হলেও তাদের জগৎ মানুষের জগতের মতো সুখে-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, হিংসায়-দাক্ষিণ্যে, কূটনীতিতে ও ক্ষেম-নীতিতে পূর্ণ। কোন কোন প্রাণী বিশিষ্ট মানবচরিত্রেরই প্রতীক, যেমন, সিংহ মদোৎকট, সর্প কুটিল, শৃগাল-বায়স ধূর্ত, মূষিক চতুর ও গর্দভ মূর্খ।

এই জাতীয় কাহিনীর প্রথম সংস্কৃত সংকলন বহুখ্যাত 'পঞ্চতন্ত্র'। কথিত আছে অমরশক্তি নামক রাজার মূর্খ পুত্রদের শিক্ষার জন্য বিষ্ণুশর্মা নামে একজন নির্লোভ ব্রাহ্মণ এই পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের কল্পনা করেছিলেন। মিত্রভেদ, মিত্রসম্প্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ ও অপরীক্ষিতকারক—এই পাঁচটি তন্ত্রে (বিষয়ে) গ্রন্থখানি বিভক্ত, এইজন্য এর নাম পঞ্চতন্ত্র। এরই প্রথম তন্ত্রের প্রথম কাহিনী বহুবিখ্যাত করটক-দমনক-কথা। তা ছাড়া বিভিন্ন তন্ত্রে অসংখ্য প্রাণী-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—তাদের ভিতর নীলবর্ণ শৃগালের কথা, টিট্টিভ দম্পতির কাহিনী, শশ-কপিঞ্জল, লম্বকর্ণ গর্দভের কাহিনীগুলি সকলেরই পরিচিত। পঞ্চতন্ত্রের মানবকাহিনীগুলিও চিত্তরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ। এদের মধ্যে কৌলিক-রথকার, ব্রাহ্মণ-নকুল-কৃষ্ণসর্প, ব্রহ্ম-রাক্ষস ও চোর, এবং যোগী ভৈরবানন্দ ও কুমার চতুষ্টয়ের কাহিনীগুলি খুবই বিখ্যাত।

পঞ্চতন্ত্রের কথা নানাভাষায় অনূদিত হয়েছে। আরবী-ফারসী ভাষার মাধ্যমে গল্পগুলি সুদূর ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছিল বলে পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন। এই পঞ্চতন্ত্রেরই বঙ্গদেশীয় সংস্করণ 'হিতোপদেশ'। সংকলয়িতার নাম নারায়ণ। হিতোপদেশে দাক্ষিণাত্যের পটভূমি ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে অপসারিত হয়েছে। এখানে রাজার নাম ভাগীরথী তীরবর্তী পাটলিপুত্র নামধেয় নগরের রাজা সুদর্শন। হিতোপদেশ চার খণ্ডে বিভক্ত : মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। এখানে সিংহলরাজপুত্র জীমূতকেতুর কাহিনী, সুন্দ-উপসুন্দ এবং বীরবরের কাহিনীগুলি নূতন যোজনা। হিতোপদেশে নীতিপ্রচারের উগ্রতাও লক্ষণীয়।

কথাসাহিত্যের আর এক দিক 'রম্যকথা'। এগুলি মানবজীবনাশ্রিত অদ্ভুত সৌন্দর্যকল্পনায় মিশ্রিত অপূর্ব রস-কাহিনী। এগুলির মূলে হয়তো ইতিহাসের

ক্ষীণ স্মৃতিও আছে, কিন্তু সে স্মৃতি এত ক্ষীণ, এত কল্পনারঞ্জিত যে ইতিহাস সেখানে কল্পলোকের সামগ্রী। 'রম্যকথা'য় রূপকথার আমেজ ও পরিবেশ। অথচ এগুলি জীবন-রসেও উচ্ছল। খুব সম্ভব এই ধরনের কথার আদি কথক গুণাঢ্য। কিন্তু গুণাঢ্যের রচনা লুপ্ত। ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' এবং সোম-দেবের 'কথাসরিৎসাগর' গুণাঢ্যের পরিচয় আজও বহন করছে।

'বেতালপঞ্চবিংশতি' রম্যকথার একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। এর রচয়িতা শিবদাস। এ গ্রন্থের নায়ক রাজা বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী রাজাকে নিহত করার উদ্দেশ্যে এক ষড়যন্ত্র করে। রাজা শিংসপাবৃক্ষলগ্ন এক বেতালের মুখ থেকে এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন এবং যোগীকে নিহত করেন। বেতাল রাজাকে পঁচিশটি কাহিনী বলেছিল, তাই গ্রন্থের নাম বেতালপঞ্চবিংশতি। বেতালপঞ্চবিংশতির গল্পগুলি মানুষের সাধুতা, দয়া, বিনয়, বীরত্ব, অসাধুতা ও লাম্পট্যের বর্ণনায় মুখর।

'দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা' এই ধরনের আর একটি কথাগ্রন্থ। ধারারাজ্যের নরপতি ভোজ ভূগর্ভ খনন করে একটি সিংহাসন লাভ করেন। এই সিংহাসন বত্রিশটি পুতুল দিয়ে সাজানো। রাজা ভোজ এই সিংহাসনে বসার উদ্যোগ করলে পুতুলগুলি সবাক হয়ে তাঁকে রাজা বিক্রমাদিত্যের দয়া, বীরত্ব, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ সম্পর্কে এক একটি গল্প বিবৃত করে বলে, ভোজরাজের যদি এই গুণ থাকে তাহলেই তিনি বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসতে পারেন। বত্রিশটি পুতুলের কাহিনী—তাই গ্রন্থের নাম দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা।

এ ছাড়া চিন্তামণি ভট্ট প্রণীত 'শুকসপ্ততি'ও বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে শুক পাখির মুখে ৭০টি গল্প বিবৃত হয়েছে। রম্যকথা হিসাবে 'ভোজ প্রবন্ধে'র নামও উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্যের বিশ্বকোষ সোমদেব প্রণীত 'কথাসরিৎসাগর', —এই গ্রন্থখানি সত্যই যেন কথার সাগর। এই সরিৎ-সাগর আঠারটি লম্বকে বিভক্ত : লম্বকগুলির আবার অনেকগুলি করে তরঙ্গ। কথা-কোবিদ্ সোমদেব পূর্ব-প্রচলিত প্রায় সমস্ত কথাকেই এই সাগরে এনে মিলিয়েছেন। এতে যেমন আছে গুণাঢ্যের জীবন-কাহিনী, তাঁর কাব্য রচনার মনোজ্ঞ ইতিহাস এবং তৎকৃত উদয়ন-নরবাহনদত্তের গল্প—তেমনি এরই ভিতর গ্রথিত হয়েছে জাতক, পঞ্চতন্ত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি ও দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার কাহিনী। কথা-

সরিৎসাগর সত্যই ভারতীয় রম্যকথার রত্ন সাগর।

এ পর্যন্ত ভারতীয় কথাসাহিত্যের যে ইতিহাস বিবৃত হলো, তাতে 'কথা-রস'ই প্রধান স্থান অধিকার করে আছে, তাতে 'কথার রস' (শিল্পিত বাগ্‌-ভঙ্গি) খুব বেশি নেই। গল্পগুলি বিবৃতিপ্রধান। মাঝে সরস শ্লোকে সূক্তি বা সুভাষিত করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সে সকল সূক্তিতে জ্ঞানের গভীরতা আছে, অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য আছে, লোক-চরিত্রের সুগভীর বিশ্লেষণ আছে, দূরদৃষ্টির স্বাক্ষর আছে—কিন্তু বাক্-চাতুর্য যা একটি রচনাকে রচনা-সাহিত্যে উন্নীত করে, তার প্রকাশ নেই। উক্তি-চাতুর্যের কিছুটা নিদর্শন আছে প্রাকৃতে-অপভ্রংশে রচিত জৈন 'কথা' কাব্যগুলির ভিতর। তাদের মধ্যে কোন কোনটি রচনাগৌরবে কাব্য বা মহাকাব্যের পর্যায়ভুক্ত, যেমন হরিভদ্র সূরীর 'সমরাইচ্চ কহা', কিংবা ধনপালের 'ভবিসত্ত কহা'। সংস্কৃতে কথার এই শিল্পিত রূপের পরিচয় তিনটি গদ্যকাব্যে—দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' এবং বাণভট্টের 'কাদম্বরী'। এই কথাকাব্যগুলির বিষয়বস্তু হয়তো পূর্বপ্রচলিত কোন লোককথা থেকেই সংগৃহীত, কিন্তু রচনাচাতুর্য ও চিত্রাঙ্কন দক্ষতায় এই কথা-কাব্যগুলি কথার শিল্পিত রূপের অমর কীর্তিস্তম্ভ। এ যেন সযত্নপোষিত উদ্যানলতা। বনলতার স্বভাবসৌন্দর্য না থাকলেও কবিকর্মের সুকঠিন দীপ্তিতে এগুলি সমুজ্জ্বল।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

প্লট : অধিকাংশ উপন্যাস-পাঠক উপন্যাস পাঠ করেন প্রধানত কাহিনীর আকর্ষণে। তাই উপন্যাসে কাহিনী-রচনার একটি বিশিষ্ট শিল্পমূল্য আছে। গল্প এবং উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত বা প্লটের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। গল্প হচ্ছে যথোপযুক্ত কাল-পারম্পর্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবৃতি। প্লটও ঘটনাবলীর বিবৃতি, কিন্তু কার্যকারণের প্রবণতা সেখানে সমধিক। আবার প্লটের মধ্যে রহস্য থাকতে পারে। ফর্স্টার এই পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। 'রাজা মারা গেলেন, তারপর রানী মারা গেলেন'—একে বলা যাবে গল্প। কিন্তু, 'রাজা মারা গেলেন, তারপর সেই দুঃখে রানীর মৃত্যু হলো'—এরই নাম প্লট। অর্থাৎ প্লটে কাল-পারম্পর্য বিদ্যমান বটে, কিন্তু তাকে অতিক্রম করে প্রাধান্য পেয়েছে কার্যকারণবোধ। আর যদি বলা হয়—'রানী মারা গেলেন, কেউ জানত না তাঁর মৃত্যুর কারণ ; অবশেষে জানা গেল যে রাজার মৃত্যুশোকই তাঁর

মৃত্যুর কারণ'—তাহলে প্লটের মধ্যে এল রহস্যের ছায়া। এই কাহিনীকে এখন বিচিত্রমুখী করা সম্ভব। কালপারম্পর্যের প্রাধান্য এখানে গৌণ হয়ে গেল, সীমা লঙ্ঘন না করে যতদূর পর্যন্ত কাহিনীর বিস্তার সম্ভব, এই রহস্যের বাতাবরণে তা কার্যকরী হলো। রানীর মৃত্যুর ঘটনাটি যখন গল্পের মধ্যে বিন্যস্ত করা গেল তখন শুধুমাত্র আমাদের কৌতূহলটুকু জাগ্রত হয়—'তারপর?' প্লটের মধ্যে ঘটে থাকলে বলে থাকি—'কেন?' গল্পের দাবি কালানুক্রমে সাজানো ঘটনাস্রোতের প্রতি শ্রোতার কৌতূহলটুকু, কিন্তু প্লটের দাবি শ্রোতার বুদ্ধির কাছে এবং ঘটনার সঙ্গে ঘটনার কার্যকারণগত যোগটি মনে রাখার সামর্থ্যের উপর।

প্লটের মধ্যে রহস্যের দ্যোতনা একদিকে যেমন প্লটের গঠনশৈলীকে বিচিত্র সম্ভাবনার দিকে চালিত করতে পারে, অন্যদিকে প্লটের বৈশিষ্ট্য থেকে উপন্যাসকে বঞ্চিত করতে পারে। প্রথমত, প্লট শব্দটির 'ষড়যন্ত্র' বা 'গূঢ় অভিসন্ধি' জাতীয় অভিধানগত অর্থ অনেক সময় ঔপন্যাসিকের অবচেতন মনে প্লট সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। ঠিক এই কারণেই জর্জ এলিয়ট উপন্যাস রচনার পক্ষে প্লটকে 'স্থূল বাধ্যবাধকতা' বলে মনে করেছেন। এণ্টনি ট্রোলপ প্লট আর চমকপ্রদ ঘটনা অভিন্ন মনে করে প্লটকে উপন্যাস রচনার একটি নিকৃষ্ট মাধ্যম বলে মন্তব্য করেছেন। দ্বিতীয়ত, প্লটের মধ্যে রহস্যের দ্যোতনা সৃষ্টি করার জটিল ও নিগূঢ় শিল্প-প্রক্রিয়াটি অনেক সময় অক্ষম ঔপন্যাসিকের হাতে শুধুমাত্র পাঠকের মনে উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা সৃষ্টির নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। অনেকসময় ঘটনার গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং পরে একসময় তা উদ্ঘাটন করে, (এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আকস্মিকতার নামান্তর মাত্র) এঁরা কাহিনীর মধ্যে একজাতীয় রহস্য সৃষ্টি করার ভান করেন। ফলে অহেতুক এবং অবাঞ্ছিত ঘটনার ধূম্রজালে প্লটের যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

প্লটের স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে ফোর্ড ম্যাডক্স ফোর্ড 'অনিবার্যতা' উপন্যাসের প্লটের একমাত্র শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত ফোর্ডের এই সংজ্ঞার মধ্যে প্লটের যথার্থ প্রকৃতি পরিস্ফুট—অর্থাৎ উপন্যাসের প্লট নিছক কালপারম্পর্যের ক্রীড়নকমাত্র নয়, আকস্মিকতার চমকসৃষ্টি নয়; বরং প্লট যে কার্যকারণবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত তা 'অনিবার্যতা' এই অভিধাটির মধ্যে যথাযথ প্রতিফলিত। উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসে যে কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি যে সেই মুহূর্তে বর্ণিত চরিত্রের পক্ষে একমাত্র ও অনিবার্য কৃত্য—এ ছাড়া 'নান্যঃ পন্থাঃ', এই আভাস

সৃষ্টি করাই প্লট-রচনায় ঔপন্যাসিকের কাছে মূল সমস্যা।

উপন্যাসের প্লটের মধ্যে কোন ফাঁক বা অসংগতি থাকবে না, কাহিনীর প্রতিটি অংশে থাকবে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য, কাহিনীর বিভিন্ন ঘটনাংশ পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকবে। এই চরিত্র-লক্ষণগুলিই প্লটের অনিবার্যতার দ্যোতক।

অনিবার্যতার মানদণ্ডে প্লটের গঠনকৌশল বিচার করলে উপন্যাসের কাহিনীকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়: শিথিল-গঠন এবং দৃঢ়পিনদ্ধ-গঠন। যে-উপন্যাসের গঠন শিথিল সেখানে কয়েকটি প্রায়-বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমবায়ে কাহিনী গঠিত হয়, তাদের মধ্যে কার্যকারণের বা যুক্তিগ্রাহ্য যোগসূত্র প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে। উপন্যাসে বর্ণনার ঐক্য কাহিনীর স্বাভাবিক বিকাশধারায় নিহিত থাকে না, পরন্তু নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে বিকশিত করে তোলার তাগিদে বিভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, পরিস্থিতি বা দৃশ্যের অবতারণা করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনার বা পরিস্থিতির স্বতন্ত্র সৌন্দর্য থাকলেও প্লটের সামগ্রিক আবেদনের ভিত্তিতে এদের মূল্য অনিবার্য নয়। অন্যদিকে দৃঢ়পিনদ্ধ গঠনশৈলীর মধ্যে আমন্ত্রিত বিভিন্ন দৃশ্য, ঘটনা বা পরিস্থিতির কোন নিজস্ব মূল্য থাকে না—এরা মূলকাহিনীর বিকাশের সহায়ক।

বলাই বাহুল্য শিথিল-গঠন-বিশিষ্ট উপন্যাসে স্বরূপত প্লট অনুপস্থিত এবং দৃঢ়পিনদ্ধ-গঠনবিশিষ্ট উপন্যাসেই প্লটের যথার্থ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু উপন্যাসের কায়া-গঠনে শিথিল ও দৃঢ়পিনদ্ধ—এই বিভাজন আপেক্ষিক ও অধিক্রমণ-প্রবণতাযুক্ত। কারণ, প্রথমত, কার্যক্ষেত্রে প্রায়শই দেখা যায় যে অনেক উপন্যাসে যেখানে কাহিনীর গঠনকৌশল দৃঢ়পিনদ্ধ অর্থাৎ যে উপন্যাসে যথার্থ প্লট বিদ্যমান, সেখানেও এমন কিছু দৃশ্য বা চরিত্র বা ঘটনা বিদ্যমান থাকতে পারে যা উপন্যাসের মূল কাঠামো বা প্লটের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় বা অন্বিত নয়, অথচ সামগ্রিক বিচারে তা মূল কাহিনীর সৌন্দর্য বিবর্ধক। অন্যদিকে শিথিল-গঠনের উপন্যাসে (লুজ প্লট) এমন অনেক দৃশ্য বা পরিস্থিতি থাকতে পারে যা প্লট-লক্ষণাক্রান্ত। দ্বিতীয়ত, শিথিলগঠন ও দৃঢ়-পিনদ্ধ গঠনশৈলীর মাঝখানে এমন অনেক উপন্যাস থাকতে পারে, এবং থাকাটাই স্বাভাবিক, যাদের কোন সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় না। দুই প্রান্তসীমার মধ্যবর্তী স্থানে থাকার ফলে শিথিল এবং দৃঢ়পিনদ্ধ—এই উভয়

শ্রেণীর লক্ষণ এই জাতীয় উপন্যাসে বিদ্যমান। সংখ্যার দিক দিয়ে এই শ্রেণীর উপন্যাসই সমধিক।

অবশ্য একটি সুগঠিত দৃঢ়পিনদ্ধ (অরগানিক) প্লট সম্বলিত উপন্যাসও সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। এ জাতীয় উপন্যাসের প্লট রচনা এমন যান্ত্রিকভাবে বিন্যস্ত হতে পারে যার ফলে রচয়িতার চাতুর্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে, রচয়িতার কৃত্রিম প্রযত্নটুকু পাঠকের মনকে বিরূপ করে তোলে। অনেক সময় প্লটকে দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ দিতে গিয়ে রচয়িতার পক্ষে প্রতিটি ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তিগ্রাহ্য উপস্থাপনা সম্ভবপর নাও হতে পারে, এবং কাহিনী বিন্যাসের এই ছিদ্রপথটি দিয়ে আকস্মিকতার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। যদিও ঐ জাতীয় রচনার সমর্থনে এই যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে জীবনে বহু আকস্মিকতা আছে, এবং উপন্যাস যেহেতু জীবনেরই ভাষ্য, সুতরাং সেখানেও আকস্মিকতা থাকবে তাতে বিস্ময়ের কি আছে। কিন্তু জীবনে আকস্মিকতা থাকলেও, উপন্যাস যেহেতু একটি শিল্প তাই এখানে আকস্মিকতা বাঞ্ছনীয় নয়। এই কারণে উপন্যাসের প্লটের কাছে স্বাভাবিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার দাবি করা হয়ে থাকে।

উপন্যাসের দৃঢ়পিনদ্ধ প্লটের গঠনশৈলীকে সূক্ষ্মবিচারে তাই দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সাহিত্যের পরিভাষার পরিবর্তে স্থাপত্যের পরিভাষা এই বিভাগটি বোঝার পক্ষে অধিকতর সহায়ক। গ্রীক গঠনশৈলী এবং গথিক গঠনশৈলী —উভয়ক্ষেত্রেই গঠনশৈলী দৃঢ়পিনদ্ধ। তবে গ্রীক গঠনশৈলীর মধ্যে গঠন-গত সুষমা ছাড়াও সমগ্রের সঙ্গে অংশের সুসামঞ্জস্য বিদ্যমান। সেখানে অংশকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভবপর নয়, এবং তা করতে গেলে সমগ্রের অঙ্গহানি ঘটে। অন্যদিকে গথিক গঠনশৈলীর মধ্যে অবয়বগত এতখানি নির্ভরতা নেই, সেখানে এমন কিছু কিছু অংশ থাকতে পারে যা সমগ্রের পক্ষে সৌন্দর্য-বিবৃদ্ধিকারী, কিন্তু সমগ্র থেকে অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করলে সমগ্রের অঙ্গহানি ঘটে না। একটি দৃঢ়-পিনদ্ধ প্লটের মধ্যে যেখানে প্রতিটি দৃশ্য, ঘটনা, পরিস্থিতি মূলকাহিনীর পরি-পোষক ও মূলকাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত তাকে আমরা গ্রীক স্থাপত্যের সঙ্গে উপমিত করতে পারি। এবং দৃঢ়পিনদ্ধ প্লটের মধ্যে এমন দুএকটি দৃশ্য, চরিত্র, ঘটনা বা পরিস্থিতি থাকতে পারে যা মূলকাহিনীর সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ক, কিন্তু মূলকাহিনী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে মূলকাহিনীর কোন অঙ্গহানি

হবে না—সে জাতীয় দৃঢ়পিনদ্ধ প্লটকে গথিক স্থাপত্যের সঙ্গে উপমিত করা যেতে পারে।

ঐক্যের দিক দিয়ে বিচার করলে প্লটকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—সরল এবং যৌগিক। একটি সরল প্লটে একটিমাত্র কাহিনীই বিবৃত হবে। কিন্তু যৌগিক প্লটে, দুই বা ততোধিক কাহিনী উপস্থাপিত হতে পারে; তার মধ্যে একটি প্রধান, অন্যটি বা অন্যগুলি অপ্রধান কাহিনী। সেখানে অপ্রধান কাহিনীকে স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে মূলকাহিনীর সঙ্গে সমান্তরাল বা বৈপরীত্য-মূলকভাবে শেষপর্যন্ত একটিমাত্র কাহিনী-ঐক্যে বিধৃত হতে হবে। মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত এই জাতীয় অপ্রধান কাহিনীকে উপকাহিনী বলে (দ্র, উপকাহিনী)।

উপস্থাপনা পদ্ধতির দিক দিয়ে বিচার করলে প্লটের গঠনশৈলীকে দুভাবে দেখা যেতে পারে—Panoramic এবং Scenic। বিভাগদুটি পরস্পর অধি-ক্রমণপ্রবণতাযুক্ত; তবুও প্লটের গঠনকৌশল বোঝার পক্ষে স্পষ্ট, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্যানরামিক প্লটের গঠনকৌশল শিথিল বিন্যস্ত, একটি মাত্র সূত্রে কেন্দ্রীভূত নয়। ঘটনাগুলি চরিত্রের স্বভাব ও পরিস্থিতির সঙ্গে আংশিক-ভাবে কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত। কাহিনী উপসংহারে একটি সুস্পষ্ট সমাধানে উপনীত হয় না, বরং উপসংহারে কাহিনীর গতিবেগ মৃদু হয়ে যাওয়ায় বা ক্রম-ক্ষীয়মাণ অবস্থায় যবনিকাপাত ঘটে। সংক্ষেপে, প্যানরামিক প্লট সীনিক্ প্লটের মত অনিবার্য, যুক্তিগ্রাহ্য এবং নাটকীয় নয়। এখানে চরিত্রের সংখ্যা বহু, তাদের মধ্যে অধিকাংশ চরিত্রই ব্যক্তিস্বভাববর্জিত টাইপধর্মী, ঘটনানিয়ন্ত্রণে কোন একটি বিশিষ্ট চরিত্রের ভূমিকা নগণ্য। অন্যদিকে সীনিক্ প্লটে একটিমাত্র সূত্রের দিকে উপন্যাসের বিন্যাস কেন্দ্রীভূত। উপন্যাসের সূত্রপাতে ঘটনা ও চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে যে সমস্যার বীজ উপ্ত হয় তা উপসংহারে একটি অনিবার্য পরিণাম-রমণীয়তায় প্রশান্তি লাভ করে। সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে এই জাতীয় প্লট যে উৎকণ্ঠাকে জাগিয়ে রাখে তা শেষপর্যন্ত একটি অনিবার্য পরিণামমুখী হয়। ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক সীনিক্ প্লটে দৃঢ়পিনদ্ধভাবে বিদ্যমান থাকে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই জাতীয় প্লটে ঘটনা, চরিত্র, পরিস্থিতি ইত্যাদির সমাবেশে একটি তাৎক্ষণিক মূল্য ও দ্রুততা লক্ষ্য করা যায়। জীবনের কোন একটি বিশেষ প্রবণতার দিকে আলোকপাত করার তাগিদে ঔপন্যাসিক এই জাতীয় প্লট নির্বাচন

করেন, ফলে জীবনের নানা বিস্তৃত দিকগুলি এই প্লটে বর্জন করা হয়। কিন্তু প্যানরামিক প্লটে যেহেতু জীবনের বহু বিস্তৃত দিক আমন্ত্রিত তাই তার পটভূমি অনুরূপ বিস্তৃত। সীনিক্ প্লটে পটভূমি তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত। মহাকাব্যধর্মী উপন্যাসের প্লটের গঠনশৈলী প্যানরামিক এবং নাটকীয় উপন্যাসের প্লটের গঠনশৈলী সীনিক্।

প্লটের গঠনশৈলীতে স্থান এবং কালের প্রভাব সমধিক। স্থান, কাল এবং পাত্রের ত্রি-স্তর ভূমিতে ঘটনার অবস্থান। উপন্যাসের কাহিনীর উপর একদিকে যেমন চরিত্র প্রভাব বিস্তার করে, অন্যদিকে কাহিনী কালে বিবর্তিত, স্থানে ব্যাপ্ত। স্থান এবং কালের আপেক্ষিক সামঞ্জস্যের উপর প্লটের গঠনশৈলী নির্ভরশীল। অধিকাংশ উপন্যাসে স্থান এবং কালের যথাক্রমে প্রসার ও বিবর্তন—এই দুই প্রচলিত ধর্ম নিয়ে প্লট রচিত হয়। কিন্তু অতি-আধুনিক উপন্যাসে স্থান ও কালের ভিন্ন ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সেখানে স্থান এবং কাল কখনও স্থাণু বা নিশ্চল, কখনও ব্যাপ্ত বা অসীম, কখনও একটি স্থাণু বা নিশ্চল অন্যটি ব্যাপ্ত বা অসীম। এ সমস্ত ক্ষেত্রে উপন্যাসের প্লট পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে বিদ্যমান। তবে অধিকাংশ উপন্যাসে, যেখানে স্থান এবং কালের যথাক্রমে প্রসার ও বিবর্তন ধর্ম ব্যবহৃত, সেখানে প্লটের গঠনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সাধারণত দেখা যায় যে, যেখানে স্থানগত ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত কম, কালগত বিবর্তনের প্রাধান্য—সেখানে উপন্যাসের প্লট অপেক্ষাকৃত দৃঢ়পিনদ্ধ। আবার যেখানে কালগত বিবর্তন প্রাধান্য না পেয়ে স্থানগত ব্যাপ্তিই প্রাধান্য পায়, সেখানে প্লটের গঠন অপেক্ষাকৃত শিথিল। সংক্ষেপে যে উপন্যাসে কালের ভূমিকা বেশি সেখানের দৃঢ়পিনদ্ধ প্লট এবং যেখানে স্থানের ভূমিকা বেশি সেখানে শিথিল প্লটের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বলাবাহুল্য এই সূত্রটি আপেক্ষিক এবং পরস্পর অধিক্রমণশীল, সুতরাং এর ব্যতিক্রমও প্রচুর দেখা যায়।

বিন্যাসপদ্ধতির দিক দিয়ে উপন্যাসের প্লটকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—বৃত্তাকার, পদ্মাকার, হর্ম্যাকার। বৃত্তাকার প্লটে আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত কাহিনীতে একটি কেন্দ্রীয় বীজ থাকে—তা বিশেষ কোন ঘটনার বা সমস্যার। ঐ বীজটির ক্রমবিকাশ ও পরিণতির একটি পূর্ণায়ত বলয় প্লটকে একটি বিশিষ্ট বিন্যাসে বদ্ধ করে। বৃত্তাকার প্লটে ঘটনাসজ্জার দিকে লেখকের থাকে স্বতন্ত্র দৃষ্টি—তাই এখানে প্লট-হয় দৃঢ়পিনদ্ধ। যে সমস্যা দিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত তা

একটি যুক্তিগ্রাহ্য ও অনিবার্য স্পষ্টরেখ সমাপ্তির দিকে কাহিনীকে অগ্রসর-তৎপর করে তোলে। এই জাতীয় বৃত্তাকার কাহিনী বিন্যাসের মধ্যে নাটকীয় ঐক্য বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটির প্লট বৃত্তাকার। দ্বিতীয়ত, পন্থাকার প্লটের গঠনশৈলী অপেক্ষাকৃত শিথিল, সেখানে জীবনের টুকরো টুকরো ছবি একটি ভাবদৃষ্টি ও কয়েকটি চরিত্রের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়। কখনও সমাজজীবনের বিচিত্র রূপ, কখনও বা ব্যক্তিমানুষের জীবনপরিক্রমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রথিত হয়ে উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্লট রচনা এই জাতীয় পন্থাকার। তৃতীয়ত, হর্ম্যাকার প্লটের গঠনশৈলী জটিল প্রকৃতির। এখানে পটভূমিকা সাধারণত বিস্তৃত ; বিচিত্র ও বহু চরিত্রের আনাগোনা ; মূলকাহিনীর সঙ্গে একটি বা দুটি উপকাহিনীর সংযোগ ; নানা ঘটনা, দৃশ্য ও পরিস্থিতির সমাবেশে একটি বিচিত্র ঐকতানের সৃষ্টি করে। এ জাতীয় প্লটের গঠনশৈলী একদিকে যেমন দৃঢ়পিনদ্ধ, অন্যদিকে তেমনই শিথিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসটির প্লট এই জাতীয় হর্ম্যাকার।

একটি সুগঠিত উপন্যাসে কাহিনী এবং চরিত্রের সম্পর্ক হর-পার্বতীর ন্যায় পরস্পর অন্বিত ও পরস্পরনির্ভর। লেখকের মনে এ দুয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যুগপৎ উদ্ভাসিত। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে একটিমাত্র ঘটনা বা চরিত্র বা পরিস্থিতি অবলম্বন করে লেখক তাঁর উপন্যাসের প্লট-রচনা শুরু করেন এবং ক্রমশ তার প্লট একটি সামগ্রিক রূপ লাভ করে। উপন্যাসের প্লট-রচনার এরকম নানা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন রবার্ট লিডেল্। প্রথমত, একটি পরিস্থিতির বিস্তার। ঔপন্যাসিক অনেকসময় জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে বা কারো কাছে শোনা কোন গল্পের মধ্য থেকে একটিমাত্র পরিস্থিতি নির্বাচন করেন, এবং, অতঃপর সেই পরিস্থিতির বিস্তারের মাধ্যমে তিনি উপন্যাসের প্লট রচনা করেন। দ্বিতীয়ত, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র সাধনের মাধ্যমে উপন্যাসের প্লট নির্মাণ। ঔপন্যাসিক অনেকসময় জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অথবা কারো কাছে শোনা কোন গল্পের মধ্য থেকে দুটি বা ততোধিক ঘটনা গ্রহণ ক'রে—একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণে সেগুলিকে একইসঙ্গে গ্রথিত ক'রে তাঁর উপন্যাসের প্লট রচনা করেন। তৃতীয়ত, একটিমাত্র ঘটনা থেকে অবরোহ-ন্যায় অনুসরণ করে লেখক একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং অতঃপর সেই সিদ্ধান্ত-

একটি উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণের প্রেরণা স্বরূপ কাজ করে। চতুর্থত, পূর্ব-নির্ধারিত কোন কাহিনীর ছক অনুসরণ ক'রে অনেকসময় ঔপন্যাসিক তাঁর প্লট রচনা করেন। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক প্রধানত চরিত্রসৃষ্টির প্রতি আগ্রহী। পূর্বনির্ধারিত কোন কাহিনীর মধ্যে চরিত্রসৃষ্টিতে সামান্য অদলবদল ক'রে ঔপন্যাসিক একটি নতুন কাহিনীর জন্মদান করেন। অধিকাংশ মধ্যমশ্রেণীর ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনীগুলির জন্মরহস্য এই। অনেক ঔপন্যাসিক পূর্বনির্ধারিত কোন গল্পের সন্ধানে সাহিত্যের ক্ষেত্র ছেড়ে অন্যত্র অনুসন্ধান করেন। অলডাস হাক্সলি ভাবী ঔপন্যাসিকদের একজোড়া বিড়াল-দম্পতির জীবন-কাহিনীকে মানবিক দৃষ্টিতে বিন্যস্ত করে প্লট রচনার উপদেশ দিয়েছেন। অনেকে দাবা খেলার ঘুঁটি-চালনার ছকে উপন্যাসের প্লট রচনা করেন (যেমন, মেরিডিথ তাঁর *The Egoist* উপন্যাসে)। অনেকে প্রাচীন কোন কাহিনীর ছকে (রামায়ণ, মহাভারত বা কোন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য) তাঁর উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেন। আগেই বলা হয়েছে, এ জাতীয় উপন্যাসে লেখকের আগ্রহ প্রধানত চরিত্রসৃষ্টির দিকে নিবদ্ধ থাকে। ফলে কোন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকের হাতে পড়লে এই জাতীয় পূর্বনির্ধারিত কোন গল্প-কাহিনী চরিত্রসৃষ্টির বৈচিত্র্যের মাধ্যমে পাঠকের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে, এবং পাঠক তখন সহজেই পূর্বনির্ধারিত ছকের কথা অবহেলা করতে পারে।

যথার্থ উপন্যাসের প্লট বিকশিত হয়ে ওঠে, লেখকের তৈরি কোন কৃত্রিম-নির্মাণকৌশলমাত্র নয়। বস্তুত লেখকের উপলব্ধির আন্তরিকতার গুণেই এটি সম্ভব। একটি পরিস্থিতির সম্প্রসারণে হোক, বা কয়েকটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনেই হোক, বা কোন ঘটনার সিদ্ধান্ত অনুসরণেই হোক, বা কোন পূর্ব-নির্ধারিত গল্প-কাহিনীর ছকেই হোক—যেভাবেই ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের কাহিনী রচনা করুন না কেন শেষপর্যন্ত কাহিনীটি যেন কোন কৃত্রিম কৌশলের দৃষ্টান্তমাত্র না হয়, একটি বিকশিত সজীব সত্তায় রূপায়িত হয়ে ওঠে —প্লটের যথার্থ দাবি এখানেই।

শ্যামাপ্রসাদ সরদার

প্লট ও থীম্ : গল্প-উপন্যাসের মধ্যে দুটো শ্রেণী আছে : একটা প্লটের গল্প, আর-একটাকে বলা যাক রচনা। যাকে রচনা বলছি তার অবলম্বন প্লট নয়, বক্তব্য, ইংরেজিতে যাকে বলে থীম্। প্লট আর থীম্-এর প্রভেদ বোঝাতে গিয়ে

একজন ইংরেজ সমালোচক সুন্দর বলেছেন যে প্লটের কখনো পুনরাবৃত্তি হতে পারে না, কিন্তু একই থীম্ থেকে এমন বহু ও বহুবিধ রচনার উদ্ভব হতে পারে, প্রত্যেকটিই যার নূতন ও স্বতন্ত্র। একটি প্লট একবারই জন্মায়—আর যখন তার মৃত্যু হয়, সে-মৃত্যু চিরকালের। অবশ্য অধিকাংশ প্লটই জন্মায় না, তাকে বানিয়ে তোলা হয়, আর এই বানিয়ে-তোলা প্রচেষ্টার অন্ত্যজ পল্লীতেই আধুনিক রোমাঞ্চিকার বাসা। প্লট নির্বীজ, একান্তরূপে নিজের মধ্যেই আবদ্ধ; এক-একটি গোয়েন্দা গল্প ঠিক একবার তৈরি হয়েই শেষ হয়ে গেল, আবার লিখতে হলে আর-একরকম ক'রে দাবার ছক সাজাতে হবে, পূর্বরচিত সকল স্বজাতি থেকে তা যে ভিন্ন, এ ছাড়া আর কোনো পরিচয়পত্র দরকার করে না। এ-ধরনের গল্প, তাই, লেখকের ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, মগজের কারখানায় একটি চমকপ্রদ ঘটনাশৃঙ্খল নির্মাণ করতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হলো—কে লিখলো, কেমন ক'রে লিখলো, তাতে বেশি কিছু এসে যায় না; নিজে ব'সে-ব'সে লিখতে ইচ্ছে না-করলে কিংবা গল্প-গোগ্রাসী পাঠকের জঠরাগ্নি দুর্নিবার হলে, অন্য কাউকে দিয়েও অনায়াসেই লিখিয়ে নেওয়া যায়—এড্গার ওয়ালেস্ শেষের দিকে সত্যিই নাকি তা-ই করতেন। বলাবাহুল্য, প্লটনির্ভর গল্প বাসাবদল করতে পারে মগজের কারখানা-ঘর থেকে মনের মিনারে, রোমাঞ্চ থেকে রোমান্সে, রোমান্স থেকে বাস্তবতায়; কিন্তু উচ্চতম গ্রামে আরোহণ করলেও স্বভাবের বদল হয় না তার, যেটুকু দেবার একবারেই ফুরিয়ে ফেলে সে, দুটি গল্পের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য ধরা পড়লেই পরবর্তীর বিষয়ে পরস্বাপহরণের সন্দেহ জেগে ওঠে। বস্তুত, সাহিত্যরচনার এটিই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে কুম্ভীলকবৃত্তির প্রশ্ন অবান্তর নয়। (উদাহরণত, 'The Suicide Club' গল্পটি মোপাসাঁ আগে লিখেছিলেন, না রবার্ট লুইস স্টিভেনসন, এ প্রশ্নের কোনো মীমাংসা হয়নি, কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে একজনের বিষয়ে সন্দিহান না-হয়ে উপায় থাকে না। অথচ জেম্স জয়স-এর 'The Dead' আর ক্যাথারিন ম্যান্সফীল্ড-এর 'The Stranger'-এর বিষয়-বস্তু মূলত এক হলেও দুটিকেই সম্পূর্ণ মৌলিক বলে আমরা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করি।)

পক্ষান্তরে, থীম্ রক্তবীজ-রক্তবান। আদি যুগ থেকে বিশ্বসাহিত্যের নাড়িতে নাড়িতে অফুরন্ত বৈচিত্র্যে প্রবাহিত হয়েও তার সীমা নেই, শেষ নেই। গল্পের গাড়িতে প্লটকে চড়তে দিলে সে নিজেই চালক হয়ে বসবে, কিন্তু বক্তব্যকে বলা

যেতে পারে বাষ্পবেগ, নিজের কোনো দাবি নেই তার ; সে প্রেরণা আনে, কিন্তু পরিচালনার ভার যেখানে থাকা উচিত সেখানেই ছেড়ে দেয়, লেখকের মনস্বিতাকেই বসিয়ে রাখে এঞ্জিন-ঘরে। জলের মতো তার স্বভাব, অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন, চিরানুক্রমিক ; কখনো বলা যাবে না যে এই শেষ আর এই আরম্ভ, অথচ তা নিত্যই নূতন। জলের মতোই পাত্রভেদে তার রূপভেদ ও বর্ণভেদ ; দেশ, কাল ও ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য-অনুপাতে একই বক্তব্যের নব নব বিচ্ছুরণের সম্ভাবনা অসীমেরই সমান্তরাল। মনে করা যাক, শুধু ঈর্ষাকে অবলম্বন ক'রে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে কত অবিস্মরণীয় রচনারই না সৃষ্টি হলো। কিংবা প্রেমের ত্রিকোণ তির্যকের কথা যদি ভাবি, তাহলেও বিস্মিত হতে হয় মানুষের প্রতিভার অন্তহীন অভাবনীয়তায়। এমন পাঠকও হয়তো কেউ আছেন যিনি 'আনা কারেনিনা'র পর 'ঘরে-বাইরে' খুলে মন্তব্য করেন : 'ও, সেই পুরোনো তিন-কোণা প্রেম !' কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক দুর্ভাগাদের বাদ দিলে আশা করি এ-কথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না যে এ-সব ক্ষেত্রে বিষয়টা উপলক্ষ মাত্র, আর এই উপলক্ষের ভিতর দিয়ে লেখকের সেই মনই প্রকাশমান, যে-মন প্রতি ক্ষেত্রেই তুলনাহীন। দেহ ছাড়া মনের প্রকাশ হয় না, অথচ দেহ যেমন মন নয়, তেমনি বক্তব্য-নির্ভর গল্পে কাহিনীর দেহটুকু অপরিহার্য হলেও কাহিনীটাই গল্প নয়। সেইজন্য প্রতিবার যান্ত্রিক অর্থে ভিন্ন হবার দায় তার নেই ; অতীতের, বর্তমানের, ভবিষ্যতের অনেক রচনার সঙ্গেই তার সাদৃশ্যের আভাস স্বতঃসিদ্ধ বলেই সে জানে—এমন রচনার সঙ্গেও, যা লেখকের সম্পূর্ণ অপরিচিত। নূতনত্বের জন্য যান্ত্রিক বুদ্ধির কাছে, উদ্ভাবনী কৌশলের কাছে হাত পাততে তাকে হয় না, কেননা সত্যিকার নূতনত্ব লেখকের মনের অনন্যতারই অনুগামী। পৃথিবীতে আগে কখনো ছিল না এমন জিনিস যন্ত্র ছাড়া কিছু নেই, জৈব পদার্থ মাত্রেরই পূর্ব-ইতিহাস আছে, আর সেই ইতিহাস তার নূতনত্বের অন্তরায় নয়, বরং উপায়। প্লটের গল্প সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করে বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে যান্ত্রিক কৌশল ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় না। এ-ধরনের গল্প তাঁরাই সাধারণত লেখেন, যাঁরা ভাবুক নন, জীবনের ব্যাখ্যাতা নন, অথচ বুদ্ধি যাঁদের দ্রুতগ এবং লেখনী তৎপর। এই শ্রেণীর তিনজন লেখককে একই প্লট নিয়ে যদি লিখতে বলা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই একই গল্পের তিনটি পাঠান্তর পাওয়া যাবে ; তাদের পরস্পরে অদলবদল চলবে, কিংবা সবচেয়ে ভালো লেখাটিকে

বেছে নিয়ে অন্য দুটিকে বিসর্জন দিলেও ক্ষতি হবে না। কিন্তু একই বক্তব্যের প্রেরণায়, মূলত একই কাহিনীর আচ্ছাদনে তিনজন মনস্বী যে-তিনটি রচনার জন্ম দেবেন, তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আপাতপ্রতীয়মান তো হবেই না, উপরন্তু বিচারবুদ্ধির দ্বারা তাদের সম্বন্ধের বিশ্লেষণ সম্ভব হলেও রসগ্রাহী মনের কাছে তাদের স্বাতন্ত্র্য থাকবে অনস্বীকার্য ; এ-কথা কিছুতেই মনে করা যাবে না যে তারা পরস্পরের সার্থকতা অণুপরিমাণও ক্ষুণ্ণ করেছে, যখন যেটি পড়বো তখনই মন বলবে যে এরই তো প্রত্যাশায় ছিলুম এতদিন, এ না-হলে চলতো কী ক'রে। 'ওথেলো' আর 'ক্রয়ৎসার সনাটা'র গল্পাংশ কি মূলত একই নয়, আর রবীন্দ্রনাথ 'জুড দি অবসকিওর' লিখলে 'শেষের রাত্রি' ছাড়া আর কী হতে পারতো ? অথচ এদের একটির খাতিরে অন্যটিকে ছাড়তে পারি না ; এমনকি, একটির সঙ্গে অন্যটির সাদৃশ্যও অনুভব করি না ; চিন্তা করলে দুই লেখকের মনোলোকের ব্যবধানই দুস্তর হয়ে দেখা দেয়। এই শ্রেণীর এক এক লেখকের এক এক জগৎ, আপন পরিমণ্ডলের মধ্যে প্রত্যেকে ভাস্বর হয়ে আছেন, তুলনায় পরস্পরকে হয়তো উজ্জ্বলতর ক'রে তোলেন এঁরা, কিন্তু একজনের 'বদলি' হিসেবে অন্যজনকে কল্পনাও করা যায় না।

শুধু যে পৃথিবীর বিভিন্ন লেখকের হাতে এক গল্প বার-বার ক'রে লেখা হয়েছে তা নয়, এমনও দেখা গিয়েছে যে একই লেখক জীবনের বিভিন্ন সময়ে একই গল্প একাধিকবার লিখেছেন। একটি বক্তব্যে এত কথা থাকে যে অনেক সময় একবার লিখে যেন তৃপ্তি হয় না, নানা দিক থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা রকম ক'রে লিখতে ইচ্ছে করে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'আপদ' আর 'অতিথি' একই গল্প, 'নিশীথে' আর 'মালঞ্চ' এক, আবার 'মালঞ্চ' আর 'দুইবোনে'ও কাহিনীগত প্রভেদ নেই। তবু তো আমাদের মনের উপর এক-একটির প্রভাব এক-এক রকম ; এদের একটি অন্যটিকে বাতিল ক'রে দেয় না, প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রাহ্য মনে হয়। এরা যাত্রা করেছে একই জায়গা থেকে, কিন্তু মনের স্বল্পালোকিত সুড়ঙ্গ-পথে চলতে-চলতে আবিষ্কার করেছে ভাবলোকের বিচিত্র ভূগোল, আলো জ্বলেছে অন্ধকারে, সে-আলোয় যা প্রকাশিত হয়েছে তা বারে-বারেই বিস্ময়কর। এ-ধরনের গল্প প্রতিবারেই নূতন ক'রে জন্ম নেয়, কিন্তু মোপাসাঁ নিজেও 'দি নেকলেস' গল্প দু-বার লিখতে পারতেন না, একবারেই তা ফুরিয়ে গিয়েছে। বস্তুত, বক্তব্যপ্রধান গল্পে কাহিনীর স্থান অনেকটা আমাদের

রাগসংগীতে বোলের মতো ; তাকে না হ'লে চলে না সত্য, কিন্তু ক্ষীণ একটু সূত্র হ'লেই চলে যায়। সে-কাহিনী লেখকের স্বকীয় উদ্ভাবন না-হ'লেও যে কিছু এসে যায় না, এটাই তার তুচ্ছতার পরিমাপ। কাহিনী-কাব্য ও কাব্য-নাট্যের লেখকরা সাধারণত তাঁদের গল্পাংশটুকু আহরণ ক'রে থাকেন পুরাণ, ইতিহাস কিংবা উপকথা থেকে : আর সেইসব পুরাণের স্রষ্টারা, অর্থাৎ আদি-কবিরা, তাঁরাও সম্ভবত তাঁদের সময়ে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীগুলিকেই সংগ্রহ ও সংবদ্ধ ক'রে কাব্যরূপ দিয়েছিলেন। সকলেই জানেন যে ধার করা গল্প নিয়েই শেক্সপিয়র তাঁর বিরাট ব্যবসা ফেঁদেছিলেন, 'শকুন্তলা' বা 'চিত্রাঙ্গদা'র গল্পাংশও মৌলিক নয়। কাহিনী-উদ্ভাবন সাহিত্যের ছোটো তরফের কাজ, সৃষ্টির উচ্চতম স্তরে সেটা অবান্তর বলে মনে হয় ; আধুনিক পাশ্চাত্য গল্প-উপন্যাসেও প্লটের ধারণা কী-রকমভাবে বদলে এবং ভেঙে গিয়েছে, ডস্টয়েভস্কি থেকে কাফ্‌কা পর্যন্ত অনুসরণ করলেই তা উপলব্ধি হয়।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম প্রথম প্লটের গল্পই আমদানি করলেন, এবং রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর অধীন হতে আপত্তি করেননি—আপন স্বাভাবিক উন্মুখতার বৈপরীত্য সত্ত্বেও। যদিও পূর্বজীবনেই 'পোস্টমাস্টার' বা 'একরাত্রি'র মতো তন্ময় গল্প লিখেছিলেন, তবু উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই প্লটের প্রলোভনেই 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে'র অতগুলি পৃষ্ঠা ব্যর্থ হ'লো, 'নৌকাডুবি' সার্থকনামা হ'লো একটু ভিন্ন কারণে। অবশ্য প্লটের উগ্রতাকে তিনি ক্রমশ আপন মানস-রসায়নে নমনীয় ক'রে আনলেন, তার সঙ্গে মেশালেন মনস্তত্ত্ব, কবিত্ব, জীবনদর্শন—'দুরাশা', 'দৃষ্টিদান', 'গুপ্তধন' এর সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্লটের চাতুর্যের সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক মনস্বিতার দৈবাৎ যেমন শুভপরিণয় ঘটেছিলো 'গোরা' উপন্যাসে, তেমনি এ-কথাও সত্য যে এ-দুয়ের বিরোধ ভিতরে ভিতরে তাঁর প্রতিভাকে পীড়ন করেছে, কোনো-কোনো গল্পকে অখণ্ডভাবে রূপায়িত হতে দেয়নি। 'মেঘ ও রৌদ্র' বা 'সমাপ্তি'র মতো তীব্রমধুর গল্প সম্বন্ধেও তাই এ-আপত্তি ওঠে যে এদের গড়ন নড়বড়ে, যেন গাঁটে-গাঁটে ভাগ করা যায়, যেন দুটি বা তিনটি গল্পকে চেষ্টার দ্বারা জুড়ে দেওয়া হয়েছে এক গল্প ক'রে। স্বভাবের সঙ্গে চলতি প্রথার এই দ্বন্দ্বে 'গল্পগুচ্ছে'র অনেক পৃষ্ঠাই মলিন হয়ে আছে। হঠাৎ 'শুভদৃষ্টি'র মতো নিছক প্লটের গল্পও লিখে ফেলেছেন, শুধু একটি কাকতালীয়ের উপরেই যার নির্ভর ; আবার, ন্যূনতম উপকরণের সাহায্যে, 'ফেল' বা 'সদর ও অন্দরে'র মতো বিশুদ্ধ

মনস্তত্ত্বের গল্পও লিখেছেন, যাতে মনে হয় তারা যেন গল্পের খশড়া মাত্র, বা গল্পের ছলে উপদেশ। প্লটের উচ্চতম লক্ষ্য যে-রহস্যঘনতা তাকেও তিনি উপেক্ষা করেননি, এমন গল্প দুটি অন্তত লিখেছেন যাতে ঘটনার উত্তেজনা আর জীবনের ব্যঞ্জনা মিলে-মিশে এক হয়েছে—'মাস্টার মশাই' আর 'মণিহারা'র প্লট রীতিমতো রোমাঞ্চকর হওয়া সত্ত্বেও গল্প দুটি রোমাঞ্চকর সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে। এখানে লেখকই কর্তা, প্লট রীতিমতো পোষ মেনেছে তাঁর কাছে; তবুও এর পরেও আরো একটি ধাপের প্রয়োজন ছিল—যা না-হলে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ বিকাশ হতে পারতো না—যেখানে কাহিনীর সরলতম সূত্রই যথেষ্ট মনে হয়, ঘটনার জটিলতার কোনো প্রয়োজন থাকে না, পাত্রপাত্রীর আন্তরিক বেগেই রচনাটি সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, যেমন হয়েছে 'কাবুলিওয়ালা'য় কি তার চেয়েও বেশি 'নষ্টনীড়ে'। পিতৃ-হৃদয়ের বিরহস্বর্গে পৌছবার পথে ঐ যে একবার জেলখানাটা ঘুরে আসতে হলো, 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের এটুকুই দুর্বলতা; কিন্তু 'নষ্টনীড়ে'র স্বচ্ছ ধারাটি কোনো উচ্চকণ্ঠ ঘটনার দ্বারা একবারও ঘোলো হয়ে ওঠেনি; কিছু না-বলে যে কতখানি বলা যায় 'নষ্টনীড়' তার বিস্ময়কর উদাহরণ।

'সবুজপত্রে'র যুগে এসে রবীন্দ্রনাথ প্লটকে বললেন, 'বিদায়'। কথাসাহিত্যে কাহিনীর অংশটা যে গৌণ, এ-কথা মেনে নেবার বাধা তাঁর নিজের মনে যখন আর রইলো না, তখনই আরম্ভ হলো গল্পগঠনের পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা। কিন্তু খুব বেশি দূর অগ্রসর হলো না, 'ঘরে বাইরে'র পর একটু আকস্মিকভাবেই গল্পের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। সত্তর-প্রান্তে এসে রুদ্ধ স্রোত আবার যখন উচ্ছ্বসিত হলো 'শেষের কবিতা'য়, আবার দেখা গেল রূপকরণের দিকেই উন্মুখতা, নূতন আকৃতিতে গল্প গড়ার সংকল্প। 'শেষের কবিতা'র সমস্ত দোষ—তার অব্যবস্থা, আগোছালো বিন্যাস, উপসংহারের কিশোরকল্পনা—এ-সমস্ত সত্ত্বেও এই রূপ-কল্পই রবীন্দ্রনাথের একটি স্থায়ী কীর্তি। শেষ-রবীন্দ্রের অন্যান্য গল্পের সঙ্গে 'শেষের কবিতা'র সম্বন্ধ সুস্পষ্ট; শুধু 'যোগাযোগ' নিঃসঙ্গ দূরত্বে দীপ্যমান। এখানে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তব্য নিয়েছিলেন যা যথার্থই মহৎ, আয়োজন করেছিলেন বিপুল-বিস্তৃত, কিন্তু যে নায়কের জন্মদিনের উৎসবে গল্প আরম্ভ, মাতৃগর্ভে তার সূচনার সঙ্গে-সঙ্গেই গল্প হলো শেষ। রবীন্দ্রনাথ, যিনি যখন যা হাতে নিয়েছেন তারই শেষ পর্যন্ত দেখেছেন, তাঁর হাতেও যে এই একখানা বই অসমাপ্ত থাকলো, আমাদের সাহিত্যের এই ক্ষতি অপূরণীয়, কেননা ও-রকম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে তিনি

'গোরা'র পর আর হাত দেননি।

এই দুর্ঘটনা আরো বেশি শোচনীয় মনে হয় এই কারণে যে, উনিশ-শতকী ইংরেজি উপন্যাসের আদর্শে বাংলা উপন্যাস দিকভ্রান্ত হয়েছে বরাবর, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী বিষবৃক্ষের উত্তরাধিকারী না-হয়ে-পারেননি। যদি কালীপ্রসন্ন সিংহ দীর্ঘজীবী হতেন, যদি আমাদের পূর্বপুরুষ জর্জ এলিয়টের ভক্ত না-হয়ে ব্রন্টি-বোনেদের অনুরাগী হতেন, যদি তাঁরা ইংরেজের মুখে ফরাসি লেখকের ঝাল না-খেয়ে স্বাধীন স্বাদ-গ্রহণের চেষ্টা করতেন, তাহলে আজ হয়তো আমাদের কবিতা-ছোটগল্পের সুধাভাণ্ড থেকে সান্ত্বনা নিতে হতো না উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের আপেক্ষিক দীনতার। উপন্যাস হলেই ঘটনার, চরিত্রের ও পৃষ্ঠাসংখ্যার বহুলতা চাই, সমসাময়িক সমস্যার আলোচনা চাই, আর সেই সঙ্গে চাই মাসিকপত্রে খণ্ডী-করণের উপযোগী গ্রন্থিশৈথিল্য—এই ধারণা থেকে 'গোরা'র গৌরব একবার সম্ভব হলেও 'শেষ প্রশ্নে'র পরিহাস প্রশ্রয় পেয়েছে বহুবার। বাঙালির জীবনে ঘটনার ক্ষেত্র অনধিক, বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ, সেইজন্যই আমাদের উপন্যাসের ঝোঁক প্রথম থেকেই হওয়া উচিত ছিল মনস্তত্ত্বের দিকে, কেননা জীবনের পারিপার্শ্বিক যতই সংকীর্ণ হোক, মানুষের মনের রহস্যের কোনোদিন কোনোখানে সীমা নেই। সুমিত আকারে, সুন্দর গড়নে, আমাদের নিজস্ব উপাদান নিয়েই বাংলা উপন্যাস অগ্রসর হতে পারতো, ব্যাপ্তিতে আমাদের যা অভাব, তার পরিপূরণ হতে পারতো ঐকান্তিকতায়। কিন্তু স্কট্, জর্জ এলিয়টের প্ররোচনায় তা হতে পারেনি; নিজের মনের মধ্যে না-তাকিয়ে আমরা চোখ রেখেছি বাইরের দিকে, আমাদের জীবনে উপকরণের ক্ষীণতা নিয়ে আক্ষেপ করেছি, উপন্যাসকে ঘটনাবৈচিত্র্যে জমকালো ক'রে তুলতে গিয়ে অদ্ভুতকে আশ্চর্য বলে এবং অবিশ্বাস্যকে অভিনব বলে ভুল করেছি। এর ফলে আমাদের সাহিত্যশক্তির অপব্যয় হয়েছে প্রচুর, আজও হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু এতদিনে হয়তো এই ধারণায় বদল ঘটেছে; উপন্যাসকে ভেঙে-চুরে নতুন ক'রে গড়তে হলে কোনদিকে এগোতে হবে, তার ইঙ্গিত দেশে-বিদেশে যাঁদের কাছে আমরা পেতে পারি তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও একজন।

বুদ্ধদেব বসু

বর্ণনা ও বিবৃতি: প্রতিভাবান প্রতিটি লেখকই উপন্যাসের রূপকর্মে বর্ণনা ও বিবৃতিকে পরীক্ষা ও নিরীক্ষার স্তরে রেখেছেন। উপন্যাসের 'প্লট'

শব্দটিকে যদি বিস্তৃত অর্থে ধরা যায়, এই বর্ণনা ও বিবৃতির ব্যাপার নিঃসন্দেহে সেই প্লটের সঙ্গেই সমন্বিত। গল্প বলার ব্যাপার প্লটের অঙ্গাঙ্গী। গল্প বলতে গেলে চরিত্র আঁকতে হবে, চরিত্রের অন্তর্নিহিত মানসলোক স্পষ্ট করতে হবে, মন বোঝাবার জন্য প্রকৃতি-পরিবেশ, পার্শ্বচরিত্র, লেখকের প্রতিপাদ্য, সমসাময়িক সমাজ-অবস্থা ইত্যাদি সবকিছুই লেখকের সূক্ষ্ম অনুভূতির অভিজ্ঞতায় এক এক করে পাঠকের সামনে রাখতে হবে। লেখকের পক্ষে এই জাতীয় প্লট রচনায় একরকম বর্ণনা ও বিবৃতির আশ্রয় নিতেই হয়।

এক্ষেত্রে সাধারণভাবে নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের বিবৃতির (narration) নিয়মে লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। নাট্যকার তাঁর বর্ণনা ও বিবৃতির ব্যাপারগুলি প্রয়োজনবোধে চরিত্রসমূহের সংলাপে সংযোজন করেই দায়িত্ব শেষ করেন। আধুনিক নাটকে দীর্ঘাকার নাট্যনির্দেশনার মধ্যেও নাট্যকার বিবৃতির কিছু অংশ সংযোজিত করেন। কিন্তু উপন্যাসে তা হয় না। সাধারণ প্রচলিত যে ধারণা, তাতে দেখা যায়, ঔপন্যাসিক প্রধানত তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন : ১. প্রত্যক্ষ বা মহাকাব্যিক পদ্ধতি, ২. আত্মজীবনীমূলক রচনা পদ্ধতি, ৩. প্রামাণিক পদ্ধতি।

সহজ সরল বিবরণধারা প্রথমটির বৈশিষ্ট্য। সাধারণভাবে সমস্ত ঔপন্যাসিকই এই প্রণালী অনুসরণ করেন। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ইতিহাসকারের মতো দর্শক হয়ে যেন অত্যন্ত সহজ, সরল ও স্পষ্টতার মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছুই বলতে বসেন। মহাকাব্যের বর্ণনায় যে সরলতা, স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা এবং ঋজুতা থাকে, যে বিশালতা মহাকাব্যকে সর্বসাধারণের বিষয় অবলম্বনে সর্বসাধারণেরই বিষয় করে তোলে ; এই পদ্ধতি অনেকাংশে তারই অনুসারী। লেখক এখানে বহুবিধ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিচরণ করার সুযোগ পান। ঔপন্যাসিক যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতে পারেন উপন্যাসে নিজেকে সহজভাবে সংযুক্ত করার।

আত্মজীবনীমূলক রচনায় লেখক উত্তমপুরুষে উপন্যাস বর্ণনা করেন। এখানে লেখক স্বয়ং নায়ক বা নায়িকারূপে অবতীর্ণ হয়ে উপন্যাসের যাবতীয় ঘটনা ও চরিত্রের বিবরণ দিতে থাকেন। কখনো বা কোনো একটি সাধারণ পার্শ্বচরিত্র 'আমি' রূপে উপস্থিত থেকে নায়ক-নায়িকার যাবতীয় সক্রিয়তা বর্ণনা করে। এখানে লেখকের ভূমিকা গৌণ, অথচ তার জবানীতেই উপন্যাসটির আদ্যন্ত বিবরণধারা মুখ্য হয়ে উঠে। কোথাও কোথাও উপন্যাসের প্রত্যেকটি প্রধান চরিত্র

স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে নিজের জবানিতে উপন্যাসের নানাবিধ কাহিনী, ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট চরিত্রাবলী বর্ণনা ও পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এই পদ্ধতি উপন্যাসের বর্ণনা ও বিবৃতির সূত্রে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, ইংরেজি সাহিত্যে ***Robinson Crusoe, The Vicar of Wakefield, David Copperfield***, ফরাসি সাহিত্যে সার্ত্রে, কাম্‌ ইত্যাদির রচনা, বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী', রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', একেবারে আধুনিক কালে বিমল করের 'অপরাহ্ণ' ইত্যাদির নাম উল্লেখ্য, তবে আত্মজীবনীমূলক বিবরণপদ্ধতিতে লেখককে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। 'আমি' রূপে নায়ক ও নায়িকা কেবল নিজের মনকে তুলে ধরবে না, সেই সঙ্গে সমস্ত ছোট বড় চরিত্র, ঘটনা ইত্যাদির স্বরূপ ও পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রচনা করবে।

প্রামাণিক (ডকুমেণ্টারি) পদ্ধতির মধ্যে চিঠিপত্র, ডায়েরি ইত্যাদির আকারে লিখিত উপন্যাসকে ফেলা হয়। অধুনা 'রিপোর্টাজ' ধরনের উপন্যাসগুলিও এই পদ্ধতিতে পড়ে। এটি উপন্যাসের বর্ণনা ও বিবৃতির পরীক্ষামূলক কৌশলে আর একটি জটিল, বিচিত্র ও অভিনব পদক্ষেপ। চিঠিপত্র, ডায়েরি ইত্যাদি মানুষের মনের একান্ত গোপন দর্পণ। রক্তমাংসের নিখুঁত ব্যক্তিগত সত্তাকে উন্মোচিত করার ভার নেয় এগুলি। কোনো উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা যদি চিঠিপত্র বা ডায়েরির গোপনতায় আত্মগোপন ক'রে উপন্যাসোপম বিরাট বিবৃতিতে অংশগ্রহণ করে, সেখানে উপন্যাস নিঃসন্দেহে অন্তরঙ্গ ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে যথেষ্ট গভীরাশ্রয়ী হতে বাধ্য। প্রামাণিক তথ্য ও সত্য এ জাতীয় উপন্যাস বর্ণনায় ঘটনা ও গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই প্রামাণিক পদ্ধতির উদাহরণ হিসেবে রিচার্ডসনের 'ক্লারিসা', 'পামেলা' ইত্যাদি চিঠিপত্র-জাতীয় উপন্যাস, স্মলেটের 'হামফ্রে ক্লিঙ্কার', ফ্যানি বার্নির 'এভেলিনা', উইল্‌কি কলিন্‌সের ডায়েরিধর্মী উপন্যাস-গুলি উল্লেখ্য।

কিন্তু আত্মজীবনীমূলক বর্ণনাপদ্ধতি ও চিঠিপত্র-ডায়েরি জাতীয় উপন্যাসের লেখককে বর্ণনাকালে নানাবিধ জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। লেখক যখন স্বয়ং অনুমিত নায়ক বা নায়িকা হয়ে উত্তমপুরুষে কথা বলতে শুরু করেন, তখন অন্যান্য চরিত্রের যাবতীয় বিষয়কে তিনি সমগ্রভাবে উপস্থাপিত করতে সবসময়ে পারবেন কিনা, সন্দেহ থেকে যায়। এমনকি রক্তমাংসের চরিত্র-নিহিত অন্তরঙ্গ দিকগুলি নাও দেখা দিতে পারে।

কোনো কোনো সমালোচক উপন্যাসের চিঠিপত্র ও ডায়েরি জাতীয় বিবরণ পদ্ধতিকে অন্য দু'টি পদ্ধতির থেকে উচ্চমানে ভূষিত করতে গিয়ে বলেছেন, **'The principal advantage of the epistolary method is to be found in the fact that full personal expression can be given to the feelings of all the important actors at the time of the events described, and before their issue is known to them.'** এর মতে প্রত্যক্ষ বর্ণনাপদ্ধতির উপন্যাসে যেহেতু চরিত্রের বিচিত্র গভীর অনুভূতি বাইরে থেকে বর্ণিত হয় এবং আত্মজীবনীমূলক পদ্ধতিতে একটিমাত্র চরিত্রের অতীত স্মৃতিচারণের মোহে যাবতীয় বর্ণনা ও বক্তব্য উপস্থাপিত হয়, তাই এ পদ্ধতি দু'টি চিঠিপত্র-জাতীয় বর্ণনাপদ্ধতির উপন্যাস থেকে তুলনায় নিকৃষ্ট ও দুর্বল। এই **'Epistolary form'**-কে সমর্থন জানিয়ে রিচার্ডসন তাঁর 'ক্লারিসা' উপন্যাসের ভূমিকায় যে কৈফিয়ত দিয়েছেন, তা চিঠিপত্র-জাতীয় বর্ণনাপদ্ধতির উপন্যাসের অন্যতম ম্যানিফেস্টো বলা যায়।

বিশ শতকের গোড়া থেকেই পৃথিবীর উপন্যাসের ইতিহাসে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনা ও বিবৃতিতে লক্ষণীয় নতুনত্ব দেখা দেয়, যা চিরাচরিত প্রথার মূলে নির্মম প্রহার করেছে বলা যায়। ফ্রান্সে সুররিয়েলিজম-এর প্রবক্তা আঁদ্রে ব্রেতোঁ ১৯২৪ ও ১৯৩০ সালে সুররিয়েলিজম্ সংক্রান্ত দু'টি ম্যানিফেস্টোর মধ্যে এর মূল সূত্রগুলিকে স্পষ্ট করেন। ইনি বললেন, আমাদের স্বপ্ন ও অবচেতন মনের আধিপত্য শিল্পে অবধারিত এবং এই অবচেতনা-প্রভাবিত শিল্প-ধারণার দার্শনিক সমর্থন হলো ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব। আর একটি সূত্র হলো, মানুষের মনে এমন একটি কেন্দ্র অবস্থিত যেখানে জীবন-মৃত্যু, প্রকৃত-অপ্রাকৃত, অতীত-ভবিষ্যৎ পরিবাহিত ও অপরিবাহিত বলে অনুভূত হয় না। অর্থাৎ এক কথায় যাকে মানুষের পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতা বলা হয়, তার সাবলীল বিলোপসাধন। তৃতীয় অন্যতম সূত্রটি হলো, ব্রেতোঁ মানুষের সত্তার (self) সঙ্গে অহং চেতনার (ego) মৌলিক পার্থক্যটি স্পষ্ট করে বললেন, সত্তা হলো যাবতীয় স্বপ্ন, সৃষ্টি, সম্ভাবনার জীবাণুময় অন্ধকার, যেখানে মানুষের চিরন্তন রূপকল্প, মিথ এবং তার মৌল প্রতীক অতি নিঃশব্দে কাজ করে।

এরকম আরও সূত্র মিলে উপন্যাসের মূল সূত্র যে বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্ব, তার মধ্যে নতুন ভাবনা যোজনা করেন ব্রেতোঁ। ফরাসি দেশের যুদ্ধফেরত তরুণ বুদ্ধি-

জীবীরা—ব্রেতোঁ, এলুআর, আরাগঁ প্রভৃতি কবিরা ক্লাসিসিজম্, বাস্তবতা, সমসাময়িক সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আনাতোল্ ফ্রাঁস, বালজাক ইত্যাদির মতো সম্মানিত লেখকদের অস্বীকার করলেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৯২৪ সালে ম্যানিফেস্টো প্রকাশের সময় ব্রেতোঁ এবং তাঁর সঙ্গীরা সাহিত্যের শাখা হিসাবে উপন্যাসকে অস্বীকার করে বসেন। ঘটনা, চরিত্র ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন আছে বলেই এই সুররিয়েলিস্টরা উপন্যাসকে উচ্চমানের শিল্প বলে স্বীকার করতে নারাজ। ব্রেতোঁর 'নাদজা' নামের যে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, তা আঙ্গিক, বক্তব্য এবং বর্ণনাপদ্ধতিতে প্রচলিত উপন্যাসের বিপরীত। মোট-কথা, চিত্রকলার নবপ্রেরণা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত এই মানস বিরোধ উপন্যাসের বিষয়ে যেমন বদল ঘটালো, উপন্যাসের বর্ণনা ও বিবৃতির পদ্ধতিতে আনলো লক্ষণীয় অভিনবত্ব সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

আমরা ভার্জিনিয়া উল্ফ্ ইত্যাদির উপন্যাসে আবিষ্কৃত মানুষের মগ্ন চৈতন্যের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহধারাকে বর্ণনা করার পদ্ধতিতে আরও নতুনত্বের শিক্ষা ও পরীক্ষা পেলাম। যে কোন মানুষ চিন্তা ছাড়া থাকতে পারেন না। যতদিন বেঁচে থাকেন, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটি চেতনাপ্রবাহ চলে তাঁর মধ্যে। এরকম মানুষ যদি উপন্যাসের নায়ক নায়িকা হয়, তবে, সে-চেতনার সম্যকরূপই বা উপন্যাসে থাকবে না কেন? ঔপন্যাসিকেরা মনস্তত্ত্বের গভীরে অবগাহনের কথা চিন্তা করে চেতন-অবচেতনের ত্রিলোক-প্রবাহী ধারাকে উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে বর্ণনা করতে বসলেন। এই বর্ণনাপদ্ধতি আরোপিত মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা বিরোধী নয় এবং যথেষ্ট অভিনব শিল্পকৌশল। পর্যবেক্ষণ ও প্রতিভা যদি না থাকে, উইলিয়াম জেম্‌স্ উদ্ভাবিত এই মগ্ন চৈতন্যের প্রবাহধারাকে শিল্প-সমন্বিত করা আদৌ সম্ভব নয়। এখানে যে বর্ণনা ও বিবৃতি থাকে, তা মানুষের মনের photographic fidelity নয়, তার উপরেও কল্পনায় জীবনের মায়া রচিত হয়। এই বিবরণপদ্ধতিতে মানুষের সমগ্র সত্তা—লৌকিক অলৌকিক—যাবতীয় কিছুর সমবায়ে উঠে আসে ; লেখকের বর্ণনাক্ষমতায় তার সম্পূর্ণ কিছু নতুন দেখার বিস্ময়ে অভিনবত্ব পায়। ইংরেজি উপন্যাসে হেনরি জেম্‌স, জেম্‌স জয়েস, বহু ফরাসি অস্তিত্ববাদী (Existentialist) লেখকের রচনায় এবং বাংলা দেশে বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ইত্যাদির উপন্যাস-ছোটগল্পে তার পরীক্ষা আছে।

উপন্যাস লেখক সাধারণ পদ্ধতি বা যে কোনো পরীক্ষামূলক বিবরণপদ্ধতিই অবলম্বন করুন না কেন, প্রধানত স্মৃতি, স্বপ্ন বা অন্য কারোর কথার সূত্রে উপন্যাসের কিছু বিষয় বর্ণনা করতে পারেন। উপন্যাসের বর্ণনা বিষয় অনুযায়ী হয়। বর্ণনাপদ্ধতি, বহির্নির্ভর এবং অন্তর্মুখীন দুই-ই হতে পারে। মোটকথা লেখক সবসময়েই সমস্ত বর্ণনাকে Real থেকে Reality-তে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বহির্নির্ভর বর্ণনায় Real-ই মুখ্য, Reality তেমন প্রাধান্য নাও পেতে পারে। অন্তর্মুখীন বর্ণনার বিষয়ে Real থেকে Reality-ই প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। উপন্যাস-শিল্প তার ইতিহাসধারায় যখন বিষয় থেকে বিষয়ীর আত্মতায় নিমজ্জিত হতে শুরু করে, তখন থেকেই তার বর্ণনাভঙ্গি বাইরের বাস্তবতা থেকে চরিত্রের অন্তরের বাস্তবিকতাকে ধরতে চেষ্টা করে। উপন্যাসের কাহিনী, ঘটনা থেকে মুখ্যত চরিত্রের একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য সেই বর্ণনায় মায়া রচনা করে।

একথা যথার্থ, বর্ণনা অনেকাংশে লেখক-নিরপেক্ষ হওয়া দরকার। লেখক যখন বর্ণনার মধ্যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের প্রশংসা করতে বসেন, তখনি বর্ণনা হয় পক্ষপাতদুষ্ট। উপন্যাসের যে কোনো বর্ণনায় লেখকের নিরাসক্তচিত্ততা বা নিরপেক্ষতা সমস্ত বর্ণনার দৃঢ়তা, ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্ব রচনা করে। উপন্যাসের বর্ণনা ও বিবৃতি এইভাবেই শিল্পের সমগ্রতা পায়।

বাংলা সাহিত্যের উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উপন্যাসের পদসঞ্চার পর্বে প্যারীচাঁদ মিত্রের কথা মনে রেখে সার্থক উপন্যাসের প্রথম পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই তাঁর একাধিক বর্ণনাকে লেখক-নিরপেক্ষ করতে পারেননি। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সিদ্ধান্তবাক্যে তাঁর বিবৃতি এইরকম : 'আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।' উপন্যাসটি মূল বিষয় থেকে সরে এসে একান্তভাবে লেখকেরই নিজস্ব বক্তব্য বিবৃতিতে ভিন্ন মাত্রা পায় যা শিল্প-মানে অবশ্যই অন্যায্য। এমন মনোভঙ্গি আছে 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'পাপীয়সী', দ্বিতীয় খণ্ড 'পাপ,' তৃতীয় খণ্ড 'পুণ্যের দ্বন্দ্ব' এমন নামকরণে যেমন, তেমনি আছে তাঁর দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষতম সিদ্ধান্তবাক্যের উপস্থাপনায়—'এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এই স্থানে তাহার কিছু পরিচয় দিতে হইল। তাঁহার চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী-কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।'

বিবৃতির ক্ষেত্রে এগুলি প্রাচীন রীতির অনুপন্থী। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক

বর্ণনায় যেমন নাটকীয়তাকে আবশ্যিক করেছেন, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত করেছেন কবিত্বকে। 'কপালকুণ্ডলা'য় নায়িকার কণ্ঠস্বরে নবকুমারের মানস-প্রতিক্রিয়ার অনবদ্য কাব্যিক রূপ: "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল; কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্র মর্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল; সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।" এই বর্ণনায় উপন্যাসের বিষয়, নায়ক-চিত্ত ও লেখকের কবিমন একাকার হয়ে স্বতন্ত্র স্বাদ দেয়। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর প্রেমিক-মনোলোক উদ্ঘাটনে লেখকের বর্ণনায় আছে অভাবনীয় কাব্যের চমৎকারিত্ব: "প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে তাহা জানি না—সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু।" এমন বর্ণনার ভাষায় লেখক নিঃসন্দেহে আধুনিকোত্তম।

যাবতীয় নাটকীয়তা, ঘটনার জাঁকজমক ত্যাগ করে বর্ণনা ও বিবৃতিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ভিতের আশ্রয়ে উপন্যাসকে আধুনিক-বাস্তবতায় প্রথম মর্যাদা দেন রবীন্দ্রনাথ। নানান সীমাবদ্ধতা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে'র বর্ণনা ও বিবৃতিতে ব্যক্তিত্বধর্মী নিরাসক্ত বাস্তবতার জনক হয়েই দেখা দেন। বিমলার স্বীকারোক্তিমূলক আত্মবিচারণার নমুনা: "আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের প্রাপ্যমুহূর্তে সেই যে ঊষা-সতীর দান; দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?" এমন আত্মোক্তিতে আত্মার অন্বেষণ 'চতুরঙ্গে'র দামিনী, শচীশ ইত্যাদির নিজ নিজ বর্ণনায় চরিত্র-ব্যক্তিত্ব-আলোকিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' থেকে আমরা এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদ ও বাস্তবতার মুখোমুখি হই। 'শেষের কবিতা'য় বর্ণনার রঙে-রেখায়, গদ্যের চলনধর্মে, বিশেষ করে শব্দের ধ্বনিতরঙ্গে বর্ণনা উপন্যাসের চরিত্র ও বিষয়ের বিশ্বের বিম্বন: "...এমন সময়ে আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্র-

মণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে ; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কূলছাড়া করবে।" বর্ণনায় কবিত্ব ও স্মিত কৌতুকের লাবণ্য মন ভরায়।

'কল্লোল' প্রকাশের পর থেকে প্রকাশিত কল্লোলীয় ও কল্লোল-বহির্ভূত একাধিক কথাকারের উপন্যাসের ভাষায়, বর্ণনায় ও বিবৃতিতে বদল ঘটতে থাকে। পঞ্চাশের দশকের প্রথমে প্রকাশিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কোপাই নদীর সঙ্গে উপন্যাসের রক্ত-মাংসে আঁকা চরিত্রদের গভীর-নিবিড় রক্ত-সম্বন্ধ চিহ্নিত করেছেন এইভাবে : "কাহারদের এক-একটা ঝিউড়ি মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া করে, পাড়া-পড়শীকে শাপ-শাপান্ত করে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খসে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইট-পাটকেল-পাথর, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে, তেমনি ভাবেই সেদিন ওই ভরা নদী অকস্মাৎ ওঠে ভেসে। তখন একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী।" এমন বর্ণনায় চিত্রের ব্যঞ্জনা ও বিস্তার যথাযথ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা ও বিবৃতিতে তাঁর অধ্যাত্ম-আর্তি ও নিসর্গপ্রেম যে অমোঘ সুন্দর, 'ইছামতী' উপন্যাসের ভবানী বাঁড়ুজ্জ্যের ভাবনায় আঁকা ভাষা-চিত্র তার প্রমাণ : "ভবানী বাঁড়ুজ্জ্যে মুগ্ধ হয়ে ভাবেন, কোন্ মহাশিল্পীর সৃষ্টি এই অপরূপ শিল্প, এই শিশুও তার অন্তর্গত। এই কাকলিপূর্ণ অপরাহ্নে, নদীজলের স্নিগ্ধতায় শ্রীভগবান বিরাজ করছেন জলে স্থলে ঊর্ধ্বে অধে, দক্ষিণে উত্তরে, পশ্চিমে পূর্বে। যেখানে তিনি সেখানেই এমন সুন্দর শিশু অনাবিল হাসি হাসে, অমন সুন্দর বংশবৌরী পাখীর হলুদ রঙের ঝলক ফুটে ওঠে।"

অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের বর্ণনা ও বিবৃতিতে একেবারে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন যার সঙ্গে পূর্বসূরী জগদীশ গুপ্ত ও কবি জীবনানন্দের উপন্যাসরীতির সাযুজ্য মেলে। সেই বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির পরিচয় মেলে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শুরুতেই হারু ঘোষের মৃত্যুঘটনা বর্ণনায় : "খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন। হারুর মাথার কাঁচা-পাকা চুল আর মুখে বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে

একান্ন বছরের আত্মসমতায় গড়িয়া তোলা চিন্ময় জগৎটি তাঁহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" এই প্রাথমিক বর্ণনা অবশ্যই উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় বক্তব্যের অনুগ। এই মৃত্যুচিত্র বর্ণনায় যে শিল্পের নির্মমতা, তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম স্বভাবী পাঠকদের সামনে রাখেন।

বর্ণনায় বাক্যচিত্রে, বিবৃতির প্রবাহধর্মে যে বুদ্ধির শাণিত দীপ্তিদান রবীন্দ্র-উপন্যাসে মেলে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একাধিক বুদ্ধিপ্রধান উপন্যাসে তার অনুসৃতি ভিন্ন ভিন্ন লেখক-ব্যক্তিত্বে গৃহীত হয়েছে। বিবেকবান কথাকার সন্তোষ-কুমার ঘোষ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'শেষ নমস্কার : শ্রীচরণেষু মাকে' গ্রন্থে উত্তম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ দুই ডাইমেনশানে নায়কের অস্তিত্ব রচনা করে বিবৃতির শিল্পধর্মের আর এক দিক দেখিয়েছেন। লেখক-ব্যক্তিত্বের 'নিরাসক্ত লেখক' বাদে অন্য দু'টি সত্তার স্বরূপকে রহস্যময় কৌতূহল ও কৌতুকে জড়িয়ে এনেছেন উপন্যাসের প্রথমেই : "এই ব্যক্তিটি কে, একে কি আমি চিনি, দেখেছি কখনও ? কী করে চিঠিগুলো আমার হেপাজতে এল, স্পষ্ট মনে করতে পারছি না। যেন এক জাদুকর, হঠাৎ কোথা থেকে একদিন সামনে এসে দাঁড়াল, টেবিলের উপরে ছুঁড়ে দিল কাগজের বানডিল, সম্মোহক দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করে বলল, 'সাজিয়ে নাও' ; রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনীতে যেমন ঘটে। তার চোখে শীত, তার স্বরে শীত, মানে শীতে যেন শিঁটিয়ে-কঠিন, আর আদিষ্ট আমি কাগজ-গুলো হাত বাড়িয়ে ধরে অনিশ্চিত, কম্পমান।" এমন বিবৃতিতে প্রখর বুদ্ধির প্রলেপ যে আলোর আকর্ষণ আনে, তা বাংলা উপন্যাসে বিশশতকীয় বৈশিষ্ট্যে অত্যাধুনিক।

সমসাময়িক বিমল কর তাঁর প্রায় সমস্ত বর্ণনাতেই ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে বর্ণনায় ও বিবৃতিধর্মে এক শান্ত শীতল বিষণ্ণ স্বভাব এনেছেন যা লেখকের বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রকাশক নিঃসন্দেহে। মৃত্যু লেখকের বর্ণনায় শান্ত সত্য, ধ্রুব সত্য, অমোঘ, কিন্তু জাগতিক বিষণ্ণতাবোধে বড় করুণ। এই চিত্রের বিবৃতি স্বভাব 'যদুবংশ' উপন্যাসের একাধিক 'সিচুয়েশনে'র মতো সিদ্ধান্তচিত্রেও মেলে :

"ভাঙা গলায় সূর্য শেষবারের মতন চেঁচাল, বল হরি, হরি বোল।"

"কৃপাময়রাও আর গলা দিতে পারছিল না। শ্মশানটা সামনে। মাত্র কয়েক পা। শেয়ালের দল বটতলার অন্ধকার থেকে ডেকে উঠল। পেছনের লণ্ঠন কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, সামনে খাঁ খাঁ শ্মশান। নবমীর চাঁদ আকাশ থেকে হেলে পড়ছিল।"

বাংলা উপন্যাসে বিবৃতি ও বর্ণনার দিক বহুবিচিত্র হয়ে ওঠে লেখক-ব্যক্তিত্বের ভিন্নতায়। কমলকুমার মজুমদার ক্লাসিক্যাল গদ্যের নির্মোকে আধুনিক মননের কঠিন ভাষা মিশেল দিয়ে সূক্ষ্ম বর্ণনার ব্যঞ্জনাকে অভিনব রূপ দিয়েছেন। 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের শুরুর বর্ণনা এইরকম : "আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।" ভোর হওয়ার এমন ক্রম-চিত্র বর্ণনায় লেখকের উপরি-উক্ত অনুচ্ছেদটির প্রথম বাক্য 'আলো ক্রমে আসিতেছে', শেষতম বাক্য 'ক্রমে আলো আসিতেছে।' এমন দু'টি শব্দের স্থান বদলের বাক্য গঠনের মধ্যেই আছে ভোরচিত্রের স্থির-নির্দিষ্ট আগমন-বার্তার স্বরূপধর্ম। বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে অতি-সচেতন ও স্পর্শকাতর লোক-মানস লক্ষণীয়।

'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসের দুশ উনিশ পরিচ্ছেদে দেবেশ রায় কথাকারের কথা ও বাঘারু-মাদারির বৃত্তান্ত বর্ণনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই নিরাসক্ত বর্ণনা ও বিবৃতি-চিত্রে স্বভাবী পাঠকদের নিবিষ্ট করতে বাধ্য করেছেন। এই বর্ণনায় প্রধান চরিত্রদের বোহেমীয় পরিচয় যেমন দিয়েছেন, তেমনি একালের মহাকাব্যোপম উপন্যাসের উপযোগী ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও জীবনধর্মকেও যোগ করেছেন। এমন সতর্ক সচেতন বর্ণনা ও বিবৃতির মধ্যেই আগামী দিনের উপন্যাস কাঠামোর শিল্পভাবনার নতুন দিকের নির্দেশ ধরা পড়ে। একালের আধুনিকোত্তম উপন্যাসের বর্ণনায় ও বিবৃতির মধ্যে লেখকের সর্বসচেতন মনের সতর্ক নিরাসক্তিই যে কাম্য, লক্ষ্য, অবধারিত সত্য, এমন বর্ণনা তার সাক্ষ্য দেয়, "আমরা বাঘারু-মাদারিকে আর অনুসরণ করব না।

বাঘারু তিস্তাপার ও আপলচাঁদ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মাদারিও তার সঙ্গে যাচ্ছে। যে-কারণে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের শালবন উৎপাটিত হবে—সেই কারণেই বাঘারু উৎপাটিত হয়ে গেল। যে-কারণে তিস্তাপারে ও আপলচাঁদের হরিণের দল, হাতির পাল, পাখির ঝাঁক, সাপখোপ চলে যাবে—সেই কারণেই বাঘারু চলে যায়। তার ত শুধু একটা শরীর আছে। সেই শরীর এই নতুন তিস্তাপারে, নতুন ফরেস্টে বাঁচবে না। এই নদীবন্ধন, এই ব্যারেজ, দেশের অর্থনীতি বদলে দেবে, উৎপাদন বাড়াবে। বাঘারুর কোন অর্থনীতি নেই। বাঘারুর কোনো উৎপাদনও নেই। বাঘারু এই ব্যারেজকে, এই অর্থনীতি ও

এই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল। বাঘারু কিছু কিছু কথা বলতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভাষা তার জানা নেই। তার একটা শরীর আছে। সেই শরীর দিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করল।...এই প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে বাঘারু মাদারিকে নিয়ে হাঁটুক, হাঁটুক, হাঁটুক...।" উপন্যাসের বর্ণনা ও বিবৃতির মধ্যে লেখক একালে সশরীরে উপস্থিত না থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর জীবনকে দেখার আশাবাদী দৃষ্টি প্রচ্ছন্ন থাকেই নানাভাবে।

বীরেন্দ্র দত্ত

বাস্তবতা: জীবনকে জীবনেরই মতো উপন্যাসে প্রতীয়মান করানোর অনুজ্ঞা ঔপন্যাসিককে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। এরই অপর নাম বাস্তব এবং জীবনের মায়া (illusion) সৃজন। কেমনভাবে এই মায়া সৃজিত হয় তা অবশ্যই জটিল সৃষ্টিক্রিয়ার অঙ্গীভূত ব্যাপার। কাজেই কতকটা দুর্জ্ঞেয়ও বটে। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সেই মতারণ্যে দিশাহারা হবারই কথা। বিশেষত রিয়ালিজ্‌ম্‌, ন্যাচারালিজম প্রমুখ নানা ইজ্‌মের প্রবক্তারা যেখানে নানা মতবাদী বক্তব্য নিয়ে সদাই প্রস্তুত। আমরা এই মতবাদের জটিল বিতণ্ডায় না গিয়ে একেবারে ব্যাপারটির মর্মানুধাবনের চেষ্টা করবো। জীবনকে জীবনের মতো প্রতীয়মান করাতে গিয়ে ঔপন্যাসিকের কর্তব্য কী হবে এ প্রসঙ্গে জোলা-র একটি বক্তব্য এখানে উপস্থিত করা যাক। জোলা বলেছেন,

> একজন লেখক রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে একটি উপন্যাস লিখতে চান। এই অভিপ্রায় থেকে তিনি যখন কাজ শুরু করলেন তখন তাঁর প্রথম কর্তব্য হবে (চরিত্র বা বিষয় কিছুই তখন তার হাতে নেই) উপাদান সংগ্রহ করা; মঞ্চজগৎ সম্বন্ধে তিনি যা বর্ণনা করতে চান তার বিষয়গুলি খোঁজাই হবে তার প্রধান কাজ। তিনি তখন হয়তো কতকগুলি অভিনেতার সঙ্গে আলাপ করবেন, এবং কিছু অভিনয়ও দেখবেন। তারপরে তিনি তার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ করবেন, তাঁদের মতামত সংগ্রহ করবেন, গল্প এবং চিত্রাদি যোগাড় করবেন। কিন্তু তা-ই সব নয়। প্রাপ্তব্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক পুঁথিপত্র তাঁকে পড়তে হবে। পরিশেষে তিনি তাঁর যথানির্দিষ্ট স্থানটি পরিদর্শন করবেন এবং একটি থিয়েটারে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্য কয়েকদিন অতিবাহিত করবেন, অভিনেত্রীদের সাজঘরে একটি সন্ধ্যা কাটাবেন এবং যতটা সম্ভব সেই পরিবেশকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করবেন। যখন এই সমস্ত উপাদান এইভাবে সংগৃহীত হবে তখনই উপন্যাস নিজ নিয়মে তার আকার ধারণ করবে।

পরিবেশকে আত্মসাৎ করবার এই যে ব্যাপার এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে সমালোচকদের কঠিন মতামত প্রযুক্ত হতে দেখা গেছে। এই ধরনের লেখকেরা এই প্রকার অনুজ্ঞা অনুসরণ করে যে উপন্যাস রচনা করেন তাতেও অ্যাভারেজ

সাধারণ চরিত্রই মুখ্যত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এই আটপৌরে অ্যাভারেজ চরিত্র এবং ডিফো-ফিল্ডিং-এর আমলের অ্যাভারেজ এক বিষয় নয়। এ হলো একধরনের যান্ত্রিক গড়পড়তার সাধারণ মানুষ। ডিফো-ফিল্ডিং-এর অ্যাভারেজ মানুষ সমাজের পটে আবির্ভূত সে-শতাব্দীর নতুন মানুষ। তারা ছিল এক নবোদ্ভূত শ্রেণীর প্রতিনিধি। কাজেই টাইপ এবং ব্যক্তির দ্বন্দ্বমূলক ঐক্য সেখানে উপস্থিত ছিল। জোলার বাস্তব-মায়ায় এই গড়পড়তা মানুষের দল কোনপ্রকার Pattern বা রসতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যতিরেকে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আমাদের আপত্তি শুধু এইখানেই নয়। To absorb the atmosphere বা পরিবেশকে আত্মসাৎ করা বলতে জোলা কি বুঝেছেন। এ যদি হয় শুধুমাত্র আহৃত উপাদানের বর্ণহীন আটপৌরে প্রদর্শনী, অথবা সংগৃহীত অভিজ্ঞতার যদৃচ্ছ প্রকাশের একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থালিপি মাত্র তাহলে অবশ্যই এ থেকে কোন বৃহত্তর সার্থকতার সাক্ষাৎ মিলবে না। এই প্রসঙ্গে হেনরী জেম্স্ যে কথা বলেছেন সে কথা সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন লেখকের অভিজ্ঞতার শক্তি কখনই উপন্যাসকে জীবনের হুবহু অনুকৃতি করে তোলার সাধনা নয়। নিখুঁত সাদৃশ্য উপন্যাসের একটা গুণ হতেও পারে, নাও পারে। কেননা ডন কুইক্সোট কিংবা মিঃ মিকোবরের বাস্তবতা স্রষ্টার রঙে এত অনুরঞ্জিত যে এদের যত বাস্তবের নিখুঁত অনুসরণ বলা চলুক না কেন এরা কিছুতেই সাধারণভাবে সংসারে দেখতে পাওয়া চরিত্র নয়। অভিজ্ঞতার শক্তি আসলে একটা প্রচণ্ড অনুভবের শক্তি এবং এই অনুভবক্রিয়া সৃজনী-চেতনার প্রকোষ্ঠে যে কোন তাৎপর্যপূর্ণ জাগতিক ঘটনার এমন আশ্চর্য প্রতিধ্বনি তুলতে পারে, এবং সেখানে এত সূক্ষ্ম ব্যাপারেরও এত সুস্পষ্ট সাড়া জাগে যে এই ব্যাপারটাকে একটা অপরূপ মানস পরিবেশ উদ্ভূত ব্যাপার ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। লেখকের এই মানসপরিবেশই জীবন ও জগতের মায়া সৃজনের মূলে।

পরিবেশকে আত্মসাৎ করা অবশ্য প্রয়োজন। তার মূল্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। এবং একথা যথার্থই যে পরিবেশকে আত্মসাৎ করার সঙ্গে মানসপরিবেশ সৃজনের কোন মৌল বিরোধ নেই। বরঞ্চ শিল্পীমানস পরিবেশকে আত্মসাৎ করলে পরেই মনের নির্বাচনী ক্ষমতা অবচেতন স্তরে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে এবং তখনই সৃজিত হতে পারে সেই অবস্থা যার ফলে উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠবে লেখকের মানস-মণ্ডল। তাই বলা হয় যে, উপন্যাসে জীবনকে জীবনের মতো

প্রতীয়মান করাতে গিয়ে ঔপন্যাসিক কখনই হুবহু অনুলিপি আশ্রয়ী হন না। হলেও, তিনি জানেন যে এর উপরে বাস্তবের অধ্যাস রচনার সার্থকতা নির্ভর করে না। পরিবেশকে লেখকের গোটা জীবন-বিষয়ক বক্তব্যের সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ করে তোলাতেই এর সার্থকতা। ডিফোর 'রবিন্‌সন ক্রুশো' থেকে এর একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

এ কথা সুপরিজ্ঞাত যে ডিফোর Formal Realism-এর প্রধান ভিত্তি ছিল পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করায়। যে বিষয়ে তিনি বর্ণনা করতে মনস্থ করেন সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিষয়ের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশও তিনি এমন বিশ্বাস্যভাবে বর্ণনা করেন যার ফলে পাঠকের চিত্তে শুধু যে অবিশ্বাসের ইচ্ছাকৃত নির্বাসন ঘটে তাই নয়, পাঠক একেবারে স্পষ্টত বিশ্বাসের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। 'রবিন্‌সন ক্রুশো'র জাহাজডুবির পর ক্রুশো যখন ক্রুশোর মৃত বন্ধুদের সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি লিপিবদ্ধ করছেন তখন তিনি বলছেন, 'I never saw them afterwards or any sign of them, except three of their hats, one cap, and two shoes that were not fellows'—বর্ণনার এই অংশটুকু অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে শেষ বাক্যাংশটুকুই হচ্ছে সেই অব্যর্থ অংশ যার উপরে ভর করে পাঠকের বিশ্বাস্যতা নিমেষে গড়ে উঠতে পারে। দুটো জুতো ভেসে এসেছে এবং এ দুটো জুতো একই জোড়ার দুটো জুতো নয় এই ব্যঞ্জনাটুকু সমুদ্রের বিশালতা এবং উদাসীনতা এই উভয়কে আশ্চর্যভাবে নিমেষে রূপায়িত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই অতি তুচ্ছ বর্ণনাংশের মাহাত্ম্য এইখানে যে এ পাঠকচিত্তে নানা-ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। এবং এর ফলে লেখকের আশ্চর্য তন্ময় দৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা একপ্রকার বিস্ময়ের আনন্দ লাভ করি। কিন্তু ব্যাপারটি যদি শুধু এই-খানেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এটা হয় একটা দ্বিতীয় শ্রেণার কৌশল যা গড়পড়তা লেখকের সম্বল। এই শক্তিটি তখনই লেখকের প্রবল মানসিক শক্তির পরিচায়ক যখন এই ধরনের তুচ্ছ বর্ণনাংশ আপন তাৎপর্যের গুণে পাঠকের চিত্তকে অকস্মাৎ অতিমাত্রায় আগ্রহশীল করে তোলে। অর্থাৎ কল্পনার দিক থেকে পাঠকের মনকে সক্রিয় করে তোলে। three hats, one cap and two shoes কেবলমাত্র আর্থিক যাথার্থ্যের পরিচায়ক। that were not fellows এই বাক্যটুকুতে লুকিয়ে রয়েছে সমুদ্র ব্যঞ্জনা। পাঠকের মনে এর ফলে জেগে ওঠে এক ভাবঘন অবস্থা। এরপর থেকে সে আর ঔপন্যাসিকের সৃজিত জীবনের প্রতিবিম্বকে

এক মুহূর্তের জন্য অবিশ্বাস করে না। ক্রুশো, বিরাট সমুদ্র, বিজনদ্বীপ, এক-কথায় ঔপন্যাসিকের সমগ্র বিষয়কে এ বর্ণনা স্পষ্ট করেছে বলেই এ সার্থক শিল্প।

এই প্রসঙ্গে টলস্টয়ের 'ওয়র অ্যাণ্ড পীস' থেকে একটা যুদ্ধবর্ণনার অংশও অনুধাবনযোগ্য। এখানেও উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধক্ষেত্রের ঝড়ের আগের স্তব্ধতা বর্ণনার সাফল্য দুই যুযুধান বাহিনীর মধ্যবর্তী empty space-এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। এই empty space বা শূন্য এলাকার বর্ণনাকে এক লহমায় টলস্টয় জীবন-মৃত্যুর সীমারেখার রূপকে উন্নীত করেছেন। এর ফলে ঔপন্যাসিকের কবিত্বই যে শুধু প্রকাশিত হয়েছে তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের ভয়াবহ মুহূর্তের সংশয় উত্তেজনা আশঙ্কা এই রূপকের সাহায্যে সত্য বলে প্রতিভাত হয়ে উঠতে পেরেছে। যুদ্ধের গম্ভীর বিস্তৃত বর্ণনার জন্য পাঠকের মন প্রস্তুত হয়ে উঠতে পেরেছে। এরপর সে যুদ্ধকে দার্শনিকের নিরাসক্তিতে গ্রহণ করবে।

আবার একটি ছোট বর্ণনার আঁচড়ে বোরোদিনের যুদ্ধের সুবিশাল অস্ত্র সঘন পরিবেশ এবং অমীমাংসিত যুদ্ধফল-কে জীবন্ত করে তুলেছেন টলস্টয়। পিটার এবং এক ফরাসি সৈনিক যেখানে কণ্ঠ আঁকড়ি ধরিলা পাকড়ি দুইজনা দুইজনে সেখানে লেখক বর্ণনা করেছেন :

> It was French officer ; but he dropped his sword, and took Peter by the collar. They stood for a few seconds face to face, each looking more astonished than the other at what he had just done.
>
> "Am I his prisoner or is he mine ?" was the question in both their minds. The Frenchman was inclined to accept the first alternative, for Peter's powerful hand was tightening its clutch on his throat.

'কে কার বন্দী'—উভয়ের এই যুগপৎ চিন্তার ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিচ্ছে যুদ্ধ কতখানি ঘোরালো হয়েছিল। যুদ্ধের সুবিশাল প্যানোরামা যে কাজ পাতার পর পাতা ধরে করেছে, কামান শ্রেণীর পরিসংখ্যান, বিভিন্ন সেনাবাহিনীর সংস্থান তথ্য যে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, এই একটি অতি ক্ষুদ্র দৃষ্টাংশ সে কাজের সাফল্যে সকলকে ছাড়িয়ে গেছে।

যে কোন শিল্পসফল উপন্যাসে বাস্তব জগতে জীবনের অধ্যায় রচনার এই শক্তি সদাই রসিক পাঠককে মুগ্ধ করে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি নিয়ে দেখা যায় যে ঔপন্যাসিকের এই গূঢ় শক্তিতে ইনি কতখানি শক্তিমান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'তে কুবেরের গৃহ বর্ণনা করছেন লেখক। এই বর্ণনায় দেখা যায় যে বিষয় এবং বিষয়ীর এমন এক সুযোগ্য সাযুজ্য ঘটেছে যার ফলে বর্ণনা পাঠকের কাছে জীবনকল্পরূপ ধারণ করেছে। বর্ণনাটি এই :

> কোণার দিকে রক্ষিত জিনিসগুলি চিনিতে হইলে ঠাহর করিয়া দেখিতে হয়। ঘরের একদিকে মাটিতে পোঁতা মোটা বাঁশের পায়ায় চৌকি-সমান উঁচু বাঁশের বাতা বিছানো মাচা। মাচার অর্ধেকটা জুড়িয়া ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। তৈল চিক্কণ কালো বালিশটি মাথায় দিয়া কুবেরের পিসী এই বিছানায় শয়ন করে। মাচার বাকি অংশটা হাঁড়ি কলসীতে পরিপূর্ণ। নানা আকারের এতগুলি হাঁড়ি কলসি কুবেরের জীবনে সঞ্চিত হয় নাই, তিন পুরুষ ধরিয়া জমিয়াছে। মাচার নিচেটা পুরাতন জীর্ণ তক্তায় বোঝাই। কুবেরের বাপের আমলের একটা নৌকা বারবার সারাই করিয়া এবং চালানোর সময় ক্রমাগত জল-সেঁচিয়া বছর চারেক আগে পর্যন্ত ব্যবহার করা গিয়াছিল, তারপর একেবারে মেরামত ও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ায় ভাঙিয়া ফেলিয়া তক্তাগুলি জমাইয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের অন্যদিকে ছোট একটা ঢেঁকি। ঢেঁকিটা কুবেরের বাবা হারাধন নিজে তৈয়ারি করিয়াছিল। কাঠ সে পাইয়াছিল পদ্মায়। নদীর জলে ভাসিয়া আসা কাঠ সহজে কেহ ঘরে তোলে না, কার চিতা রচনার প্রয়োজনে ও কাঠ নদীতে আনা হইয়াছিল কে বলিতে পারে? শবের মতো চিতার আগুনের জড়তম সমিধটিরও মানুষের ঘরে স্থান নাই। কিন্তু এই কাঠটির ইতিহাস স্বতন্ত্র।

এই গৃহ বর্ণনায় প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে সেটা হলো, লেখক ধীবর জীবনের অভিজ্ঞতাকে পরিভাষা-কণ্টকিত করে প্রকাশ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি। সমগ্র বর্ণনাটিকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে ঢেঁকির কাঠের প্রসঙ্গে। পদ্মার জলে ভেসে আসা কাঠের প্রসঙ্গ কুবেরের ঘরের দরিদ্র মাঝির বর্ণহীন গৃহস্থালীর বর্ণনায় বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে। এই ঢেঁকির কাঠের সাহায্যে ঘরখানি পাঠকের কাছে হয়ে উঠেছে পদ্মানদীর মাঝির ঘর। ঢেঁকির কাঠের মতো তুচ্ছ বিষয় পদ্মার অনন্ত জীবনমরণ রহস্যকে, এক কথায় উপন্যাসে পদ্মা যে নিয়তির প্রতীক তাকে বিশ্বাস্য করে তুলেছে। এই বর্ণনার সমালোচনা হিসাবে এইটুকু বলা যায় যে লেখক কুবেরের বাপের আমলের নৌকার প্রসঙ্গ যদি পরিহার করতে পারতেন তাহলে এ বর্ণনা প্রথম শ্রেণীর বর্ণনায় পরিণত হতে পারত। কুবেরের বাপের আমলের নৌকার প্রসঙ্গ বাস্তবতার আতিশয্যের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টিতে এই ঝোঁক অবশ্যবর্জনীয়।

বলা প্রয়োজন যে ঔপন্যাসিকের এই শিল্প-কৌশলের মূলে রয়েছে ঔপন্যাসিকের নির্বাচনী ক্ষমতা। উপন্যাসের চরিত্র, মিলিউ, প্লট এবং ঘটনাংশ সমস্ত কিছুতেই

লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতারই প্রকাশ ঘটে। যেহেতু আধুনিক সমাজ এবং সভ্যতার সমস্ত কিছুই পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ এবং সংযুক্ত সেইহেতু লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতার ভিতরেই সেই শক্তি রয়েছে যা ঘটনা, চরিত্র এবং টিনাটি বিষয় ও বিষয়াংশের নির্বাচনে জীবনের গোটা রূপকে আভাসিত করে তোলে। উল্লিখিত উদাহরণ-গুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে বর্ণনাংশের যেসব ছোট ছোট কাজের উপর জীবনের মায়া-সৃজন নির্ভর করে রয়েছে, সেগুলি লেখকের নির্বাচনী ক্ষমতার ফল। এই নির্বাচনী ক্ষমতা একদিকে লেখকের কাছে ঋণী আর একদিকে তা উপন্যাস-ধৃত সমগ্রতার সঙ্গে অন্বিত। যে বিশিষ্ট জীবনবোধ লেখকের সৃষ্টিগর্ভ মানসিক অবস্থা গড়ে তুলেছে এই নির্বাচনী ক্ষমতা আসলে তারই সন্তান। পরিবেশ এবং পরিবেশ-ধৃত মানুষকে উপলব্ধির ব্যাপারে লেখকের মনীষা কত-খানি সাহায্য করেছে এই নির্বাচনী ক্ষমতা তারও প্রমাণ বটে। এই নির্বাচনী ক্ষমতা শিল্প এবং জীবন এই দুই কূলে সমদৃষ্টি রাখতে পারলে কখনোই যাত্রাভ্রষ্ট হয় না। জীবনের মায়া-সৃজনের রহস্য মোটামুটি এই। একটি অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ সৃষ্টিগর্ভ মানসিক অবস্থাসম্পন্ন শিল্পী যখন জীবনকে তাঁর শিল্পের রূপকে ধরতে চান তখন এই নির্বাচনী ক্ষমতাতেই তাঁর প্রথম পরিচয় মেলে। তাঁর প্রধান পরিচয় অবশ্যই অন্যত্র।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ : বাংলা উপন্যাস মঙ্গলকাব্য বা মৈমনসিংহ গীতিকা থেকে জন্ম নেয়নি। মধ্যযুগ নয়, আধুনিক যুগই উপন্যাসের স্রষ্টা। উনবিংশ শতকের বাংলা দেশে সেই আধুনিক নাগরিক যুগের প্রতিষ্ঠা। মুদ্রাযন্ত্র ও সাময়িক পত্র এই নাগরিক সমাজের সঙ্গে যুক্ত। মধ্যযুগে সর্ব দেশে পরলোক-চিন্তা ছিল বড়ো, আধুনিক যুগে যেমন ইহলোক-চিন্তা। আধুনিক যুগে নাগরিক সমাজে দেখা দেয় Reading Public বা পড়ুয়া-সাধারণ, যেমন অধুনা-পূর্ব যুগে ছিল Listening Public বা শ্রোতা-সাধারণ। এই পড়ুয়া-সাধারণের সঙ্গে উপন্যাসের যোগ অচ্ছেদ্য। কাজেই মুদ্রাযন্ত্র, সাময়িক পত্র ও পড়ুয়া-সাধারণ মিলে উপন্যাসের জন্ম দ্রুততর করে তোলে। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ১৮২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ও ৯ জুন তারিখে 'বাবুর উপাখ্যান' বার হয়। 'প্রমথনাথ শর্মা' ছদ্মনামে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) ঐ ধরনের নকশারই বিস্তৃত রূপ। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের

ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) উক্ত ধারাকে শিল্পসম্মত রূপ দেবার প্রথম প্রয়াস। রাজনারায়ণ বসু প্যারীচাঁদকে ফিল্ডিংয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'হুতোম পেঁচার নক্শা' (১৮৬২) বিচ্ছিন্ন নক্শার সমষ্টি কিন্তু বাস্তব ও জীবন্ত। খ্রীষ্টান মহিলা হানা ক্যাথারীন্ মুলেন্স্ রচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২) খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করলেও বাংলা সামাজিক উপন্যাস হিসাবে উল্লেখযোগ্য। 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯) এই ধরনের আরেকখানি বই। এর রচয়িতা সম্ভবত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। অবশ্য এই উপন্যাসগুলির মূল্য মুখ্যত সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রশস্তি কীর্তন করতে গিয়ে 'বিজয়বসন্ত', 'কামিনীকুমার', 'গোলেবকাওলি' প্রভৃতি বই সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য সংগতভাবেই করেছেন। এই ধরনের বহু 'বটতলার বই' কিন্তু পূর্বকথিত পড়ুয়া-সাধারণের প্রিয় ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি গ্রন্থের আদর্শে কিছু বই লেখেন। এগুলির মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' (১৮৫৪) উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি কাব্য, নাটক, উপন্যাসের বিষয় নিয়েও বই লেখা চলছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) পূর্বে রচিত এই পর্যায়ের বইয়ের মধ্যে সেরা রচনা হলো ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭)। বিষয়টি তিনি গ্রহণ করেছিলেন কনটরের লেখা 'দি মারহাট্টা চীফ' থেকে। কাহিনীটি 'দি রোমান্স অব হিস্টরি' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে কাহিনী বর্ণনায় ও চরিত্রসৃষ্টিতে ভূদেবের স্বকীয়তা স্বীকার্য। বঙ্কিম-পূর্ব যুগে বাংলা উপন্যাসের এইভাবেই সূচনা হয়েছিল। পড়ুয়ারা এইসব বই পড়ে সেকালে আনন্দ পেত।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের সম্ভাবনাকে বহু গুণ বাড়িয়ে দিল। ঐতিহাসিক রোমান্সের স্বাদ বাংলা উপন্যাসে পুরোমাত্রায় পাওয়া গেল। 'ভিলেন'-বর্জিত, নীতি-তত্ত্ব বা আদর্শবাদ-বঞ্চিত 'দুর্গেশনন্দিনী' খাঁটি রোমান্স। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) কাব্যময়ী রোমান্সের অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) 'দুর্গেশনন্দিনী'র তুলনায় অধিকতর ইতিহাসাশ্রয়ী। বোধকরি বঙ্কিমচন্দ্র এইজন্যই এই গ্রন্থখানিকে প্রথম সংস্করণে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' আখ্যা দিয়েছিলেন। তখন 'হিন্দুমেলা'র (১৮৬৭) যুগ, 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বঙ্কিম জাতীয়তাবাদ উপস্থিত করলেন। বঙ্কিমের পার্শ্বে

বাংলা উপন্যাস সত্যই 'সহসা শৈশব হইতে যৌবনে উপনীত হইল'। এর পর ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস ঐ পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক ও কাব্যধর্মী রোমান্সের পরিবর্তে এবার 'নভেল' রচনায় অগ্রসর হলেন বঙ্কিম। 'বিষবৃক্ষ'কে সামাজিক উপন্যাস বা social novel বললে ভুল করা হয়। 'বিধবা বিবাহ' এই উপন্যাসের সমস্যা-গর্ভ ঘটনা হলেও, অলৌকিক ঘটনা থাকা সত্ত্বেও 'বিষবৃক্ষ'কে (১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের সূচনা বলা চলে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ (১৮৭৮) বঙ্কিমচন্দ্র অলৌকিকতা বর্জন করেন, গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণী চরিত্রের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে আরো ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র 'নীতি'র দিক মেনে চলতেন। তাঁর উপন্যাসে শিল্পধর্মের সঙ্গে নীতিধর্ম মিলে গেছে। যেমন 'আনন্দমঠ' (১৮৮২)' 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭) উপন্যাসে গীতার নিষ্কামতত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' (১৮৯৩) যেমন বাংলা সাহিত্যে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে গণ্য, তেমনি তাঁর 'রজনী' (১৮৭৭) নায়ক-নায়িকার আত্মকথনমূলক উপন্যাসরূপে নবপথের সূচক। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের অবয়ব, ভাষা, বক্তব্য, চরিত্রসৃষ্টি সবদিকই গড়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র (১৯১০) প্রকাশকাল পর্যন্ত বঙ্কিমী ধারাই মূলত বহমান। সে-ধারা থেকে সম্পূর্ণ নতুন ধারার সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসে 'সবুজপত্রে'র মাধ্যমে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) ডিকেন্সের পন্থানুসারী। সমকালীন বাংলাদেশের গ্রাম্য-সমাজের হিন্দু-যৌথ পরিবারের বিশ্বস্ত আলেখ্য। প্যারীচাঁদ মিত্র, লালবিহারী দে, রমেশচন্দ্র দত্ত এই ধরনের 'সামাজিক উপন্যাস' রচনায় আগ্রহী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মতো উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষমতা এঁদের অনায়ত্ত ছিল। রমেশচন্দ্র দত্তের 'সমাজ' (১৮৯৪) ও 'সংসার' (১৮৮৬) উপন্যাস দুখানিতে বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন রয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তিনি প্রগতিশীল হলেও শিল্পী হিসেবে প্রায়-ব্যর্থ। তিনি সার্থক হয়েছেন বহুলাংশে 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৭৯) ও 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮) নামক দুখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসে।

ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বে ব্রাহ্মসমাজ ও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' (১৮৭৪), যোগেন্দ্র-

চন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী (১৮৮৬) তার দৃষ্টান্ত। এই ধরনের ব্যঙ্গ থেকে মুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর উল্লেখযোগ্য রচনা 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' (১৯০২)। ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিক থেকে এই পর্বে রচিত প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (প্রথম পর্ব ১৮৬৯ ; দ্বিতীয় পর্ব ১৮৮৪) এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) ও 'মিবাররাজ' (১৮৭৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদ্ভট ও রূপকথার রসের সঙ্গে মিলিয়ে সমাজের বাস্তবরূপকে আঁকবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২)।

এই সময়ের শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবৌ', 'যুগান্তর', 'নয়নতারা' প্রভৃতি উপন্যাস বঙ্কিমধারার নয় ; এগুলি পারিবারিক বা গার্হস্থ্য উপন্যাস, সুনীতিমূলক। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি', 'শক্তিকানন' উপন্যাস দুখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা। 'শক্তিকানন' (১৮৭৭) প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'ওর মধ্যে কোন নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই।... আপনি কোনরকম ঐতিহাসিক বিড়ম্বনায় যাবেন না।' কিন্তু শ্রীশচন্দ্র 'ফুলজানি'তে রোমাঞ্চকর তথা 'ঐতিহাসিক' ঘটনা এনে 'বিড়ম্বনা' ঘটিয়েছেন। এইভাবে উনবিংশ শতকে বাংলা উপন্যাস নানা শাখায় বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করল। বিংশ শতকের সূচনা আর রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' একসূত্রে গাঁথা। বঙ্কিম প্রদর্শিত পথে এই উপন্যাসের যাত্রা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র যাকে 'সীতারাম' প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'অন্তর্জীবন প্রকটন' এবং রবীন্দ্রনাথ যাকে আরো বিশদ করে বলেছেন 'আঁতের খবর' তার সুচিহ্নিত রূপ এই 'চোখের বালি' (১৯০৩)। 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) রচনা হিসেবে শিথিলবন্ধ, দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে 'সংস্কার'-প্রবণ কিন্তু অ-বাস্তব নয়। 'নৌকাডুবি'র গল্পাংশে ফাঁক থাকায় এর রস জমাট হয়নি। 'গোরা' (১৯১০) উনবিংশ শতকের রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সংঘাতের মহাকাব্যোচিত রূপ। আখ্যান, চরিত্র ও ঘটনার পূর্ণ সামঞ্জস্য তথা রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-আবিষ্কার' এই উপন্যাসের অপর বৈশিষ্ট্য। এর পর ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) অপরদিকে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' নামক সাহিত্য পত্রিকার আত্মপ্রকাশ (১৯১৪)। রবীন্দ্রনাথ এবার কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে ও গদ্যভঙ্গিতে সবদিক থেকেই নতুন। 'চতুরঙ্গ' প্রথম যথার্থ 'রাবীন্দ্রিক' উপন্যাস। বুদ্ধিধর্মী, কাব্যধর্মী হয়েও জীবনের গভীরতলের দুঃখ রহস্যব্যঞ্জনা

চমৎকারভাবে ফুটে উঠল এই উপন্যাসে। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটি অভিনব ধারার সূচনা হলো। অবচেতন মন শিল্পরূপ নিয়ে দেখা দিল। 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় নিখিলেশ-সন্দীপ-বিমলার জীবনালেখ্য রচনা করলেন। এখানে বাইরের জগতের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত চরিত্রগুলির জীবনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এই উপন্যাসের আসল মূল্য প্রত্যেকটি চরিত্রের মনোজগতের পথ হাঁটার নিপুণ বিশ্লেষণে। এর পর রবীন্দ্রনাথ বহুদিন উপন্যাস রচনায় হাত দেননি। প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় এই কালে লেখেন—'রমাসুন্দরী' (১৯০৮), 'নবীন সন্ন্যাসী' (১৯১২), 'রত্নদীপ' (১৯১৫), 'সিঁদুরকৌটা' (১৯১৯)। তিনি রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে থাকলেও ভিন্ন মনের শিল্পী ছিলেন। তিনি সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের জনপ্রিয় লেখক। কৌতুক ও সহানুভূতি মিশে তাঁর উপন্যাস উপভোগ্য হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের নিয়ে চলে গেলেন 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬)-এ 'অরক্ষণীয়া'র (১৯১৬) জীবনকে খুলে দেখাতে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে এদের পূর্বাভাস ছিল, কিন্তু উপন্যাসে শরৎচন্দ্রই প্রথম তাকে পূর্ণাঙ্গরূপে দেখালেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি উভয়ই তাঁর ছিল। শরৎচন্দ্রের ভূমিকাকে সেদিন যে বিদ্রোহী বলা হয়েছিল তার প্রধান কারণ তাঁর নারীর নবমূল্যায়ন। 'চরিত্রহীন'-এ সাবিত্রী ও কিরণময়ী, 'শ্রীকান্ত'-য় রাজলক্ষ্মী ও অভয়া প্রভৃতি চরিত্র তার দৃষ্টান্ত। 'গৃহদাহ' উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'র পর বার হয় (১৯২০)। এক নারীর চিত্তমুকুরে বিবাহের পরও দুটি পুরুষের প্রতিবিম্ব কী করুণ ট্রাজিডি ঘটিয়েছে তার শিল্পরূপ 'গৃহদাহ'। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বাংলা উপন্যাস বক্তব্যে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, গঠনে যে ক্রমেই দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসগুলি তার সাক্ষ্য দেয়। শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১) তিরিশের যুগের যোগ্য বই, অর্থাৎ প্রশ্নপ্রধান, বুদ্ধিধর্মী। কিন্তু উপন্যাস হিসেবে সার্থক নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকা বার হয়। য়ুরোপীয় উপন্যাসের রোমান্টিক বোহেমিয়ানা, যৌনবিদ্রোহ, ন্যাচারালিজম্, সবই আসতে লাগল বাংলা উপন্যাসে তরুণদের হাত দিয়ে। 'কল্লোলে'র অন্যতম নায়ক গোকুল নাগের 'পথিক' রোমান্টিক বোহেমিয়ানার দৃষ্টান্ত। এসময় হ্যাম-সুনের বই অনূদিত হচ্ছিল, 'ভ্যাগাবণ্ড', 'প্যান্', 'হাঙ্গার' প্রভৃতির অনুকরণ দেখা যাচ্ছিল। অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' এই বোহেমিয়ানা, যৌনবিদ্রোহ ও

ন্যাচারালিজমের দৃষ্টান্ত। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত যৌনবিদ্রোহ ও অপরাধতত্ত্বকে বাংলা উপন্যাসে এঁদের আগে স্থান করে দেন। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' একই বছরে ১৯২৯ সালে বই হিসেবে বার হয়। 'যোগাযোগ' ঠিক 'চতুরঙ্গ' বা 'ঘরে-বাইরে' ধরনের উপন্যাস নয়। গঠনের দিক থেকে 'গোরা'র প্যাটার্নই রবীন্দ্রনাথ রাখলেন, কাহিনীর পটভূমিকাও উনবিংশ শতকের শেষার্ধ। ভূস্বামী-অভিজাততন্ত্রের বিপ্রদাস ও বণিকী-ধনতন্ত্রের মধুসূদন যেন দুটি ভিন্ন সমাজব্যবস্থার প্রতীকস্থানীয়। এই উপন্যাসের নায়িকা কুমুদিনী যে রুচি, সংস্কার ও সুষমার মধ্যে, যে আদর্শলোকের মধ্যে বেড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে নব অর্থকুলীন দম্ভী মধুসূদনের কোনো দিক থেকেই মিল ঘটল না। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে কুমু পতিগৃহে ফিরে গেল বটে কিন্তু বলে গেল যাদের সন্তান সে লালন করছে তাদের দিয়ে সে একদিন ফিরে আসবে। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই সময় লিখেছেন 'মহুয়া'র 'সবলা' কবিতা, 'তপতী' নাটক ও 'নারীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ। 'যোগাযোগে'র কুমু চরিত্রের সঙ্গে এদের যোগ আছে। 'শেষের কবিতা', 'চার অধ্যায়', 'দুই বোন' বা 'মালঞ্চ' উপন্যাস হিসেবে সার্থক নয়।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' শরৎচন্দ্রের জগৎকে ছাড়িয়ে গেল। কিয়দংশে আত্মজীবনের ছায়াবহ এই উপন্যাসে পল্লীবাংলার দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারজীবন অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তার সঙ্গে দুর্গা ও অপুর সহজ প্রকৃতিপ্রীতি। শিশুমনের সহজাত রহস্য ও বিস্ময় এমন একটি অনবদ্য রূপে সহসা উপস্থিত হলো যা আমাদের কাছে ছিল অনেকটাই 'অনাস্বাদিত রসঃ'। তাঁর 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' রচনার পিছনে রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' বইয়ের প্রত্যক্ষ প্রেরণা। 'আরণ্যক' বইখানি বাংলা উপন্যাসে বিষয়ের দিক থেকে বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী। উত্তর-তিরিশে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের ভাঙনধরা ভূস্বামীতন্ত্র এবং আউরি-বাউরি-সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর উভয় স্তরে নরনারী জীবনকে রূপায়িত করলেন তাঁর উপন্যাসে। 'কবি' (১৯৪২), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৫), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসগুলি তার দৃষ্টান্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন ঔপন্যাসিকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অর্জন করা কর্তব্য। তিনি বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসা ও শিল্পীর অতন্দ্র দৃষ্টি নিয়ে নরনারীর জীবনের যে-আলেখ্য রচনা করলেন তার

সদৃশ রচনা আমাদের ঠিক ছিল না। 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় (১৯৩৬) মানিক বাংলা উপন্যাসের পরিধি ও গভীরতা উভয়ই বাড়িয়ে দিলেন। তবে প্রথম জীবনে তিনি ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু পরে তিনি মার্কসীয় শ্রেণীতত্ত্ব ও ইতিহাসের অর্থ-নৈতিক ভাষ্যকে বরণ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে তার পরিচয় আছে। বাংলা উপন্যাসে ফরাসি ঔপন্যাসিক প্রুস্ত রচিত *Remembrance of Things Past* উপন্যাসে ব্যবহৃত রীতিকে আনলেন গোপাল হালদার তাঁর 'একদা' উপন্যাসে। মননশীল উপন্যাস রচিত হয়েছে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা'-'আবর্ত'-'মোহানা' উপন্যাসত্রয়ীতে ; অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছয়খণ্ডে বিধৃত 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে ও দিলীপকুমার রায়ের 'মনের পরশ' প্রভৃতি উপ-ন্যাসে। বনফুল উপন্যাসের নব নব আঙ্গিকে চমকপ্রদ বৈচিত্র্য এনেছেন 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'সে ও আমি' থেকে 'হাটে বাজারে' পর্যন্ত। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় অদ্যাবধি লেখা সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস। চারটি চরিত্রের স্বগতকথনে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম রেখাও ধরা পড়েছে। বাংলা উপন্যাস নানা শাখায় আত্মপ্রকাশ করছে। Reading Public বা পড়ুয়া-সাধারণের সংখ্যা ও চাকুরিজীবীর হার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) থেকে ক্রমশ বেড়ে চলায়, পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপন্যাসের প্রকাশক ও লেখক বহুগুণ বেড়েছে। উনবিংশ শতক নিয়ে বহু উপন্যাস রচিত হচ্ছে, প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুনশী', বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম', প্রাণতোষ ঘটকের 'আকাশ পাতাল' প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। 'আঞ্চলিক' উপন্যাস তারাশঙ্কর রচনা করেছেন ; মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল', অমরেন্দ্র ঘোষের 'চর কাশেম', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্ব-পার্বতী' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে 'জাগরী' ছাড়া গোপাল হালদারের 'উনপঞ্চাশের পথ', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লালমাটি' প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'সৃষ্টি', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল', জরাসন্ধের 'লৌহ-কপাট', বরেন বসুর 'রংরুট', চাণক্য সেনের 'রাজপথ-জনপথ', গোলাম কুদ্দুসের 'বাঁদী', গুণময় মান্নার 'জুনাগড় স্টীল' প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের দিগন্তকে যুগপৎ প্রসারিত ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে।

বাংলা উপন্যাসে মহিলাদের স্থান বেশ উল্লেখযোগ্য। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতা দেবী ও শান্তা দেবী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পূর্বযুগের লেখিকা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে প্রতিভা বসু, বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী, সাবিত্রী রায় প্রভৃতি লেখিকাদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলা উপন্যাসের আরেকটি উজ্জ্বল অধ্যায় রচিত হচ্ছে পূর্ববাংলার (বাংলাদেশের) ঔপন্যাসিকদের হাতে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে যখন য়ুরোপীয় উপন্যাসের নকল বেশি মাত্রায় দেখা দিচ্ছে, তখন বাংলাদেশের উপন্যাসে পদ্মা-নদীর বুকে নতুন-জাগা চরের পলিমাটিতে প্রাণরসে উচ্ছল ধান্যশীষের মতো উপন্যাসের সুস্থ সূচনা হচ্ছে। মধ্যবিত্ত ও চাষী মুসলমানের জীবনের কথাচিত্র অকৃত্রিম রঙে ও রেখায় আঁকা হচ্ছে। বাংলা উপন্যাসে মুসলিম জীবন ছিল 'অতি সামান্য', কিন্তু বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের হাতে সে জীবন আজ হয়ে উঠছে 'অসামান্য'। বহুর মধ্যে আলাউদ্দীন আল আজাদের 'কর্ণফুলী,' (১৯৬২), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২), রশীদ করীমের 'উত্তম পুরুষ' (১৯৬১), আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী' (১৯৫৫), রাজিয়া খানের 'বটতলার উপন্যাস', আবদুল রাজ্জাকের 'কন্যাকুমারী' (১৯৬১) ও শহীদ আহমদের 'পান্না হল সবুজ' উপন্যাসগুলির নাম এই প্রসঙ্গে করা যায়।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্যায়): বাংলা ছোটগল্পের প্রথম জন্ম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ; বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২২) 'মধুমতী' (১৮৭৩) বাংলা ভাষার প্রথম স্বয়ং-সিদ্ধ ছোটগল্প। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা) 'উপন্যাস' অভিধা নিয়ে গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। আসলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই সদ্য-উদ্ভিন্ন নানা সাহিত্য-সাময়িকীর প্রয়োজনে ছোট আকারের বিচিত্ররূপ গল্প প্রকাশিত হয়ে আসছিল ; সেই অসংজ্ঞান প্রচেষ্টার সূত্রেই বাংলা ছোটগল্প-রূপের প্রথম উদ্ভব। ছোটগল্পও মূলত এক বিশেষ রকমের ছোট আকৃতিরই গল্প ; স্বাতন্ত্র্য কেবল গঠনরীতি আর স্বাদুতার বৈশিষ্ট্যে। সেই তাৎপর্যেই, লেখকের পক্ষ থেকে প্রথমাবধি রূপ-রসগত অনবধান সত্ত্বেও, 'মধুমতী' একটি সদ্য-অঙ্কুরিত

ছোটগল্পই। তার জীবন-চিন্তায় গাঢ়তা, বিবৃতি-সংক্ষিপ্তির আগ্রহ, স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনাকুশল বাক্‌রীতি-মাধ্যমে বিস্তীর্ণ এক জীবন-সমস্যাকে তির্যক-প্রতিফলন-প্রভাবে বিন্দু-সংহত করে তোলায় পরিণামী প্রয়াস,—এই সব কিছুতেই 'মধুমতী'র ছোটগল্প-ত্ব।

প্রায় একই সময়ে অনবহিত শিল্পি-চিত্তের আরো দুটি ছোটগল্পাঙ্কুরিত স্মরণীয় ফসল পাওয়া গেছে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-৮৯) 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' আর 'দামিনী' গল্পে (১৮৭৪);

বাংলা ছোটগল্প রূপ-রস-সচেতন প্রথম পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) হাতে,—'দেনাপাওনা' গল্পে (১৮৯১)। 'ছোটগল্প' অভিধাটিও আঙ্গিকগত বিশেষ তাৎপর্যে তাঁরই প্রথম প্রয়োগ। তার আগেকার অর্ধসংজ্ঞান পথ-সংবাহনের সকল ইতিহাস-পরিচয় বিধৃত আছে অন্যান্যদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) আর নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬০-১৯৪০) বহুসংখ্যক হ্রস্বাকৃতি গল্প রচনায়। এঁরা দুজনেই প্রধানত ছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার লেখক; তাঁদের প্রথম গল্প-সংকলন-গ্রন্থও (যথাক্রমে 'নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্প' এবং 'সংগ্রহ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস') প্রকাশিত হয়েছিল একই বছরে (১৮৯২)।

অপেক্ষাকৃত পরাগত হলেও এই ধারাতেই অবিস্মরণীয়তা দাবি করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯); রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধরূপ ছোটগল্পশিল্প যখন প্রতিষ্ঠাভিমুখী, এমন সময়ে অপরূপ স্বাদুতাবহ আজগুবি রসের মজার গল্প লিখলেন তিনি; অবয়বে শিথিল হলেও আকারে ছোট এই গল্পগুলির গাল্পিক সমৃদ্ধি অবশ্যই স্বীকার্য।

একেবারে প্রথম পর্যায়ের রবীন্দ্র-গল্পাবলীও ছিল বিস্রস্তরূপ; তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' (ভারতী ১৮৭৭); এবং 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা', ও 'মুকুট' গল্প-ত্রয়ও কেবল রূপে নয়, রসেও দুর্বল। 'দেনাপাওনা' ছাড়াও তাঁর আরো পাঁচটি রূপ-রস-সফল ছোটগল্প মাসিক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল 'হিতবাদী'তে (১৮৯১); এবং ঐ বছর থেকেই 'সাধনা'য় তাঁর খ্যাততম গল্পগুলিও প্রকাশিত হতে থাকে—বাংলা ছোটগল্পের গতিপথ সুনিশ্চিত রেখায় চিহ্নিত হয়ে যায় তখনই।

পথান্তর গমনের সম্ভাবনাও কিন্তু ছিল: স্বতন্ত্র প্রয়াসে তার আয়োজন

করেছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির (১৮৭০-১৯২১) ‘সাহিত্য’-পত্রিকাগোষ্ঠী। প্রতীচ্যের বিচিত্র সুপরিণত ছোটগল্প-রীতির সচেতন অনুসরণে আঙ্গিকসিদ্ধ বাংলা ছোটগল্পসাহিত্যের ধারা প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন তাঁরা। মূল ফরাসি থেকে ‘ফুলদানী’ নামে প্রস্পের মেরিমির একটি গল্পের অনুবাদ করেছিলেন (১৮৯১) প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। বাংলা ভাষায় মূলানুগত ফরাসি ছোটগল্পানুবাদের প্রথম কৃতিত্ব অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯৪৬)। তাহলেও ‘সাহিত্যে’ প্রমথ চৌধুরীর গল্পানুবাদ অনুবাদ-গল্প রচনার ধারা অবারিত করেছিল কিছুকাল। কিন্তু পরিণামে আমাদের ছোটগল্প রবীন্দ্রপ্রবর্তিত মৌলিক সৃজন-পন্থাই অনুসরণ করেছে,—আঙ্গিকে এবং কল্পনায় প্রতীচ্য-প্রভাব তাতে অনস্বীকার্য হলেও একমাত্র হতে পারেনি কখনোই।

মৌলিক গল্প-রচনার স্বাধীন চেষ্টাও করেছিলেন ‘সাহিত্য’-পত্রিকা; সম্পাদক নিজেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র স্মরণীয়তার গৌরবাধিকারী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৬৬-১৯৩১); তাঁর হাসির গল্পগুচ্ছ নিঃসন্দেহে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) ও রাজশেখর বসুর (‘পরশুরাম’—১৮৮০-১৯৬০) বিশ্রুত কৌতুক সহাস গল্প-সাহিত্যের পূর্বসূরিত্ব দাবি করতে পারে।

মাঝে মাঝে বিরতি-চিহ্নিত হলেও রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধ ছোটগল্প রচনার ইতিহাস প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপ্ত (১৮৯১-১৯৪১) হয়েছিল। এই সময়-সীমায় অন্যূন ৮৯টি গল্প তিনি লিখেছিলেন; ‘মুসলমানীর গল্প’ রবীন্দ্র-কল্পিত সর্বশেষ গল্প-খসড়া। এই সংখ্যাধিক সমৃদ্ধ গল্পসাহিত্যে মোপাসাঁ, চেকভ্, টুর্গেনিভ্, পো প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিদেশী গাল্পিকগণের প্রভাব লক্ষিত হয়েছে,—নানা প্রকারে এবং পরিমাণে। তাহলেও রূপ-রসে বিচিত্র রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শৈলীও আসলে তাঁর আন্তর উপলব্ধি এবং গল্প-বাচ্যের দ্বারা প্রধানত নিয়ন্ত্রিত। জীবন-অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য এবং বাক্‌স্বাতন্ত্র্যের এই নিরিখে তাঁর গল্পগুচ্ছকে মোটামুটি চারটি স্থূলাঙ্কিত বিভাগে পৃথক্ করা সম্ভব। প্রথম পর্যায়ের গল্পগুচ্ছ (১৮৯১-৯৫) পদ্মাতীরের প্রাথমিক জীবনানুভবে আবেগ-তপ্ত; প্রকৃতি-লালিত সহজ-মানুষের অনাড়ম্বর জীবন-কথা মুখ্যত সাঙ্গীতিক সুরাবেশে আবিষ্ট। দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৮৯৮-১৯০৭) গল্প-চিন্তনে উনিশ শতকের শেষ দিগন্তবর্তী রাজনীতি এবং ধর্ম-সমাজ পরিবারনীতি-মুখ্য নানা সমস্যার অবধান নিবিষ্টতর বাক্‌রীতি এবং

সুকল্পিত গঠন-পারিপাট্যে উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। এইসব গল্পের অধিকাংশই 'সাধনা'র জন্য লিখিত হয়। পরবর্তী 'সবুজপত্র'-যুগের (১৯১৪-১৭) গল্পাবলীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-কালের অসংখ্য দেশি-বিদেশি জীবন-জটিলতার আকস্মিক চমক ভাষা এবং প্রকাশ-রীতিতেও বয়ে এনেছে তির্যক্ বাক্-কুশলতাপূর্ণ একপ্রকার বুদ্ধি-শাণিত কাব্যিকতার দ্রুতগতি। একেবারে শেষ পর্যায়ের (১৯৪০-৪১) গল্পসমষ্টি ছোটগাল্পিক সংগঠনে যথেষ্ট সংহত নয়,—কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কুড়ি থেকে দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন চল্লিশের দশকের সীমান্তলীন বিচিত্র, বিতর্ক-উত্তাল আধুনিক-মনস্কতার স্ব-বিরোধ-পীড়নের অবরোধ-উত্তরণের আগ্রহে উদ্বেল; বাক্তীক্ষ্ণতা এবং কাব্যিকতার মিশ্রণে প্রয়োগ-রীতিও হয়েছে অভিনব মননোজ্জ্বল।

তাছাড়া নিতান্ত বহিরাঙ্গিকগত বিচ্ছিন্ন বিচারেও রবীন্দ্রনাথের এই বহুল সংখ্যক ছোটগল্পে (চার খণ্ড 'গল্পগুচ্ছে' সম্পূর্ণ সংকলিত) নাটকীয়তা, সুরাবহ, সংকেতবাহী ব্যঞ্জনাধর্ম ইত্যাদি আদর্শ-ছোটগল্পশৈলীর প্রত্যাশিত সকল উপাদানই সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে যথাস্থানে,—যথাপরিমাণে।

এইসব দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালব্যাপী ছোটগল্প-রচনার ইতিহাস আসলে পঞ্চাশ-পূর্ব বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্প-সাহিত্যেরও দিগন্ত-সীমা; নানা দিক থেকে, বিভিন্ন তাৎপর্যে এই যুগের গল্প-নির্মিতি বস্তুত রবীন্দ্রানুবর্তনেরই ইতিহাস।

পিতার গল্প-রচনার নিবিড় ভাব-প্রভাব কবি-কন্যা মাধুরীলতাকে (১৮৮৬-১৯১৮) স্বল্প কয়টি উল্লেখনীয় গল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথের (১৮৬৯-১৯২৯) মিতবাক্ নাটকীয়তা-সংহত সরল গল্পগুলিতে লেখকের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে রবীন্দ্রানুগত্যের ছাপও সুস্পষ্ট। কিন্তু বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রানুবর্তনের গাঢ়তম প্রকাশ 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই। কেবল স্বর্ণকুমারী এবং রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালেই নয়, প্রায় সর্ব সময়েই 'ভারতী'র গল্পের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল ছিল। কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) এবং মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮৮-১৯২৯) যুগ্ম সম্পাদনাকালে (১৯১৫-২৪) রবীন্দ্র-ভক্ত শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকগণের মেলবন্ধন ঘটে 'ভারতী-গোষ্ঠী' নামে। এমনকি অবনীন্দ্রনাথও (১৮৭১-১৯৫১) এই সময়ে ধরা দিয়েছিলেন অভিনব রসের গল্প-চিত্র নিয়ে। কিন্তু সম্পাদক-যুগ্মের সমসূত্রেই 'ভারতী-গোষ্ঠী'র

গাল্পিকদের মধ্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৮ ১৯২৮) গল্প-রচনায় রবীন্দ্র-স্বর সর্বাপেক্ষা সোচ্চার। এই গোষ্ঠীর সাগ্রহ গল্পানুবাদকদের মধ্যে মণিলাল তাঁর মৌলিক রচনার মতোই স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত; কেবল কন্‌টিনেন্‌টাল নয়, জাপানি গল্পের অনুবাদও করেছিলেন তিনি। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪) ঋজু শাণিতবাক্ ছোটগল্পে এবং হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) রহস্যগল্প লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। অবশ্য 'রহস্যলহরী সিরিজে'র শ্রেষ্ঠ গল্পকার ছিলেন সেদিন দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩)।

আলোচ্য কালসীমায় রবীন্দ্রানুগত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কিন্তু ছোটগাল্পিক প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২); 'ভারতী' ছাড়াও স্ব-সম্পাদিত 'মানসী ও মর্মবাণী'তে তাঁর অধিকাংশ গল্পের প্রকাশ। রচনা সংখ্যা এবং রূপ-রসের বিস্তার-বৈচিত্র্যে ইনি এ-যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প-শিল্পী।

'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষণেই প্রথম স্মরণীয় মহিলা ছোটগল্প-শিল্পীদের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা; এঁদের প্রধান আদর্শ ও আকর্ষণ ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রখ্যাত উপন্যাস-শিল্পী অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) ছোটগল্পও লিখেছিলেন; কিন্তু তাঁর অগ্রজা ইন্দিরা দেবী (১৮৭৯-১৯২২) এবং পরবর্তীকালের বান্ধবী নিরুপমা দেবীই (১৮৮৩-১৯৫১) ছোটগল্প-শিল্পে উজ্জ্বলতর সফলতার অধিকারিণী হয়েছিলেন। প্রথম যুদ্ধ-পূর্ব বাঙালির সমাজ ও পরিবার-জীবন-সম্পর্কিত বিচিত্র জিজ্ঞাসা ও সমস্যা নারী-চিত্তের স্নিগ্ধ অনুভবে নিবিড় হয়ে দেখা দিয়েছে এই সব গল্পে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে এলেও শান্তা (১৮৯৩-১৯৮৪) ও সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪) 'প্রবাসী'র সমৃদ্ধ ছোটগল্পের আসরে প্রায় একই রস এবং মেজাজের গল্প লিখেছিলেন, এঁদের ভাব-নৈকট্য ছিল রবীন্দ্র-রচনা এবং ভাবনার সঙ্গে। শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪) এবং প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫-১৯৭২) আরো দুজন স্মরণীয় মহিলা-শিল্পী; শৈলবালা বিশেষভাবে তথাকথিত অন্ত্যজ, এবং মুসলমানী জীবন-ধারা নিয়ে গল্প লিখে নবীন রসসৃষ্টি করেন।

এই সকল গল্প-সাহিত্যে মুখ্যত ১৯০৭ খ্রীষ্টসাল-সীমায় রচিত রবীন্দ্র-গল্পচিত্রেরই অনুবর্তন ঘটেছে ব্যক্তিত্ব-বিলম্বী নূতন বাক্‌রীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির সহযোগে। এই ধারারই এক স্বতন্ত্র প্রতিশ্রুতিপূর্ণ গোষ্ঠীগত প্রয়াসের সূচনা ঘটে ভাগলপুরে কিশোর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৭৬-১৯৩৮) কেন্দ্র করে। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলি সর্বত্র যথেষ্ট ছোট নয়, বাক্‌রীতিতেও ছোটগাল্পিক

সংহতির চেয়ে ঔপন্যাসিক বিস্তারের আগ্রহ বেশি। তাহলেও জীবনানুভবের আবেগ-উচ্চারিত নিবিড় ঘরোয়া সুর তাঁর গল্পগুচ্ছকে রূপ-রীতির অতীত জনপ্রিয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। 'কুন্তলীন' পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁর 'মন্দির' (১৩১০) গল্পটি প্রথম বহুল-প্রকাশিত বেনামী রচনা, এবং শরৎ-গল্পশিল্পের এক স্মরণীয় প্রতিনিধিও; 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' বড়গল্প প্রথম স্বনামে প্রকাশিত হবার উপলক্ষেই সাহিত্যের আসরে তাঁর স্থায়ী আবির্ভাব।

বাংলা ছোটগল্প-রচনার এক স্মরণীয় উদ্দীপনা-সূত্র কুন্তলীন পুরস্কার; কুন্তলীন কেশতৈল আর দেলখোস এসেন্সের বিজ্ঞাপন প্রচার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকারক এইচ্‌. বসু ১৮৯৩ খ্রীষ্টসাল থেকে ছোটগল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন,—রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, কিংবা ইন্দিরা-অনুরূপা দেবী প্রভৃতি সেকালের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের কিশোর-সঙ্গীদের মধ্যে বিভূতিভূষণ ভট্ট, গিরীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরবর্তীকালেও গল্প লিখেছিলেন; স্বাদে ও সুরে সুরেন্দ্রনাথের রচনা পরিণামে 'কল্লোল' দলের নৈকট্য লাভ করেছিল। এই দলের শ্রেষ্ঠ গাল্পিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০) সিরিয়াস এবং হাসির গল্প লিখেছিলেন অজস্র; তাতে নিবিড় স্নিগ্ধতা আছে কিন্তু উচ্ছ্বাসের অতিরেক নেই। তাঁর সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রখ্যাত ছোটগল্পের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'অতসী মামী'ও ছিল অন্যতম।

উনিশ শতকের রেনেসাঁস-ভাবনার উত্তর পর্বকে কেন্দ্র করে বাংলা ছোটগল্পে বক্তব্য এবং বাক্‌রীতির প্রথম বিশিষ্ট অভিব্যক্তি সূচিত হয়েছিল; সে-ধারার রূপরসগত প্রথম দিকপরিবর্তন ঘটতে পারল 'সবুজপত্রে' (১৯১৪) প্রকাশিত গল্পাবলীতে; রবীন্দ্রনাথের 'হালদার গোষ্ঠী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', ইত্যাদি গল্পে তার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প-শিল্পী ছিলেন স্বয়ং সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী; হৃদ্‌-ভাবনার বন্ধন-বিমুখ তাঁর চিত্তবৃত্তিমুখ্য তির্যক্‌ ভাষণোজ্জ্বল আজগুবি রসের গল্প-সৃষ্টিতে কথকতাপুষ্ট এক বৈঠকী ভঙ্গি গড়ে উঠেছে; তাঁর 'চারইয়ারী কথা'ও বিশেষ তাৎপর্যে অভিনব আঙ্গিকের চারটি গল্পেরই সমষ্টি। গল্পের শরীরকে উপলক্ষ মাত্র করে কাহিনী এবং রীতিচেতনা-নিরপেক্ষ মনন-নিষ্ঠ খেয়াল্‌পনার অতুলনীয় স্বাক্ষর রেখে গেছেন প্রমথ-শিষ্য ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) তাঁর 'রিয়ালিস্ট' নামক গল্প-সংকলন

গ্রন্থে। কিরণশঙ্কর রায়ও (১৮৯১-১৯৪৯) 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর আর এক স্মরণীয় শিল্পী ; মন এবং মননের মিশ্রণে তাঁর স্বল্পসংখ্যক গল্পগুচ্ছ স্বাদ-স্বতন্ত্র।

'সবুজ পত্র' যুগের এই গল্পগুচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-কালে উদ্ভূত স্বতন্ত্র মর্জির প্রতিফলন ; যুদ্ধোত্তর পরিবর্তিত মানসিকতার প্রথম পরিস্ফুট প্রকাশ কুড়ির দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। বিষয়বস্তুতে পুরাতনেরই পুনরাবর্তন লক্ষিত হতে পারে এ-কালের গল্পগুচ্ছেও ;—পদ্মাপারের রবীন্দ্রগল্পের মতোই,—দরিদ্রের বেদনা, নরনারীর সম্পর্ক-রহস্য ও তার বহু বিচিত্র প্রাসঙ্গিক জটিলতা, এবং স্বল্প পরিণামে সমসাময়িক রাজনৈতিক অভিঘাতের প্রতিক্রিয়াদি নিয়েই গল্পের উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। পার্থক্য কেবল মর্জির স্বাতন্ত্র্যে। দারিদ্র্য অপেক্ষা দীনতার আক্রোশ, নরনারীর জীবন-রহস্যের প্রসঙ্গে যৌনতার কুণ্ঠামুক্ত প্রকাশ ; রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবন-চিন্তনেও ক্ষুব্ধ নৈরাশ্যের প্রসার এই সময়ের গল্প-সাহিত্যের মজ্জাগত। যুদ্ধোত্তর অবদমন-পীড়িত যৌন মনস্তত্ত্বমূলক 'কন্‌টিনেন্‌টাল্‌' সাহিত্যের অনুসরণ-স্পৃহাই অতি-উদ্দীপ্ত হয়েছিল একেবারে প্রথম পর্যায়ে।

সে যাই হোক্‌, বিশেষার্থে বাংলা ছোটগল্পে 'আধুনিক' মর্জির দাবিতে যৌন মনস্তত্ত্ব-প্রক্ষেপণের প্রথমাগ্রহও আসলে রবীন্দ্র-গল্পভাবনারই পরিশিষ্ট-সূত্রে। এই ধারার অন্যতম অগ্রণী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৩) তাঁর প্রথম চমকপ্রদ 'ঠানদি' গল্প লিখেছিলেন 'নষ্টনীড়' গল্পের কুণ্ঠা-অবরোধ অতিক্রমণের সচেতন উৎসাহে। গল্প-বাণীর চেয়ে বিশিষ্ট বক্তব্য প্রতিফলনের অত্যাগ্রহ শিল্পীর সহজ শক্তিকে নিষ্প্রভ করেছে। তাহলেও উচ্ছ্বসিত তারুণ্যের বহুভাষিত 'রবীন্দ্রোত্তরণের' ঝাঁঝালো আগ্রহ এখানেই উদ্দীপিত হয়ে সংঘবদ্ধ হতে পেরেছিল 'কল্লোল', 'কালিকলম' এবং গৌণত 'প্রগতি', 'উত্তরা' প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায়। 'কল্লোলে'র প্রথম প্রকাশের (১৯২৩) পূর্বাবধি আত্মসংবৃত এক নিজস্ব ভঙ্গিতে 'আধুনিক' মানসিকতার লালন-উদ্দেশ্যে গল্প লিখে উল্লেখ্যতার ভাজন হয়েছিলেন মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭-১৯৮৬), সুনীতি দেবী, এবং 'কল্লোলে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক যথাক্রমে দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮০৮-১৯৫১) এবং গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫)। এ-কালের গল্পে ছোটগল্পের পুরাপ্রচলিত গঠন-সম্পূর্ণাঙ্গতা বিধ্বস্ত হয়েছে, কোথাও সুর, কোথাও কবিতার ঝঙ্কার, কোথাও বা ব্যঞ্জনা-তির্যক বাকভঙ্গি নূতন সংকেতবাহী শৈলীর সূচনা করেছে।

'কল্লোল'-গোষ্ঠীর জনপ্রিয় নাম অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-ত্রয়ী, শৈলজানন্দ

মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩) প্রভৃতি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬) অভিজ্ঞতা ব্যাপক ; তাঁর গল্প-বিষয়ও প্রায় সর্বগ,—প্রকাশরীতিতে সর্বত্রই কথা-ঝঙ্কৃত কথকতার আগ্রহই প্রধান ;—বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) গল্পে গল্পবস্তু হাতে ধরা যায় না, সুরেলা ভাষাই মুখ্য স্বাদবাহী,—যৌনতার আগ্রহ দুজনেরই প্রধান প্রবণতা ; যুবনাশ্ব ছদ্মনামে খ্যাত মণীশ ঘটকের (১৯০২-১৯৭৯) বস্তুঘন দৃঢ়সংবদ্ধ গল্পেও একই মানসিকতার অত্যুৎসাহী-প্রকাশ। শৈলজানন্দ প্রথম যুদ্ধোত্তর গল্প-সাহিত্যে নবতম জীবন-সীমান্তের আবিষ্কারক ; তাঁর 'কয়লাকুঠি'র গল্পে খনির অন্ধকার গহ্বরে, কিংবা গহন রাতে কুলিধাওড়ার তামসিকতার অন্তরালে খুঁজে পাই নিত্যদিনের সুখ-দুঃখলাঞ্ছিত শাশ্বত মানব-মানবীকে। পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক পল্লী-জীবনকথারও তিনি আর এক পথিকৃৎ কথাকার। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনের অন্তরঙ্গ উপাখ্যানও শোনা গেছে তাঁর কাছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) রবীন্দ্র-উত্তর ছোটগল্পে অবিস্মরণীয় নাম ;—গাল্পিকতা, কাব্যকুশলতা, নাট্যধর্ম এবং সংকেত-বহুলতার সকল পথেই সমান দক্ষতার সঙ্গে চলেছে তাঁর রস-ঘনিষ্ঠ ছোটগল্প-প্রসূ লেখনী। এঁদের অনেকেই প্রথম গল্প প্রকাশ করেছিলেন 'প্রবাসী' পত্রিকায়।

নজরুল ইসলামও (১৮৯৯-১৯৭৬) 'কল্লোলে'র ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন ; কিন্তু মুখ্যত অন্যত্র প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্পের স্মরণীয়তা রচনাগুণে নয়, রচয়িতার প্রাধান্য সূত্রেই ; উদ্দাম যৌবনের পরিস্ফীত সম্ভোগ-ব্যাকুলতা উল্লসিতবাক কাব্যাতিশায়ী গদ্যশৈলী আলোড়নে এক মদ-বিহ্বল রূপ ধারণ করেছে স্বল্পসংখ্যক গল্প দেহে ; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রেক্ষাপট এবং মুসলমান জীবন-প্রসঙ্গের অবতারণা মাঝে মাঝে স্বাদবৈচিত্র্যের কারণ হয়েছিল। এই সময়ে নিছক মুসলমান জীবন নিয়ে কিছুসংখ্যক ছোটগল্প লিখিত হয়েছিল ; শিল্পগুণ-বৈশিষ্ট্যের চেয়ে নূতন অভিজ্ঞতার প্রসারসূত্রেই এই প্রচেষ্টার মুখ্য স্মরণীয়তা।

'কল্লোল'-গোষ্ঠীর তরুণ চিত্তের উচ্ছ্বাস-মুখ্য সকল উল্লাস ও অবদমন, উত্তেজনা ও অবসাদ, ক্ষোভ এবং আক্রোশ অপেক্ষাকৃত বয়ঃপ্রবীণ জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৮) পিনদ্ধ-দেহ ছোটগল্পে প্রগাঢ় কঠিন রূপলাভ করেছিল। অন্যপক্ষে বয়ঃকনিষ্ঠ, অথচ দৃঢ় ঋজুভাষী গল্পশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) রচনায় একই মানসিকতা তীব্রতর যন্ত্রণার আশাহীন আক্ষেপে

সংহত আঙ্গিকবদ্ধ হয়ে পরিণামে মার্কস্‌বাদের সিদ্ধান্তে আশার আলো সন্ধান করেছে।

'কল্লোলে'র পৃষ্ঠাতেই প্রথম স্মরণীয় গল্প লিখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তার যত অপার-পাথার, প্রকাশের শৈলী তত সচেতন পরিশীলন-প্রয়াস-রহিত ;—মহাকাব্যের মতো প্রগাঢ়, অথচ সহজ-স্ফূর্ত। মুখ্যত রাঢ়ের পল্লীজীবন-কেন্দ্রিক আদিম জীবনরস-ঘনিষ্ঠ তাঁর বহু গল্পই এপিক্-উদাত্ততায় গুরুগম্ভীর।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীও (১৯০৩-১৯৭২) আসলে পল্লীমনস্ক শিল্পী ; যাঁর সুসংগঠিত গল্পদেহে বিশ এবং ত্রিশের দশকের রাজনীতি-অর্থনীতিগত বিচিত্র সমস্যারও স্নিগ্ধ-সুমিত অভিব্যক্তিলাভ সম্ভব হয়েছে। মনোজ বসু (১৯০১) উচ্ছ্বসিতবাক্ রোমান্স-আবিষ্ট গল্প-শিল্পী ; দূরগত গ্রামীণ জীবনের স্বপ্ন আর রাজনৈতিক আদর্শপ্রেরিত সমকালীন আত্মদান-যজ্ঞের বিস্ময় কাব্যঝঙ্কৃত রূপ ধরেছে তাঁর ছোটগল্পে।

একই সময়ে বিপরীত রস ও প্রকৃতির গল্প রচনায় গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিলেন শক্তিমান আরও একদল গল্প-শিল্পী ; 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর শিল্পীকুলের বাঁধন ভাঙার প্রতিকূলতাই ছিল এঁদের প্রথম প্রত্যক্ষ প্রেরণা। প্রথমে সাপ্তাহিক (১৯২৪) এবং স্বল্প পরে মাসিক (১৯২৭) 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর প্রাথমিক রচনা তাই ছিল ব্যঙ্গতীব্র হাস্যরসে ঝাঁঝালো। এঁদের গোত্রবর্ধন করেছিলেন অন্যথাখ্যাতকীর্তি রবীন্দ্রনাথ মৈত্রও (১৮৯৬-১৯৩৫)। 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর গভীর রসের রূপসিদ্ধ গল্পে রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-নীতিগত বিচিত্র সমস্যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উত্তাপে জীবন্মূর্তি ধারণ করেছিল, —উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজের অন্তরঙ্গ রূপ তাঁর মর্মগত ছিল। ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ গল্পগুলিও তাঁর হাতে অব্যর্থ-লক্ষ্য শাণিত তীরের মতো অভিব্যক্তি পেয়েছে। এই দলের কেন্দ্রমণি সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), স্বল্পকালীন সম্পাদক পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬), ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৬৫) প্রভৃতি ব্যঙ্গরসের হাসির গল্প রচনায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

স্বতন্ত্রভাবে হলেও 'প্র. না. বি.' প্রমথনাথ বিশীও (১৯০১-১৯৮৫) প্রধানত বিদ্রূপতীব্র হাসির গল্প-রচনার গৌরবেই স্মরণীয়, অন্যপক্ষে একালের প্রখ্যাত হাস্যরসিক গল্পকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৮৭) কৌতুকস্নিগ্ধ

রসের গল্পই লিখেছেন মুখ্যত।

প্রথম যুদ্ধোত্তর দুটি দশকের ইতিহাস-ব্যাপ্ত বিচিত্র আন্দোলনে আক্ষিপ্ত পরিবেশেও তপস্বী-সুলভ নিমগ্নতা নিয়ে স্নিগ্ধ-প্রত্যয়ের আধ্যাত্মিক স্বাদসুরভি-যুক্ত গল্প লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫৪), সরল অনাড়ম্বর বর্ণনাধর্মী গল্পের পরিধি সর্বত্র সুরেখ নয়, কিন্তু রসের স্নিগ্ধ সুপরিমিত আবেশ-নিবিড়। 'বনফুল' বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭৯) স্বতন্ত্র হয়েছেন তাঁর বিজ্ঞানী মেজাজের স্বকীয়তায়; রূপ-রীতি এবং জীবন-জিজ্ঞাসুতায় তাঁর নূতনতার কৌতূহল অতন্দ্র, অথচ নিত্য নূতনের মালিকা সর্বত্রই গ্রথিত হয়েছে শাশ্বত জীবন-প্রত্যয়ের দৃঢ় সূত্রে। নিবিড় জীবন-চিন্তনে মর্মস্পর্শী অথচ ঋজু স্বল্পবাক্ অতিহ্রস্ব একপ্রকার গল্প কণিকা রচনা ক'রে তিনি চিরস্মরণীয় হয়েছেন; তাহলেও সাংকেতিক ব্যঞ্জনা, কিংবা সংঘট্য-চকিত পূর্ণায়তন ছোটগল্পও তাঁর কম নয়,—ব্যঙ্গকৌতুকের পথেও তাঁর লেখনীর গতি অপ্রতিহত।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের (১৯০৪) স্বাতন্ত্র্য তাঁর জীবন-সচেতন অতন্দ্র মননশীল দৃষ্টির অন্তর্লীন গোপন মনোধর্মের গাঢ়তায়; প্রকাশের শৈলী বুদ্ধিচকিত সাংকেতি-কতায় স্নিগ্ধ উজ্জ্বল। জনপ্রিয় প্রবীণ শিল্পী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) অবশেষে রহস্য-গল্প রচনার দক্ষতাগুণেই সবিশেষ স্মরণীয় হতে পেরেছেন।

ত্রিশের দশকের শেষপাদ থেকেই বৃহত্তর ভারতের জীবনক্ষেত্রে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যাপীড়িত জীবনে প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানের আদর্শপ্রেরণা উদ্দীপিত হয়েছে; সেইসঙ্গে দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রথম পর্বের অবক্ষয়-অভিঘাতের আলোড়নও নূতন জীবনভাবনার তটপ্রান্তে ঘনীভূত হতে চাইছিল। এই সময়ের অভিনব গল্পরূপ 'তিনসঙ্গী' গল্পাবলীরও সীমান্ত পেরিয়ে চকিত হয়েছে রবীন্দ্র-নাথের 'বদনাম', 'মুসলমানীর গল্প' প্রভৃতিতে। সেই জীবন-স্রোতে অবগাহন ক'রে নবীন শিল্পীকুলের মধ্যে চল্লিশের দশকে অভ্যুদিত হলেন সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) প্রভৃতি;—রবীন্দ্র-তিরোভাবোত্তর কালের শিল্পী এঁরা। অন্যপক্ষে নূতন পরিবেশে আবহমান ধারা অনুসরণ ক'রে খ্যাতিলাভ করলেন মহিলা শিল্পী আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৮)।

আরো পরে যুদ্ধোত্তর জীবন ও দেশ-বিভাগে বিদীর্ণ স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের অজস্র সমস্যাকুলতার মধ্যে জীবনপ্রকৃতির মতো গল্পশিল্পীর অনচ্ছ দৃষ্টিও অন্ধকারে পথ খুঁজে ফিরছে,—বাংলা ছোটগল্পের ধারা আজ রূপরীতির অভাবিত-

পরিণাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার আবর্তে বিক্ষুব্ধ; তার আগেই নূতন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধতার সূচনামুখে নিবাত নিষ্কম্প প্রত্যয়ের আলোটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ গল্প লিখে বিদায় নিয়েছেন ১৯৪১ খ্রীষ্টসালে।

রূপ-রসের বিচিত্র আলোড়ন-আক্ষিপ্ত অধুনাতন বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে তাই নূতন আলোর উৎকণ্ঠ পিপাসুতাই আজ একমাত্র সাধারণ লক্ষণ।

ভূদেব চৌধুরী

বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্যায়):

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা ছোটগল্পে আধুনিকতার অমোঘ সংক্রাম তর্কাতীত হয়ে উঠল একদিন। সেদিন গল্পকারেরা উপদ্রুত পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজাগ সচেতন হয়ে উঠে, হতাশা, ব্যর্থতা, অশুভবোধে আকীর্ণ এক ভাঙাচোরা জগতের ছবি ফুটিয়ে তুললেন; মানবমনের গহন আলো-আঁধারিতে তাঁদের আভ্যন্তর যাত্রাকে প্রসারিত করলেন; সন্ধানী সংবেদনায় তাঁদের দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিলেন মানব-জীবনের নিচুতলার অন্ধকারে।

নৈরাশ্যে-নৈরাজ্যে-অশুভচেতনায় গাঢ় তিমিরলিপ্ত এক জগতের ছবি প্রকট হয়েছিল জগদীশ গুপ্তের গল্পে। অতিপ্রাকৃত আবহ-বলয়িত 'দিবসের শেষে' ও 'হাড়' গল্পদুটিতে অখণ্ডনীয় ভবিতব্যতা এক শঙ্কাহিম উৎকণ্ঠার জাল বোনে। 'দিবসের শেষে'-তে মূল আখ্যানের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি আখ্যানখণ্ডে মৃত্যুর পূর্বাহ্ণে এক ভয়চকিত মানুষ রক্তবর্ণ নিষ্পলক চোখে তার নিজেরই ছায়ার দিকে চেয়ে তাকে শনাক্ত করতে না পেরে যে ভয়ার্ত চিৎকার করে তাতে পরাবাস্তবের শঙ্কিলতার মধ্যে মানুষের সত্তাপরিচয়ের নিদারুণ বাস্তব সংকটই অভিব্যক্তি পায়। মানুষের নিষ্ঠুরতার তথা ব্যাধিত মানসতার ছবি পাই 'পয়োমুখম্' গল্পে। প্রবল অর্থলালসায় পুত্রবধূহত্যায় নির্বিকার কবিরাজ চ্যাপলিনের 'মঁসিয়ে ভের্দু' ছবির হত্যাবিলাসী নায়ককে বুঝি স্মরণ করিয়ে দেয়। 'চার পয়সায় এক আনা' গল্পে একটা আনিকে কেন্দ্র ক'রে মানুষের স্বার্থপরতা, লোলুপতা, কর্তৃত্ববোধ ঘুলিয়ে ওঠে। নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে, জগদীশ গুপ্ত, দেহকামনার তীব্রতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 'চন্দ্র-সূর্য যতদিন' গল্পে যৌবনের শরীরী আকর্ষণকে ঘিরেই নিজের বোন তথা সতীনের প্রতি ক্ষণপ্রভার ঈর্ষা বিষাক্ত হয়ে ওঠে। তার অবদমিত, প্রতিহত, যৌনকামনা তাকে উন্মত্ততার দিকে চালিত করে। এই গল্পে যে তীব্র যৌন ঈর্ষা রূপায়িত, তারই আরও সাহসিক রূপান্তর দেখি 'শঙ্কিতা

অভয়া' গল্পে।

জগদীশ গুপ্তের কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল'-এ (১৯২৩—দীনেশরঞ্জন দাস, গোকুলচন্দ্র নাগ) ও তার সহযোগী পত্র 'কালিকলম'-এ (১৯২৬)। তাঁর গল্পের আধুনিকতা 'কল্লোল'-গোষ্ঠির নতুন সৃষ্টি-উন্মাদের প্রাণিত করেছিল। অবিশ্বাস, সংশয়, প্রশ্নাকুলতা, নৈরাশ্যের গ্লানি, নিষ্ফলতার যন্ত্রণা, অভ্যস্ত জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও ধর্ম-প্রেম-সত্য-সৌন্দর্য-সংক্রান্ত প্রচলিত ধ্যানধারণায় আস্থাহীনতা এইসব নবীন লেখক-মানসতাকে অধিকার করেছিল। তাঁদের গল্পে প্রতিভাত হয়েছিল নরনারীর সম্পর্কবিচারে অধিকতর সংস্কারমুক্ত ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিচুতলার জীবনযাপন সম্বন্ধে ব্যগ্র কৌতূহল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাখনির সাঁওতাল বাউরি কুলি-কামিনদের অজ্ঞাত জীবনকে ঐকান্তিক সংবেদে চিত্রিত ক'রে বাংলা গল্পে আঞ্চলিক ভূখণ্ডকে তার নিজস্ব চারিত্রে উপস্থিত করার প্রয়াস পেলেন, কখনও বা পরিচিত সংসারের সাধারণ মানুষের অপরিচিত অনাবিষ্কৃত গোপনকেই আলোকিত করতে চাইলেন। 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামধারী মনীশ ঘটকের 'পটলডাঙার পাঁচালী'-তে মানবসংসারের একেবারে অধোলোকের ব্যাধিত, ক্লিন্ন বাস্তবতা চড়া রঙে প্রকাশ পেয়েছিল। 'কল্লোল'-এর তরুণতর লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল—এই চারজন বেশ নজর কেড়েছিলেন।

উপক্রত পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা, ব্যাধিত মনস্তত্ত্বের সন্ধানে মানুষের গহন মনোলোকে আভ্যন্তর যাত্রার ঐকান্তিক অভীপ্সা প্রোজ্জ্বল রূপ পেল প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে। ছোটগল্পের রূপরীতি সম্পর্কে সজাগ সন্ধিৎসা, তার উপর অসামান্য নিয়ন্ত্রণ ও উদ্‌ভাবনী কল্পনার প্রাবল্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পকে বিরল শিল্পসিদ্ধি দিয়েছে। 'শত প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ-সংকলনে গ্রন্থিত 'গল্পে নতুন কাল'-এ প্রেমেন্দ্র মিত্র জানিয়েছিলেন যে 'হাত যাদের পাকা আর তার সঙ্গে ঘাড়ও একটু বাঁকা, তেমন গল্পের ব্যাপারীরা কিন্তু নগদ বিদায়ের লোভে মামুলী ছক ধরে শুধু সাধ মেটাবার ফরমাসই খাটেনি। ইচ্ছা পূরণের ছলেই বেয়াড়া কিছু সংশয় আর জিজ্ঞাসা তারা নিজেদের সওদায় মিশিয়ে এসেছে চিরকাল। সাধ মেটাবার দায় মেনেও কিছু গল্প সাহিত্য তাই জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণার ভিত্তিমূল ধরেই নাড়া দিয়ে যায়।' একালের একজন গল্পকার

হিসেবে তাঁর ধারণা, এখনকার ছোটগল্পে নদীর স্রোতে উড়ো পাখির ডানার ছায়ার মতো পাঠকের চেতনার ধারায় তাৎক্ষণিকের একটা মুদ্রণ, নশ্বর অসংলগ্নতাই সার্থকতার উপাদান হয়ে থাকুক, গল্পের নিজস্ব ধর্মের সাক্ষ্য বহন করুক। 'পোনাঘাট পেরিয়ে' ও 'পুন্নাম'-এর মতো গল্প অনিবার্যভাবে জগদীশ গুপ্তের গল্পের জগৎকেই স্মরণ করায়। এ জগৎ কোনও ন্যায়নীতির শাসন-নিয়ন্ত্রিত নয়, অন্ধ জড়শক্তির লীলা-অধ্যুষিত। প্রথমোক্ত গল্পে পাই আয়রনির বিস্ময়-চকিত আঘাত। দ্বিতীয়োক্ত গল্পে সকলের আদরের সুকুমার, ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশু রোগকীটদষ্ট হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, অথচ জীবনের আশাহীন, ব্যাধিগ্রস্ত, ঘ্যানঘেনে কুশ্রী শিশু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে চিকিৎসার গুণে, যার টাকা আসে তার বাবার অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ থেকে। 'কুয়াশায়' গল্পে মানুষের নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে সেই তীব্র সচেতনতার (অ্যান ইন্‌টেন্‌স অ্যাওয়ারনেস অফ্ হিউম্যান লোন্‌লিনেস্—ফ্র্যাঙ্ক ও'কনর, 'দি লোন্‌লি ভয়েস্') পরিচয় পাই যা ছোটগল্পের একটি মৌল লক্ষণ। সেখানে সরমার জীবনের নিঃসহায়তা, নিরাশ্রয়তা, অনিশ্চয়তা তাকে মর্মান্তিক আত্মবিনাশের দিকে টেনে নিয়ে যায়। 'হয়তো' গল্পে মানুষের ভেতরের অসুস্থতা, বিকৃতি ও ক্ষয় তার বাসস্থানের বাইরের ক্ষয় ও ধ্বংসমুখীনতার সঙ্গে বেমালুম মিলে যায়। মহিমের উগ্র সন্দেহ-পরায়ণতা তার ব্যাধিত মনস্তত্ত্বেরই সূচক। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটিতেও পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে ক্ষয়, ধ্বংস ও মৃত্যুর আবহ। প্রাকরণিক অভিনবত্বে উজ্জ্বল, এক অমোঘ কবিতায় আক্রান্ত, এই গল্পটি প্রত্যক্ষ বাস্তব ও অপ্রত্যক্ষ স্বপ্নকল্পনার দুই বিপ্রতীপ প্রান্তের মধ্যে দোলায়িত হতে হতে শেষে নৈশ-শুব্ধতালীন স্বপ্নমায়ার মধ্যে মিলিয়ে যায়। 'শৃঙ্খল' ও 'স্টোভ' গল্পদুটিতে নরনারীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গল্পকার চরিত্রের দুজ্ঞেয় মনোগহনের অন্ধকারে সন্ধানী বীক্ষণের আলো ফেলেছেন। 'শৃঙ্খল' গল্পে স্বামী-স্ত্রী ঘৃণা ও বিদ্বেষের শৃঙ্খলেই পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা থাকে। 'স্টোভ' গল্পে স্টোভ হয়ে ওঠে চরিত্রের অন্তরনিরুদ্ধ আবেগ, বাসনা, বেদনার প্রতীক। 'সংসার সীমান্তে', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সাগর সংগমে' ও 'মহানগর'—এই চারটি গল্পেই লক্ষ্য বা উপলক্ষ হিসেবে গণিকা-জীবনের ক্লেদ ও গ্লানি অনুস্যূত হয়ে আছে। 'সংসার সীমান্তে' ও 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পদুটিরই নায়িকা বেশ্যা। 'সাগর সংগমে' গল্পে আচারনিষ্ঠা নায়িকার রূপান্তর তথা সুপ্ত মানবিকতার উদ্বোধন ঘটে বেশ্যার

মেয়ের সান্নিধ্যে। 'মহানগর'-এ সরল গ্রাম্য কিশোর মহানগরের জটিল অরণ্যে তার হারিয়ে-যাওয়া যে দিদিকে খুঁজতে এসেছিল সে রঙিন সুখের মরীচিকায় বেশ্যা হয়ে গেছে।

গল্পের উজ্জ্বল রূপনির্মাণের নৈপুণ্য, তীক্ষ্ণ তির্যক ইঙ্গিতচ্ছুরিত অলংকৃত ভাষারীতি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্পকে আদ্যন্ত চিহ্নিত করেছে। তাঁর প্রথম দিকের গল্পে নৈরাশ্যবিধুর রোমান্টিকতাই অভিব্যক্ত। 'ছুরি' গল্পে নায়কের বিদায়মুহূর্তে গৌরীয়ার হাসি আপাত নিষ্করুণ কাঠিন্যের ভেতরকার বিষাদ-করুণতাকে আভাসিত করেছে। 'দুইবার রাজা'-য় গল্পকারের ব্যঙ্গ-তির্যক কথন-ভঙ্গি করুণা ও করুণতায় কেমন মেদুর হয়ে যায়। 'ডিস্‌ক্‌' গল্পটি এক থেমে-যাওয়া গানের না-থামা অনুরণনের মতো চেতনায় বেজে চলে। 'নিজের জন্যে তো চোখের জলই আছে গান কেন ?'—সমস্ত সৃষ্টির মৌল গহনে নিয়ে যায় নায়িকার এই উচ্চারণ, আমাদের সত্তার শিকড়ে কাঁপন ধরায়। উত্তর-জীবনে জীবিকা-কর্মসূত্রে নানা স্থানের নানা মানুষ, বিশেষ ক'রে গ্রামবাংলার বঞ্চিত, বুভুক্ষু, আতুর মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষতর পরিচয় অচিন্ত্যকুমারের গল্পে এক গভীর মানবিক সংবেদনা সঞ্চার করল। 'মাটি' গল্পে পাই মাটির সোঁদা গন্ধ-মাখা এক তীব্র গাঢ় কবিতার আস্বাদ। ছেলে মানুষ করতে গিয়ে প্রায় সমস্তটাই জমি খুইয়েছে যে আমানত, বৃষ্টিকে তার মনে হয় কান্নার শব্দ, আর সেই শব্দে সে শুনতে পায় মাটির মর্মস্পর্শী করুণ ডাক। ভয়ঙ্কর আকালের করাল ছায়া পড়ে 'যতনবিবি', 'বাঁশবাজি', 'বস্ত্র', 'কাক' গল্পের উপর। 'যতনবিবি' গল্পে আশ্চর্য ইঙ্গিতস্ফুরিত বর্ণনায়, কাব্য-সৌন্দর্যে দ্যুতিময় ভাষায় মূর্ত হয়ে ওঠে মানুষের শোচনীয় দৈন্য, রিক্ততার গ্লানি, নির্বোধ, ক্লীব অসহায়তা এবং নৈতিক অবক্ষয়। 'বাঁশবাজি' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে, দৃঢ় কঠিন রেখায় আঁকা, এক ভয়াল বাস্তবতার ছবি। 'কাক' গল্পটি পড়ে মনে পড়বেই জীবনানন্দের কবিতা '১৯৪৬-৪৭' : 'এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে ; / নতুন চালের রসে রৌদ্রে কতো কাক / এ-পাড়ার বড়ো মেজো··· ও-পাড়ার দুলে বোয়েদের/ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত : / এখন টুঁ শব্দ নেই সেই সব কাকপাখিদেরও ; / মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয় ; / সময়ের হাতে অন্তহীন'। গল্পের শেষে উৎসবমুখর কাকদের নতুন আহারসন্ধানে আকালের বীভৎস হাঁ-মুখ উদ্‌ঘাটিত। আকালের তমিস্রাঘন পটে স্থাপিত হলেও 'যশোমতী' গল্পটি কিন্তু দীপ্ত হয়ে উঠেছে যশোমতী চরিত্রের তীব্র

অভিমান, দৃপ্ত তেজ, দৃঢ় ব্যক্তিত্বের উদ্‌ভাসনে। 'সারেঙ' গল্পটি বর্ণময় হয়ে ওঠে বর্ণনা ও সংলাপের মধ্য দিয়ে স্থানিক আবহ সৃষ্টির নৈপুণ্যে। গল্পের শেষে নায়িকার চোখে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে সারেঙের যে মূর্তি তাতে আশ্চর্য স্বপ্নমায়ার রঙ লাগে।

বুদ্ধদেব বসুর গল্পে বহির্ঘটনার প্রতি অভিনিবেশ স্বল্পলক্ষ্য। চরিত্রের সংবেদ-বাসনার রূপায়ণে নিবিষ্ট তাঁর ভাবপ্রধান গল্পগুলি উত্তরকালের ছোটগল্পের ভাবরূপ-সম্পর্কিত ধারণার দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করেছে। প্রবোধকুমার সান্যালের ছোটগল্পে প্রকট হয়ে উঠেছে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের অন্ধকার পরিমণ্ডলে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও তৎসঞ্জাত নৈতিক অবক্ষয়। রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণ মন নিয়ে নানা বিচিত্র চরিত্রের মানসিক ঘাতপ্রতিঘাত এবং উপদ্রুত পারিপার্শ্বিকতায় মানবস্বভাবের বিকৃতি ও অধোগতি চিত্রণের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি।

'কল্লোল'-এর শিক্ষিত নাগরিক বুদ্ধিজীবী মনের সঙ্গে তারাশঙ্করের গ্রামীণ ঐতিহ্যে লালিত মনের দুস্তর ব্যবধান ছিল। তবু বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত 'রসকলি' গল্পের মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের আবির্ভাব। তাঁর গল্পে অন্তরঙ্গ পরিচয়ে বিধৃত একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রকৃতি এবং সেই প্রাকৃতিক পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতিভূ মানুষ। 'বেদেনী' গল্পে উদ্দাম যৌবনের বাঁধভাঙা বহিঃপ্রকাশে, 'তারিণী মাঝি' গল্পে নায়কের স্ত্রীর গলা টিপে হড়পা বানের প্রচণ্ডতার মধ্যে নিজেকে বাঁচানোর মরিয়া প্রয়াসে, 'নারী ও নাগিনী'-গল্পে সাপিনীর সঙ্গে খোঁড়া শেখের ঘনিষ্ঠতায় আদিম জৈবশক্তিরই বিচিত্র লীলা পরিস্ফুট। তারাশঙ্করের অনেক গল্পই একটি চরিত্রের বিশিষ্টতাকে ঘিরে রূপলাভ করেছে, যেমন : 'অগ্রদানী', 'দেবতার ব্যাধি', 'ইস্কাপন', 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে', 'কালাপাহাড়', 'মতিলাল'। 'অগ্রদানী'-তে ক্লিন্ন লোলুপতার আত্মগ্রাসী পরিণাম উদ্‌ঘাটিত। 'দেবতার ব্যাধি'-তে মানব-চরিত্রের অন্তর্গত দেব দানবে নিদারুণ দ্বন্দ্ব ও তাতে দেবসত্তার পশ্চাদপসরণ পাঠক-সংবেদ মথিত করে। 'রাখাল বাঁড়ুজ্জে' গল্পে মানুষের নিষ্ঠুরতা পাশবিকের মাত্রা ছাড়িয়ে পৈশাচিক হয়ে ওঠে। আবার চোর 'ইস্কাপন' মানবিক হয়ে যায়। 'কালাপাহাড়' গল্পে মানুষের সঙ্গে মহিষের মর্মগত যোগে মানবিকতার আর এক আয়তন উদ্‌ভাসিত। লাল কাঁকুরে মাটির রুক্ষ আড়াল সরিয়ে যেমন হঠাৎ বেরিয়ে আসে স্নিগ্ধ ফল্গুধারা, তেমনি 'মতিলাল' ও তার স্ত্রীর কুশ্রীতার আড়াল

সরিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে স্নেহবাৎসল্যের স্নিগ্ধ পীযূষধারা। 'ডাইনী' ও 'ডাইনীর বাঁশি' গল্পদুটিতে ঐ স্নেহবাৎসল্যেরই গোপন উৎস, বিষকুটিল সন্দেহ-বিদ্ধ ঘৃণিত অস্তিত্ব ও নিঃসীম শূন্যতার হাহাকারের মধ্যে হারিয়ে যায়। 'জলসাঘর'-এ প্রাচীন উদার সামন্ততন্ত্র ও নবীন সংকীর্ণ ধনতন্ত্রের সংঘাত চিত্রিত। প্রাচীনের অবসানকে অনিবার্য জেনেও, তার প্রতি সম্ভ্রমে, মায়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন গল্পকার। প্রাচীনের জন্য এই দীর্ঘশ্বাস পড়েছে 'পৌষলক্ষ্মী' গল্পেও। তারাশঙ্করের উত্তরপর্বে 'মাটি', 'কামধেনু', 'ইমারত'-এর মতো গল্পে অধ্যাত্মচেতনার উদার প্রশান্তি সঞ্চারিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে পাই সহজ বিবৃতি ও বর্ণনাভঙ্গি এবং স্নিগ্ধ, প্রসন্ন মানবিক সংবেদনা। একটি সরল, নির্বোধ, ভীরু বালিকা বা সদ্য-যুবতী, যাকে আন্তরিক সহানুভূতি দিয়ে বিচার করতে না পেরে প্রায় সকলেই গঞ্জনা দিয়েছে, উপেক্ষা এমনকি পীড়ন করেছে—বিভূতিভূষণের গল্পে যেন একটি 'মোটিফ' হয়ে উঠেছে। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের 'দুর্গা' চরিত্রই যেন একটু অন্যরূপে 'পুঁইমাচা'-র ক্ষেন্তি হয়ে দেখা দিয়েছে। ক্ষেন্তির একটি প্রধান চারিত্রিক উপাদান হয়ে দেখা দিয়েছে, লোভ। 'মৌরীফুল' গল্পের বধূটির মধ্যে আসঙ্গস্পৃহা থাকলেও লোভ নেই, তবে রয়েছে একই ধরনের নির্বোধ সারল্য ও ভীরুতা। এই দুটি চরিত্রের মৃত্যু উক্ত গল্পদুটিকে এক বিষাদকরুণতায় ঘিরে নেয়। 'কিন্নরদল' গল্পে সুর-উৎসারী শুদ্ধতা ও সারল্যের আকস্মিক অবসান আন্তরিক বেদনাবোধে পাঠকহৃদয়কে বিদ্ধ করে। মানবজীবনের পরিপূর্ণতা সম্পাদনে প্রকৃতির অনস্বীকার্য ভূমিকাকে বিভূতিভূষণ যেমন তাঁর ছোটগল্পেও কখনও কখনও পরিস্ফুট করেছেন, তেমনি মানবজীবনের ত্রুটি, দুর্বলতা স্খলনকে তিনি উদার ক্ষমাস্নিগ্ধতায় গ্রহণ করেছেন। 'মেঘমল্লার' গল্পে প্রত্নসময়ের আভাসে রোমান্টিক কল্পনার বর্ণরাগ সঞ্চারিত হয়েছে।

ছোটগল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ বা বিষয়বস্তু ও উপস্থাপন, উভয়তই বৈচিত্র্যের অশ্রান্ত সন্ধান করে গেছেন বনফুল। প্রায়শই তিনি খুব ছোট পরিসরে গল্প বয়নের প্রয়াস পেয়েছেন। এতে কখনও কখনও গল্পরস ঠিক গাঢ় হয়ে ওঠেনি বা দানা বাঁধতে পারেনি। ক্বচিৎ 'অমলা'-র মতো ছকবাঁধা নিষ্প্রাণ গল্পও রচিত হয়ে উঠেছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, চরিত্র, ঘটনা বা পরিস্থিতির নিপুণ উপস্থাপনে, উজ্জ্বল, সপ্রতিভ বর্ণনা ও বিবৃতিতে, গল্পের নির্মেদ বা

নির্ভার অবয়ব নির্মাণ করে, আকস্মিকতার বিস্ময়চমকে একটি নাটকীয় অভিঘাত সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন বনফুল। প্রায়শই উক্ত বিস্ময়-চমক প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের অসংগতিতে রূঢ় করুণ আয়রনির রূপ নিয়েছে। কচিৎ 'সুলেখার ক্রন্দন'-এর মতো গল্পে ঐ চমক বেথসে পরিণত। বনফুলের অনেক গল্পই চরিত্রমূলক গল্প। একটি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য, প্রায়শই যা অদ্ভুতত্বের নামান্তর হয়ে দেখা দেয়—আচরণ, শখ, ধ্যান-ধারণার অদ্ভুতত্ব, এমনকি পরিবর্তনের অদ্ভুতত্ব—ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি। আবার মানুষের অনাচার, দুর্বলতা, অস্বাভাবিকতা, অন্ধ সংস্কারকে তীক্ষ্ণ তির্যক কটাক্ষে তিনি বিদ্ধও করেছেন।

অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পে পাই বুদ্ধির প্রসন্ন আলোকবিকিরণ, সপ্রতিভ, শীলিত কথনভঙ্গি। তাঁর গল্পের বাক্‌রীতিতে, মেজাজে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের কি ঈষৎ ছায়া পড়ে ?

গোয়েন্দা কাহিনী, ভৌতিক কাহিনী, অতিপ্রাকৃত আখ্যান, ঐতিহাসিক আবহরঞ্জিত রোমান্টিক কাহিনী, রঙ্গরসসিক্ত রোমান্টিক উপাখ্যান, শুধুই কৌতুক-রসের গল্প—বিচিত্র ধরনের গল্পসূত্র বয়ন করে গেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'চুয়াচন্দন', 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ', 'তন্দ্রাহরণ'—এই তিনটি গল্পই ঐতিহাসিক অতীতের বাতাবরণে বিন্যস্ত, রোমান্টিক কল্পনারঙিন, মধুরপরিণামী, প্রণয়কাহিনী। এর মধ্যে শেষোক্ত দুটি গল্প বিশেষভাবেই লঘু রঙ্গরসাস্বাদী। ঐ একই ঐতিহাসিক আবহে স্থাপিত 'রক্তসন্ধ্যা' অসামান্য হয়ে উঠেছে ইতিহাসের সুদূর বর্ণরাগ-সঞ্চারের দক্ষতায়, নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টিতে, জাতিস্মরতার অপ্রাকৃত রহস্যডোরে বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে গেঁথে তোলার রহস্যরোমাঞ্চে। 'সেতু' গল্পে ঐ জাতিস্মরতার ভাবসূত্রেই তীব্র দেহলালসা ও কুটিল বিষাক্ত জিঘাংসার এক প্রবল উত্তেজক কাহিনী নিপুণভাবে উপস্থাপিত। শরদিন্দুর গোয়েন্দাকাহিনীর মধ্যে 'মৃত্যুবাণ' নির্ধারিত গণ্ডি নিশ্চিতভাবেই ছাড়িয়ে গিয়ে মানুষের শোচনীয় বিচারবিভ্রান্তির ট্র্যাজিক উন্মোচনে মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। 'আঙটি' গল্পটির তীব্র নাটকীয় রসস্ফূর্তির মূলে রয়েছে প্রধানত গল্পের শেষে আয়রনির ব্যঙ্গকরুণ অভিঘাত। মপাসাঁর 'ঝুটা রত্ন' গল্পটি মনে পড়ে যায়।

মনোজ বসুর প্রথম দিকের কয়েকটি গল্পে মানুষ ও প্রকৃতিকে ঘিরে রোমান্টিক মধুরতা গাঢ় হয়ে উঠেছে। 'রাত্রির রোমান্স'-এ পাই গার্হস্থ্য, মাধুর্যের

আবেশ ; 'বনমর্মর'-এ আরণ্য প্রকৃতির স্নিগ্ধ মাধুরীর মায়াঞ্জন, 'একদা নিশীথ-কালে' গল্পে রঙ্গচপল রোমান্সের স্নিগ্ধতা। 'অসময়' ও 'ঘড়িচুরি'-র মতো গল্পে রিক্ত জীবনের দীনতাকে মিথ্যার ছলনায় ঢেকে রাখার নিষ্ফল প্রয়াস করুণতায় মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে। 'বীরপূজা' গল্পের শেষে আকস্মিক আঘাত হানে আয়রনি বা বেদনাগর্ভ বিদ্রূপের আভাস। 'রায়রায়ানের দেউল' ও 'উলু'—এই দুটি গল্পে নিয়তি-প্রহত মানবজীবনের গভীর বেদনা গম্ভীর কথারূপ পায়। প্রথমোক্ত গল্পে, দূর অতীতের কল্পনারঙিন পটে স্থাপিত এক সংগ্রামজয়ী পুরুষের করুণ পরাজয়-কাহিনী, যাকে হারানো-জীবনের শোচনা আত্মবিনাশী মত্ততার দিকে ঠেলে দেয়। 'উলু' গল্পে উন্মাদিনী ভাগ্যহতা গৌরীর ভয়াল উলুধ্বনি বিরূপ নিয়তির কুটিল পরিহাসকেই যেন ফিরিয়ে দেয়। মনোজ বসুর কয়েকটি গল্প একটি চরিত্রের বিশিষ্টতাকে ঘিরে রূপ পেয়েছে। 'আংটি চাটুজ্জের ভাই' গল্পে এক চির-উদাসীন, চির-পলাতক মুক্তচিত্ত জীবনপথিকের বৃত্তান্ত উপস্থাপিত। 'ইতিহাস' গল্পে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে এক তথ্যনিষ্ঠ, সত্যসন্ধ ঐতিহাসিকের চারিত্র।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে যে প্রাচ্য কাহিনীবর্ণনরীতি, ফ্যাণ্টাসির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমকালীন বাস্তবতার উদ্‌ঘাটন, রঙ্গপরিহাসচ্ছলে প্রায়শই সমকালীন সমাজের ক্রটিবিচ্যুতি, অনাচার, ব্যভিচারের প্রতি তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত—তাইই পরশুরামের গল্পে যেন আরও বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বলতা লাভ করল। পরশুরামের প্রথম পর্বের গল্পে—শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, চিকিৎসা-সংকট, বিরিঞ্চিবাবা, কচি সংসদ, ভুশণ্ডীর মাঠে প্রভৃতিতে যে উদ্‌ভাবন-নৈপুণ্য, কৌতুকরসের স্বতোৎসার, সুস্থির ভারসাম্যবোধ, নিরাসক্ত উপস্থাপন, 'জাবালি'-র মতো গল্পে পৌরাণিক চরিত্রের নবায়নে যে আধুনিক যুক্তিবোধের উদ্‌ভাবন তা তাঁর পরবর্তীকালের গল্পে কখনও বা রঙ্গকৌতুকবর্জিত ব্যঙ্গপ্রবল সোচ্চার বক্তব্যপ্রবণতায়, কখনও বা উদ্‌ভাবন-সামর্থ্যের আপেক্ষিক দ্যুতিহীনতায় তীক্ষ্ণতা ও ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে আতিশয্য-বর্জিত অনাবিল কৌতুকরসের উৎসার লক্ষণীয়। 'রাণুর প্রথম ভাগ'-এর মতো গল্পে হাসির লঘু হাওয়া অশ্রুবাষ্পের আর্দ্রতায় ঘন, মন্থর হয়ে উঠেছে।

উপক্রত পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতা ও মানবমনের গহন অভ্যন্তরে যাত্রার সাহসী অভীপ্সা প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে।

তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী, নির্মোহ দৃষ্টি, বিজ্ঞানচেতন এই লেখকের কাছে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠার অন্তরালশায়ী রোমান্টিক ভাববিহ্বলতা, সহজেই ধরা পড়ে গিয়েছিল। কল্লোলীয়দের সাহিত্যভাবনার স্বতোবৈপরীত্য, প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি চিঠিতে হামসুন আর গোর্কিকে একসঙ্গে মেলানোর অসম্ভব কল্পনা তাঁকে বিমূঢ় করেছিল। তবু কল্লোলীয়দের সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু মর্মগত যোগসূত্র থেকে গিয়েছিল। কুটিল-জটিল মানবমনের গভীর অন্ধকারে প্রবেশের দুঃসাহসী অভিলাষে, ব্যাধিত মনস্তত্ত্বের উন্মোচনে তিনি জগদীশ গুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সূত্রকেই হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সূচনাপর্বেই ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। 'আত্মহত্যার অধিকার', 'ফাঁসি', 'ভূমিকম্প', 'হলুদপোড়া', 'মহাকালের জটার জট', 'টিকটিকি', 'সিঁড়ি', 'সরীসৃপ', 'বিপত্নীক', 'সমুদ্রের স্বাদ' প্রভৃতি গল্পে অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য, গভীর বস্তুনিষ্ঠা ও সজাগ বিশ্লেষণী মন নিয়ে মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণুতা, আত্মবঞ্চনা, নিষ্ঠুর স্বপ্নভঙ্গ, মনোলোকের অসুস্থ বিকৃতি ও ক্লেদাক্ত কুটিলতাকে তিনি স্মরণীয় শিল্পদক্ষতায় রূপ দিলেন। বিশেষ করে 'সরীসৃপ' গল্পে বনমালীকে ঘিরে দুই সহোদরা পরী ও চারুর মনের সমস্ত ক্লিন্ন প্রবৃত্তি, সরীসৃপ-কুটিল হীনতা যে নগ্নতায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা বনের পশুকেও হার মানায়। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে গাঢ় হয়ে উঠেছে আদিম জৈবতার অন্ধকার। উত্তরকালে মার্কসবাদী সমাজবীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে উঠে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে মানুষের মনোগহনে আভ্যন্তর যাত্রার তুলনায় উপদ্রুত পারিপার্শ্বিকের দিকে, উপস্থাপনকৌশলের তুলনায় বক্তব্যের অগ্রসরতার দিকে অধিক নিবিষ্ট হয়েছিলেন। 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', 'বিবেক', 'নমুনা' প্রভৃতি গল্পে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের রিক্ততা, নৈতিক অবক্ষয় তথা আত্মিক অধোগতি নির্মোহ বীক্ষণে উদ্‌ঘাটিত। 'কংক্রীট' ও শিল্পী'-র মতো গল্পে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের অদম্য সততা ও সংগ্রামী দৃঢ়তা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে রূপায়িত হয়েছে জনগণের সংগ্রামী সংকল্প, দৃঢ় প্রতিরোধ, আর তার উদ্দীপক স্পর্শে ব্যক্তিমানুষের রূপান্তর।

বিষয়ের বৈচিত্র্য, পটভূমির বিস্তার ও অভিনবত্ব সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। ভাষাপ্রয়োগের নৈপুণ্যেও তারা দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সে ভাষা বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল, কখনও বা ব্যঙ্গতির্যক, কখনও বা ভাবমণ্ডিত। গল্পের

উপসংহারে আকস্মিকতার বিস্ময়চমক এনে এই গল্পকার তাঁর রচনায় মাঝেমাঝেই নাটকীয় রসসঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছেন। বিচিত্র ব্যতিক্রমী মনস্তত্ত্বের উদ্‌ঘাটনেও তিনি আগ্রহ দেখিয়েছেন। 'অযান্ত্রিক' গল্পে কুশ্রী ভাঙা তোবড়ানো ফোর্ড গাড়ির সঙ্গে বিমলের এক অদ্ভুত মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'গরল অমিয় ভেল' গল্পে মালা বিশ্বাস তার এতদিনের আত্মবিজ্ঞাপনের সাধনার ব্যর্থতা ঢেকে দিয়ে, নিঃস্বতার গ্লানি ঘুচিয়ে, নিজেকে অসাধারণত্বের দীপ্তি দিতে কালো পাথরের গায়ে খড়ি দিয়ে নিজের নামেই মিথ্যা কুৎসা রচনা করে। এ যুগে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আর্থিক অবস্থার গভীর প্রভাব দেখাতে গিয়ে সুবোধ ঘোষ অর্থনীতি-নিয়ন্ত্রিত এই সমাজব্যবস্থায় মানুষের মানসিক পঙ্গুতা তথা নৈতিক অবক্ষয় বা আত্মিক অধোগতিকে তীব্র প্রকটভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'ফসিল' গল্পে বুদ্ধিগরবী মধ্যবিত্তের নির্বীর্য নিষ্ক্রিয়তা ও ক্লীব অসহায়তা বড় করুণ হয়ে দেখা দেয়। 'সুন্দরম্' গল্পে সুকুমারের সৌন্দর্য-বিলাস ব্যভিচার ও জিঘাংসায় বিকৃত হয়। 'গোত্রান্তর' গল্পে গোত্রান্তরিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ সঞ্জয় শ্রমিকদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে পালায়। 'উচলে চড়িনু' গল্পের দীনেশ সহজলভ্য মজুরনী বিলাসীকে মৃত্যুগহ্বরের অন্ধকারে পাঠিয়ে দুষ্প্রাপ্য যাযাবরী সারাকে লাভের অর্থপণ সংগ্রহ করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে ঘটনা, চরিত্র, পরিস্থিতির বাস্তবতা রোমান্টিক কল্পনাবিলাসে অনুরঞ্জিত হয়েছে। মানুষের বাসনাপূরণপ্রয়াসের করুণ পরিণতি আবেগময়, ভাবমেদুর, নাটকীয় উপস্থাপন লাভ করেছে তাঁর গল্পে। তাঁর কয়েকটি গল্পে নিষ্ঠুরতার অতিশয়িত চিত্র যেন কিছুটা কৃত্রিম বোধ হয়।

সতীনাথ ভাদুড়ীর ছোটগল্প কাহিনীরসে আকর্ষক ও সজীব হয়ে উঠেছে। মানবজীবনসম্পর্কিত গভীর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি, বিশেষ ক'রে চারপাশের জন-জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ পরিচয়, অব্যবহিত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির বুদ্ধিদীপ্ত অনুধাবন, সহজাত পরিহাসবোধ, সহজ, সপ্রতিভ, উজ্জ্বল বর্ণনাভঙ্গি তাঁর গল্পকে দ্যুতিময় করেছে। তাঁর গল্প বঞ্চিত, রিক্ত মানুষের প্রতি আন্তরিক সমবেদনায় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। সাধারণ দরিদ্র মানুষের স্বপ্ন, খেয়াল, সাধ, আহ্লাদ, নৈরাশ্য, নিষ্ফলতা নিবিড় মমতায় চিত্রিত করেছেন তিনি, এমনকি বিধিবহির্ভূত দাম্পত্যবন্ধন তথা অসামাজিক প্রেমও তাঁর গল্পে আশ্চর্য মায়ায় ভরে উঠেছে। আবার সমাজের ছোটবড় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা

কিভাবে হীন স্বার্থলোলুপতায় ভুখা, আতুর মানুষদের বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয় তার নগ্ন চিত্র তাঁর গল্পে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

'নিজের স্বভাবকে দেখে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারা জীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি। সে ভালোবাসা হয়তো সঙ্কীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালোবাসা। তবু তা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।'—এই আশ্চর্য অকপট স্বীকারোক্তিটুকু ধরা আছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শেষ বেতার-কথিকায়। 'চাঁদ মিঞা' এবং 'রত্নাবাঈ'-এর মতো গল্পে এই গল্পকার যদিচ আমাদের দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিক, অভিজ্ঞতার চেনা পৃথিবী ছাড়িয়ে অপরিচিত পৃথিবী ও জীবনের পটভূমিতে তাঁর কাহিনী-বিন্যাসের নৈপুণ্য, আবহ-নির্মাণের দক্ষতা ও নাটকীয় কৌতূহলসৃষ্টির সামর্থ্য নিশ্চিত-ভাবেই প্রতিপাদন করেছেন, তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের পরিচিত পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত তথা নিম্নমধ্যবিত্তের প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনে গল্পের কাহিনীকে স্থাপন ক'রে, ঐ সংকীর্ণ জীবন-পরিধিতে যেসব অনুভূতি, কল্পনা, স্বপ্ন ও বাস্তব পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের সংঘাত, মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, ঈর্ষা, মান-অভিমান কাঁপন জাগায়, ঢেউ তোলে তার রূপায়ণে একদিকে যেমন তিনি দুর্লভ শিল্পসিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে গ্রামীণ পরিমণ্ডলে, নিসর্গের অকৃপণ শ্যামলিমার মধ্যে, সহজ, সরল, অভাবক্লিষ্ট শঙ্কাতুর মাটি-ঘেঁষা মানুষদের তীব্র কামনা, ঈর্ষা, প্রবল সুখ-দুঃখ-বঞ্চনার কাহিনী, আঞ্চলিক গ্রামীণ ভাষার সংলাপ প্রয়োগে, বাস্তব আবহ-পরিবেশের সঞ্চারণে, যখন তাঁর গল্পে তিনি উপস্থিত করেছেন তখনও কেমন তাতে ভিতর-গহনের স্পর্শ লেগেছে। 'অবতরণিকা' গল্পে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, তার নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তা কিভাবে একটি পরিবারভুক্ত মানুষদের মনস্তত্ত্বকে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে তারই বিশ্লেষণ-সজীব ছবি ফুটে উঠেছে। 'বিকল্প' এক তীব্র টেন্‌শনের গল্প। অসামান্য উপস্থাপনকৌশলে গল্পকার এখানে, অতি সাধারণ গার্হস্থ্য সংসারের পরিচিত প্রিয়-সম্পর্কের মধ্যেই হঠাৎ অপরিচয়ের, নিস্পৃহতার, এমনকি ঘৃণা-বিদ্বেষের দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিলটা কিভাবে খাড়া হয়ে ওঠে, অজানা-অচেনা মানব-মনস্তত্ত্ব চকিতে আত্মপ্রকাশ করে, তা অব্যর্থভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'প্রতিভূ' গল্পে এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের অসহায় প্রেম-ব্যাকুলতা ও বিফল

বাসনার করুণ কাহিনী মনের মধ্যে এক গভীর বিষাদের দীর্ঘস্থায়ী রেশ রেখে যায়। 'এক পো দুধ' গল্পে এক পো দুধ খাওয়াকে কেন্দ্র করে একটি পরিবারের গণ্ডিতে মানবমনের সমস্ত বিষামৃত উথলে ওঠে। গভীর জীবনাবেগে স্পন্দিত, মানবজীবন আর জাগতিক অস্তিত্বের মহিমায় মুখর 'রাণু যদি না হ'তো' গল্পটি। এক শিল্পীহৃদয়ের বাসনা ও বেদনায় বর্ণময় হয়ে উঠেছে 'ময়ূরী' গল্পটি আর 'কোন দেবতাকে' গল্পটিকেও এক মায়া-বলয়ে ঘিরে নেয় সঞ্চিতার রোমাণ্টিক কল্পনা। 'রস' গল্পে একদিকে রূপতৃষ্ণা ও সৌন্দর্যপিপাসা, অন্যদিকে জীবিকার নিদারুণ তাড়না মোতালেফকে যৌবন-লাবণ্যবতী ফুলবানু ও অভিজ্ঞা মাজু খাতুনের প্রতি বিপরীত আকর্ষণের রূপ ধরে, নিদারুণ হৃদয়-দ্বন্দ্বে দীর্ণ করে। 'পালঙ্ক' গল্পে মানবিকতা—মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য—এক আশ্চর্য বিভায় জ্বলে ওঠে। গল্পের শেষে নিঃসঙ্গ, স্মৃতিভারাতুর ধলাকর্তা অবশেষে দুই শিশুর মধ্যে তাঁর দেবতাকে প্রত্যক্ষ করে শান্ত, তৃপ্ত, চরিতার্থ হন। 'সোহাগিনী' একটি শুদ্ধ প্রেমের গল্প। নিজের বিবির কাতরানির মধ্যে তার 'পেরথম পীরিতের গোঙানি' শুনতে পায় মতি মিঞা, আর হঠাৎ তার এই একান্ত ব্যক্তিগত আর্তিকে সে চরাচরে ছড়িয়ে দেয় : 'সে গোঙানির শেষ নাই মণ্ডলভাই, দুনিয়াদারিতে গোঙানির শেষ নাই।'

আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে সুখে-দুঃখে স্পন্দমান বাঙালির পারিবারিক জীবন, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিচক্ষণ উপস্থাপনভঙ্গির গুণে, সরস, হার্দ্য কথারূপ পেয়েছে। প্রতিভা বসুর গল্পে নারীজীবনের বেদনামধুরিমা নারীর অনুভব ও দৃষ্টির বিশিষ্টতা নিয়ে প্রকাশিত। বাণী রায়ের গল্পে পরিশীলিত দীপ্তবুদ্ধি নারীমনের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সজাগ কৌতূহল পরিস্ফুট।

রমাপদ চৌধুরী তাঁর পরবর্তীকালের গল্পে প্রথম দিকের রম্য-রঙিন কথাবিলাস পেরিয়ে উপদ্রুত পারিপার্শ্বিকের প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে ছুঁতে চেয়েছেন। বিমল মিত্র প্রধানত নিয়োজিত থেকেছেন সুলভ নাটকীয় চমক সৃষ্টিতেই। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর—এই তিনজন গল্পকার বাংলা ছোটগল্পের নতুন দিগন্তসন্ধানে বিশেষভাবেই আগ্রহী হয়েছিলেন। গল্পের নিটোল বৃত্তকে কমবেশি ভেঙে, একালের মানুষের ক্লান্তি, যন্ত্রণা, বিপন্নতা, অন্তর্গত রক্তক্ষরণ ফুটিয়ে তুলে, এই জটিল অবক্ষয়ী সময়ের অন্তঃস্বরূপ উন্মোচনে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বহিরঙ্গ-ঔজ্জ্বল্য ও নাটকীয় অভিঘাত সৃষ্টিতে সন্তোষকুমার ঘোষকেই একটু

বেশি আগ্রহী মনে হয়। তবে 'কাণাকড়ি' ও 'যাদুঘর'-এর মতো গল্পে একালের মধ্যবিত্ত মানুষের শূন্যতা, স্বপ্নভঙ্গ, বিমূঢ়তাকে তিনি সার্থক শিল্পরূপ দিতে পেরেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে সম্ভবত বলা যেতে পারে জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপ্রবাহী ধারার যোগ্যতম বাহক। তাঁর ছোটগল্পের ভাবকল্পনা ও শব্দবিন্যাসে কবিতার অমোঘ সংক্রাম সহজেই লক্ষণীয়। একটি সাক্ষাৎকারে (কালপুরুষ, সাহিত্য ও সমালোচনা সংকলন ৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড ১৩৮৪)'কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে জানিয়েছিলেন তিনি : 'পূর্বাশা'-য় যখন তিনি 'মঙ্গলগ্রহ', 'চামচ', 'খেলোয়াড়' প্রভৃতি গল্প লিখছেন, তখনই জীবনানন্দের কবিতা প্রথম পড়তে শুরু করেন। এই সময় তিনি জীবনানন্দের প্রকাশিত প্রায় সব কবিতা পড়েছিলেন। জীবনানন্দের প্রতিটি কবিতা, বিশেষ করে তাঁর শব্দচয়ন গল্পকারকে এমনভাবে নাড়া দিত যে এক-একটি কবিতা প'ড়ে এক-একটা গল্প লেখার প্রেরণা পেতেন তিনি। তাঁরও ইচ্ছা হত যে-শিল্পসম্মত, বুদ্ধিগ্রাহ্য শব্দ চয়ন করে জীবনানন্দ কবিতা রচনা করতেন, তিনিও ঠিক ঐরকম শব্দ সাজিয়ে একটি করে গল্প লেখেন। জীবনানন্দ যেন প্রায় তাঁকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন, তুমি ঠিক এইভাবে গল্প লেখ। আসলে গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রাথমিক চিন্তা ছিল কিছু সুন্দর শব্দ নিয়ে, কথা নিয়ে গল্প তৈরি করার দিকে। তবে শুধু শব্দ নয় চিত্রকল্পও রয়েছে। জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতার চিত্রকল্প তাঁকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছা হয়েছিল এরকম সুন্দর শব্দ সাজিয়ে গল্প লেখার।—জীবনানন্দের কবিতায় যেমন, তেমনি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পেও বারবার পাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণ সংবেদনা। 'গিরগিটি', 'সমুদ্র', 'তিন বুড়ী', 'বনের রাজা'-র মতো অসামান্য গল্পগুলি মনে রেখে বলা যায়, তাঁর গল্পে প্রায়শই পরিব্যাপ্ত তীব্র সংরক্ত, গহন, কখনও বা এলিমেণ্টাল এক অনুভূতি, যার অমোঘ অভিঘাত আমাদের নিহিত অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। আশ্চর্য ইন্দ্রিয়-সংবেদী তাঁর কল্পনা, অসম্ভব স্পর্শাতুর তাঁর বোধ। এই কারণেই এত সজীব প্রত্যক্ষতা-সিঞ্চিত, এত সম্মোহময় তাঁর গল্পের পরিবেশসৃষ্টি। তাঁর গল্পের বস্তু-অনুপুঙ্খগুলি এক অতিরিক্ত আয়তন পেয়ে যায়। মানবমনের দুর্জ্ঞেয় আঁধার হাতড়ে ব্যাধিত মানসতার অতল থেকে তিনি তুলে আনতে পারেন মৌল অস্তিত্বের কোনও অব্যয় অভিজ্ঞান। মধ্যবিত্ত মানুষের নিঃসঙ্গতা ও অবক্ষয়ের

একইসঙ্গে নির্মোহ ও সংবেদী ছবি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তিনি। 'নৈশ ভ্রমণ' বা 'সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু'-র মতো গল্পে বিধৃত আধুনিক মানুষের একাকিত্বের, তার বিবিক্ত, সুদূর সত্তার পরিচয়। 'বনের রাজা' ও 'শ্বাপদ'—এই দুটি গল্পে আরণ্য প্রকৃতির আদিম স্বাভাবিকতার অপ্রতিরোধ্য সম্মোহন দুভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে। 'তিন বুড়ী' গল্পের কেন্দ্রবিন্দু শব্দ—দুরকমের শব্দ—একরকমের শব্দে সময় তথা মৃত্যুর পদধ্বনি, আর এক ধরনের শব্দে তার বিপরীতে জীবনের আত্মঘোষণা। এ গল্প পরিণামে হয়ে ওঠে জীবনবন্দনার কাব্য। 'সমুদ্র' গল্পটির উপর অনন্ত নীলিমার মতো বিস্তৃত একটি গহন অনুভূতি, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মানুষের প্রতিতুলনায় বিশাল, ব্যাপ্ত সমুদ্রের মহিমান্বিত উপস্থিতি। 'গোধূলি' গল্পে সারদার মৃত্যুর তপস্যাই বুঝি হয়ে ওঠে নতুন করে জীবনের অর্থ খোঁজা। বিমল করের গল্পে ভাষা পায় এ সময়ের অসুখ—নিঃসঙ্গতা, সংযোগহীনতা, শূন্যতাবোধ, নিরাশ্রয়তা, শিকড়হীনতা। তাঁর গল্প ভেতর থেকে গড়ে উঠতে চায়, ঘটনাকে গৌণ ক'রে ভাবকে প্রাধান্য দিয়ে, মানুষের নিগূঢ় মনোগহনের উদ্ভাসনে। কখনও কখনও তাঁর গল্পে প্রতীকী তাৎপর্যের ব্যাপ্তি সঞ্চারিত হয়ে যায়। ননী ভৌমিকের গল্পে প্রথমে গভীর জীবননিষ্ঠা ও সংবেদনায় ফুটে ওঠে বঞ্চিত, বুভুক্ষু, মাটি ঘেঁষা-মানুষের জীবনের বাস্তব ছবি। পরবর্তীকালে তিনি ছোটগল্পের প্রকরণগত নবনিরীক্ষায় ক্রমশই অভিনিবিষ্ট হতে থাকেন। তাঁর 'পূর্বক্ষণ' ঘটনাবর্জিত ভাবময় গল্পরচনার প্রয়াস হিসেবে বিশেষ স্মরণীয়। ফেলে আসা ভূখণ্ডের স্মৃতি, শ্রমিক জীবনের জীবিকাগত ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা —এই পুঁজি নিয়ে সমরেশ বসু শুরু করেছিলেন তাঁর কথাসাহিত্য সৃষ্টি। তার 'আদাব' আন্তরিক জীবনবোধে ঋদ্ধ, মানবিকতার উত্তাপে স্পন্দমান। দাঙ্গার পটভূমিকায় এ এক সমস্ত বিভেদ-অতিক্রমী চিরকালীন মানুষের গল্প। 'জলসা' গল্প প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে উপস্থাপন-কৌশলে। মানুষের জীবনের বিচিত্র হাসি-কান্না যেমন 'জলসা' নামটিকে এক ব্যাপক তাৎপর্য দেয়, তেমনি আবার সর্বরিক্ত শ্রমিকপিতার এতদিন-আগ্‌লেফেরা বিকলাঙ্গ মেয়েকে মহাজনের কবলে সমর্পণ, ন্যায়ের সংগ্রামে ফুঁসে ওঠা শ্রমজীবী মানুষের নিরুপায় পরাজয়, জলসার হৃদয়হীন ঔজ্জ্বল্যকে তীব্র ব্যঙ্গে ও বেদনায় আচ্ছন্ন করে দেয়। 'অকালবৃষ্টি', 'জোয়ার ভাঁটা' ও 'অকালবসন্ত'—এই তিনটি গল্পেই আসক্তি অনুরাগের গাঢ় রক্তিমা বিচ্ছেদের আর্তিতে গাঢ়তর হয়ে ওঠে। 'অকালবৃষ্টি'-তে এক প্রৌঢ়ের

রুক্ষ নীরস অন্তর একটি মেয়ের মৃত্যুতে শূন্যতাবোধে, বিষাদে, কোমল মায়ায় আর্দ্র হয়ে ওঠে। 'জোয়ার ভাঁটা' গল্পে সংগ্রামকঠোর শ্রমজীবী জীবনের কর্কশ বাস্তবতার মধ্য থেকেই সমরেশ তুলে আনেন আবহমান কবিতার স্পন্দন। 'অকালবসন্ত' তিন আইবুড়ো মেয়ে, এক ভিন্‌দেশী ঢ্যাঙা, কারখানার ভারি ট্রাক ড্রাইভার, আর পাথর-চাপা-কপাল বুড়িকে নিয়ে বিষাদতীব্র অনুরাগের এক অসম্ভব মন-কেমন-করা গল্প। ব্যক্তিমানুষের বিষণ্ণতা ও পাপবোধ তপ্ত ধাতুস্রাবের মতো উদ্‌গীরিত হয়েছে 'শানা বাউরীর কথকতা' ও 'পাপপুণ্য' গল্প দুটিতে। দুটি গল্পেই 'পাপ' শব্দটি হয়ে ওঠে বীজশব্দ। বেদনায়-ক্ষোভে-ক্রোধে আন্দোলিত শানা বাউরির স্বর বিদ্যুৎ-চকিত উদ্‌ভাসনে আমাদের সমাজ-সভ্যতার দগদগে ঘা-টাকে চিনিয়ে দেয়, খুঁচিয়ে দেয়। একেবারে উদোম হয়ে পড়ে একালের মানুষের লালসা, অর্থলোলুপতা। আত্মঘাতিনী বিন্দুর শব নিয়ে তার বাপ গদাই ও নাগর কেতুর শ্মশানযাত্রার আধারে বিধৃত 'পাপপুণ্য' গল্পটি। 'পাপ' শব্দটির মতোই এতে ঘুরেঘুরে আসে 'অন্ধকার' ও 'আঁধার' শব্দ দুটি। বাপ গদাই-এর নিদারুণ আত্মগ্লানি আমাদের চেতনাকে গভীরভাবে আলোড়িত ক'রে আমাদের ভেতরে তুমুল ভাঙচুর ঘটাতে থাকে। আদিম ও বিশাল এক প্রাকৃতিক শক্তি, তার সঙ্গে মরিয়া সংগ্রামে মত্ত দুই রিক্ত, আতুর, অসহায় মানব-মানবী, পরিণামে ঐ তুচ্ছ-ক্ষুদ্র মানবিক শক্তিরই বিজয়—'পাড়ি' গল্পে এই ভাববস্তু, বর্ণনা, আবহনির্মাণ ও ভাষার আশ্চর্যতায় এক মহৎ কাব্যের আবেগস্পন্দিত অভিঘাত নিয়ে আসে। ঘটনা বলতে এখানে ঠিক তেমন কিছু নেই ; একটি বিপন্নতা-তাড়িত পরিস্থিতি—বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টির উদ্দামতায় গঙ্গার উত্তাল স্রোতে লড়াই করতে করতে এক দেহাতি দম্পতির উনত্রিশটা শুয়োর অপর পারে নিয়ে যাবার প্রায়-অসম্ভব প্রচেষ্টা—একে ঘিরেই গল্পকারের সাসুপুঙ্খ বর্ণনা এক নাটকীয় উৎকণ্ঠাকে টান টান করে তোলে। 'স্বীকারোক্তি' গল্পে চেতনাপ্রবাহ-পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে ; নায়কের ভাবনাস্রোতে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে গেছে। একটা ক্রুদ্ধ-কুটিল প্রশ্নপর্বের মধ্যেই ঢুকে গেছে আর এক প্রশ্নপর্বের দুঃস্বপ্ন-জড়ানো স্মৃতি। এই গল্পের প্রতিপাদ্য যে-কোনপ্রকার শাসন বা নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন বিবেক ও ইচ্ছাশক্তির প্রতিবাদ, প্রতিষ্ঠা।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পে উপদ্রুত পারিপার্শ্বিক, নিষ্ঠুর বাস্তব পরিস্থিতিকে, ক্রোধোদ্ধত অসহিষ্ণু বিবেক ও গভীর সংবেদনা নিয়ে গল্পরূপ

দিতে চেয়েছেন। আপাত-জটিল ব্যতিক্রমী গদ্যশৈলী, অনুপুঙ্খের উপস্থাপনে সজীব এক চিত্রময় ধ্রুপদী বর্ণনারীতি, অব্যবহিত পারিপার্শ্বিক ও সমকালীন মানুষের মধ্য থেকেই আবহমান সময় ও মানুষের অন্তর্গত সত্যকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলার বিস্ময়কর সামর্থ্য, সর্বোপরি সামগ্রিক আবহে ও অভিঘাতে কবিতার অমোঘ সংক্রাম কমলকুমার মজুমদারের ছোটগল্পকে এক অনাস্বাদিত স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছোটগল্পে কাহিনীরস উপেক্ষিত নয়; তদুপরি সেখানে রয়েছে নাটকীয়তার বিস্ময়, কোনও কমবেশি ব্যতিক্রমী চরিত্রের বৃত্তান্ত। তবু বর্ণনারীতি তথা গদ্যের প্রচলনবহির্ভূত তির্যকতা, গল্পে প্রতিফলিত প্রতিন্যাস তথা মানসতার স্বাতন্ত্র্য তাঁর গল্পকে এক বিশেষ আয়তন দিয়েছে। অসংখ্য মানুষের দেশবিভাগোত্তর ছিন্নমূল অস্তিত্ব, বাঁচার মরিয়া লড়াইয়ে সমাজ-নির্ধারিত গণ্ডির বাইরে ছিটকে পড়া হতাশ যুবশক্তি, রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যের হিংস্র কুটিল অন্তঃসংঘাতে বিস্ফোরণ, অগ্রজদের প্রতি আস্থাহীন মোহমুক্ত প্রশ্নোদ্ধত তাজা যৌবনের রক্তক্ষরা আত্মাহুতি—উপদ্রুত পারিপার্শ্বিক তথা বিক্ষুব্ধ সময়ের এই তুমুল বাস্তবতাকে অসীম রায় তাঁর কয়েকটি গল্পের ফ্রেমে ধরে দিতে চেয়েছেন। 'জল', 'দ্রৌপদী', 'স্তন্যদায়িনী' এবং আরও কয়েকটি গল্পে মহাশ্বেতা দেবী সমাজের প্রান্তবাসী শোষিত, অত্যাচারিত, ক্ষুধার্ত মানুষের, উপেক্ষিত প্রতারিত আদিবাসীদের ভূমিহীন খেতমজুরদের জীবনযন্ত্রণা, ক্বচিৎ বাঁচার লড়াইয়ে তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ-প্রয়াস যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি রূপায়িত করেছেন পুরুষশাসিত সমাজে নারীর লাঞ্ছনা, অধিকারচ্যুতি আবার ক্বচিৎ স্বাতন্ত্র্য সন্ধানে তার ঘুরে দাঁড়ানো। মহাশ্বেতার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনারীতি তাঁর সপ্রতিভ মননদীপ্র উপস্থাপনে একটি ভিন্ন আয়তন লাভ করে।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা ছোটগল্পে একটা নতুন ধারার সৃষ্টিপ্রবাহ দেখা দিল, যাকে অচিরে চিহ্নিত করা হলো 'নতুন রীতির ছোটগল্প' বলে। এই সৃষ্টি-উৎসারের বিকাশে অগ্রজ গল্পকার বিমল করের সোৎসাহ সক্রিয় প্রবর্তনা উপেক্ষণীয় নয়। ছোটগল্পের মসৃণ বৃত্তকে যথাসম্ভব ভেঙে এই নতুন রীতির গল্পকারেরা কখনও আত্মকথন ও আত্মচিন্তার ভঙ্গিতে, কখনও রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে, কখনও রূপকথার আবহ সৃষ্টি করে, কখনও বাস্তবকে পরাবাস্তবে মিলিয়ে দিয়ে, কখনও চেতনাপ্রবাহের উপস্থাপনে, কখনও গান বা কবিতার চিত্রকলা ও ভাবানুষঙ্গ

ব্যবহার করে বা শিল্পশুদ্ধতা দেবার অভিলাষে গল্পকে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে এসে, সমকালীন মানবিক অস্তিত্বের নানা সমস্যা, তার বিপন্নতা, সত্তা-পরিচয়ের সংকট এবং মানবজীবনের অন্তর্বাস্তবতাকে রূপ দিতে চাইলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মতি নন্দী। দীপেন্দ্রনাথ 'নরকের প্রহরী', 'জটায়ু' ও 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-য় উপদ্রুত পারিপার্শ্বিকে ব্যক্তির বিপন্নতা, অস্তিত্বের সংকট, নিরাশ্রয়তা ফুটিয়ে তোলেন। 'জটায়ু'-তে রূপকের আভাস ফোটে, শিল্পরূপের দিক দিয়ে বীজগর্ভ 'চর্যাপদের হরিণী'-তে পাই প্রতীকের প্রয়োগ। দেবেশ ও সন্দীপন, দুজনেরই গল্প প্রচল-অতিক্রমী গদ্যশৈলীতে বিশিষ্ট। তবে 'বিজনের রক্তমাংস', 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী', 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী' প্রভৃতি গল্পের কথা মনে রেখেও বলা চলে সন্দীপনের গল্প প্রধানত উপস্থাপনের ঔজ্জ্বল্যেই চমকিত করে, কিন্তু দেবেশ গল্পের প্রসঙ্গভাবনাতেও অনেক গভীরে প্রবেশ ক'রে একালের মানুষের বিচ্ছিন্নতা, সংযোগশূন্যতা, শিকড়হীনতা, সত্তা-পরিচয়ের সংকট, সমকালীন রাজনীতির বঞ্চনা, অন্তর্ঘাত, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতাকে মর্মস্পর্শী কথারূপ দিতে পেরেছেন। 'তাপের শীর্ষে'-র মতো গল্পে উপস্থাপনের অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন মতি নন্দী, অন্যান্য কয়েকটি গল্পেও তিনি উপদ্রুত পারিপার্শ্বিক ও এ সময়ের বিপন্ন বেঁচে থাকাকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। শীর্ষেন্দু কাহিনীক্ষীণ ভাবময় কয়েকটি গল্পে, কবিতার মতো দ্যোতনাময়তায়, কখনও বা প্রতীকের আশ্রয়ে, ব্যক্তির একাকিত্ব, শূন্যতা, অস্তিত্বের সংকটকে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। ঠিক এঁদের সহযাত্রী না হলেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'পলাতক ও অনুসরণকারী'-র মতো গল্পে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও তারই আবর্তের মধ্যে ব্যক্তি-অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতা—অনিশ্চয়তা, স্বল্প বর্ণনা ও কাটা-কাটা সংলাপে অব্যর্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এর পরে ষাটের দশকে বাংলা ছোটগল্পে নতুন দিগন্ত সন্ধানের নানা প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'এই দশক' পত্রকে অবলম্বন করে শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারেরা : রমানাথ রায়, শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত, অমল চন্দ, আশিস্ ঘোষ, কল্যাণ সেন প্রভৃতি আত্মপ্রকাশ করেন। কাহিনীহীনতাকে একটা চরম সীমায় নিয়ে গিয়ে, বাইরে থেকে সূক্ষ্ম পুঙ্খ বস্তু-বর্ণনায়, এঁরা, ভোগবাদী সমাজ-সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা, ব্যক্তি-অস্তিত্বের অর্থহীনতাকে গল্পে রূপ দিতে

তৎপর হয়েছেন। এঁদের মধ্যে নিঃসংশয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী গল্পকার রমানাথ রায়। ভোগ্যপণ্যশাসিত সমাজের হিম যান্ত্রিকতা, ব্যক্তিঅস্তিত্বের শূন্যতাবোধ, অনিশ্চয়তা, নিষ্ফলতা, ক্লান্তিকর একঘেয়েমি, চাপা কৌতুকের স্ফুরণে, কখনও ব্যঙ্গ তির্যকতায়, কাটা-কাটা বাক্যবিন্যাসে, নিস্পৃহ নির্লিপ্ত স্বরভঙ্গিতে, চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে স্টাইলাইজড্ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে, রমানাথ তাঁর গল্পে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের গোষ্ঠীভুক্ত না হয়েও পরে এঁদের সহযাত্রী অতীন্দ্রিয় পাঠক মানবিক অস্তিত্বের অন্তর্বাস্তবতাকে, চরিত্রের ভাবনার অন্তঃস্রোতকে, গল্পে আধারিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন, গদ্যের ব্যতিক্রমী বিন্যাসে, কাব্যময় আবহ নির্মাণ ক'রে। এই সময়ের আর এক শক্তিশালী গল্পকার সুবিমল মিশ্র। উগ্র আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে প্রায়শই গল্প শুরু করেন সুবিমল। কখনও বা আবেগ-তাড়িত বাক্যস্রোতে উদ্‌গিরিত হয়ে আসে তাঁর ঘৃণা ও ক্রোধ। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে নিয়ে, উপদ্রুত পারিপার্শ্বিককে, সমকালীন সমাজের পচা গলা মূল্যবোধ, ব্যভিচার, ভণ্ডামিকে, ব্যক্তির বিপন্নতা ও অসহায়তাকে, প্রকরণগত নানা অভিনব নিরীক্ষায়, সংবাদ-পত্রের সংবাদ, মন্তব্য, উদ্ধৃতি ইত্যাদি নানা উপাদান কোলাজের মতো সাজিয়ে, কখনও বা চলচ্চিত্রের প্রকরণ আশ্রয় ক'রে, কখনও বাস্তবকে পরাবাস্তবে উত্তীর্ণ ক'রে, সুবিমল তাঁর গল্প রচনা করেছেন। এরই পাশাপাশি বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, সুধিমল বসাক প্রভৃতি হাংরি গল্পকারদের প্রয়াস, উদয়ন ঘোষ ও অরূপরতন বসুর তীক্ষ্ণ পারিপার্শ্বিকতা-সচেতন মননদীপ্ত কথাবয়ন এবং জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, অমর মিত্র, চণ্ডী মণ্ডল প্রভৃতির বাস্তববাদী গল্পধারা স্মরণ করতে হয়।

এর পরে যাঁরা গল্প লিখতে শুরু করেছেন, তাঁদের মধ্যে স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কল্যাণ মজুমদার, আফসার আমেদ, আবুল বাশার, সৈকত রক্ষিত, ভগীরথ মিশ্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম করা যায়। এঁদের গল্পধারা সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করলে এ সিদ্ধান্তে অনিবার্য আসতেই হয় যে বাংলা ছোটগল্প আবার কাহিনীমুখ্য বাস্তবতার দিকে, এমনকি কিছুটা যেন স্থানিক-বর্ণিমা-চিহ্নিত আঞ্চলিক জীবন-পরিমণ্ডলের দিকে, মুখ ফেরাতে চাইছে।

অরুণকুমার ঘোষ

বিচ্ছিন্নতাবোধ ও উপন্যাস : একালের উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা ক্রমবর্ধমান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে সাহিত্যে যে অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল, দিনে দিনে তা মহীরুহ আকার ধারণ করেছে। বিচ্ছিন্নতার সাধারণ অর্থ বিযুক্তি। পুরনো মূল্যবোধের ভাঙন হয়েছে, অথচ নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি—এরকমই ক্রান্তিলগ্নে মানুষ বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত হয়েছে। দিনে দিনে বিচ্ছিন্নতার ভাবনা আরও তীব্রতর হয়েছে। ব্যক্তিতান্ত্রিক ভাবনাপুষ্ট সমাজের ভারসাম্যহীনতা যত বাড়তে থাকে, সেইসঙ্গে বর্ধিত হয় ব্যক্তিত্বের দুর্গতি, একাকিত্ব, উদাসীনতা। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনাই বিচ্ছিন্নতার আদি ভিত্তি। আঠার-উনিশ শতক থেকেই বিভিন্ন চিন্তাবিদ, দার্শনিক, কবি সাহিত্যিকেরা বিচ্ছিন্নতার প্রকৃতি নিয়ে ভাবিত হয়েছেন। রাষ্ট্রযন্ত্র ও জনগণের সম্পর্কের মধ্যে মানুষের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছিলেন রুশো। হেগেল ভাববাদী ব্যাখ্যায় বিচ্ছিন্নতার দার্শনিক তত্ত্ব নির্দেশ করলেন। পক্ষান্তরে বিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডের 'নির্জ্ঞান মনের তত্ত্ব'-ও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল সন্দেহ নেই, যে তত্ত্বের মূল কথা "It is human nature that is wrong…" ফ্রয়েডীয় ধ্যানধারণা তথা 'লিবিডোতত্ত্ব' ছিল সাবজেকটিভ, যে ধারণায় নিউরোসিসকে অনতিক্রম্য জ্ঞান করা হয়েছে। মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের বিকৃতি ও শৈশবের হতাশা-বঞ্চনাকেই সেখানে বিচ্ছিন্নতা তথা নিউরোসিসের একমাত্র কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবার অ্যাডলার অ্যালফ্রেড ফ্রয়েডীয় কর্মসর্বস্বতার বদলে ক্ষমতাসর্বস্বতাকে দায়ী করেছেন বিচ্ছিন্নতার জন্য, এর মতের পুরোধা ছিলেন নীট্‌শে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে প্যাভলভ মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের সূত্রে বিচ্ছিন্নতাকে ব্যাখ্যা করেছেন, যা অবজেকটিভ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। একালের মার্কিন সমাজবিজ্ঞানীর (রবার্ট মর্টন অ্যানমি) মতে কোন বৃহত্তর সমাজে আচরিত রীতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদর্শ ও লক্ষ্যের অসামঞ্জস্য হেতু যে-বিপর্যয় ঘটে, তাই-ই বিচ্ছিন্নতা। অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে মার্কসের আলোচনা বিশেষ ভাবতত্ত্বে নিহিত। মূলত হেগেলীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে মার্কস বিচ্ছিন্নতার আলোচনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি অবজেকটিভ। উৎপাদনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব—এই তাঁর অভিমত। মার্কসীয় দর্শনে বিচ্ছিন্নতার চারটি স্তর—মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, সমাজ থেকে

বিচ্ছিন্ন, নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, মানব-প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন। এই সবই বস্তুতপক্ষে শ্রম-বিচ্ছিন্নতার পরিণতি। মার্কসের বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন হাঙ্গেরীয় গবেষক এল. মেসজারস্ তাঁর *Marx's theory of alienation* (১৯৭০) গ্রন্থে। তাঁর বিশ্লেষণে লক্ষ্য করি, বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিক মালিকের স্বার্থে উৎপাদন করে, শ্রম যত খণ্ডিত ও জটিল হয়, মানুষও তার উৎপাদিত বস্তুর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নিজের শ্রম থেকে বিচ্ছিন্নতার অর্থ নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা, ফলত সমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হওয়া। মার্কসীয় দর্শনে বিচ্ছিন্নতার সীমা অতিক্রমণই বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য। তাই শ্রেণীভিত্তিক সমাজের পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা সেখানে ব্যক্ত হয়েছে। এরিক ফ্রম আধুনিক মানুষের সংকট, বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক সমাজে নিরাপত্তার অভাবজনিত টেনশনকে বিচ্ছিন্নতার মূল লক্ষণ বলে নির্দেশ ক'রে হেগেল ও মার্কসের বক্তব্যের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করেছেন।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে অস্তিবাদী দর্শন (existentialism) বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। মানবজাতি তথা মানবতার সংকট থেকে উদ্ভূত অস্তিবাদ ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধ ধারণা। ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি ছিল না, কিন্তু অস্তিবাদে ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্য সর্বাধিক। অস্তিবাদীরা তাই অস্তিত্ব শব্দটি অন্য প্রাণী বা পদার্থের ক্ষেত্রে নয়, শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের মতে 'বেঁচে থাকা' (to live) ও অস্তিত্বশীল হওয়া (to exist) সমার্থক নয়। অস্তিত্বশীল বলেই মানুষের বিচ্ছিন্নতার সমস্যা তীব্র। অস্তিবাদী দর্শনের আদি প্রবক্তা কিয়েৰ্কগার্দ। অবশ্য তার আগেই হুসার্লের ফেনোমেনোলজি বা মানসঘটনাবাদে অস্তিবাদের প্রেরণা ছিল। অস্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে যেমন কিয়েৰ্কগার্দ, কার্ল য়্যাস্পার্স, গ্যাব্রিয়েল মার্সেলের মতো আস্তিক-অস্তিবাদী বা খ্রীষ্টভক্ত আছেন, তেমনি আছেন নীট্শে, সার্ত্র ও কামুর মতো নাস্তিক অস্তিবাদী। মূলত ফেনোমেনোলজি থেকে সার্ত্র অস্তিবাদের যেভাবে বিকাশ ঘটালেন তাতে সারা ইউরোপে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী সার্ত্রে-র অস্তিবাদে মানুষের বিচ্ছিন্নতার সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত স্পষ্ট। লেখক হিসেবেও সার্ত্র সামাজিক দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে ছিলেন সচেতন। মার্কসবাদকেই তিনি আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিতে

যোগ দেননি। সোভিয়েতের সমর্থক হয়েও তার বিচ্যুতির প্রতিবাদ করেছেন, এবং কমিউনিস্টদের বিরাগভাজন হয়েছেন। আবার কমিউনিজম-প্রীতির প্রশ্নেই কামুর সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক বিরোধের সূচনা। একসময় পার্টির সদস্য হয়েও পরে পার্টির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে কামু সাম্যবাদবিরোধী হয়ে ওঠেন। তবে সার্ত্র মার্কসবাদের কাঠামোর মধ্যেও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছেন। তিনি কোন কিছুর দ্বারাই অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রণকে স্বীকার করেননি। সার্ত্র এমন কথাও বলেছিলেন যে অস্তিবাদী বিচ্ছিন্নতার সমস্যা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও বিদ্যমান,—'The desire for happiness, the fear of death, the experience of solitude, the dread of life or the sense of its meaninglessness—remain unresolved as much as under socialism as under capitalism.' ('A Philosophy of Man', অ্যাডাম শাফ থেকে উদ্ধৃত)। তবে বিচ্ছিন্নতাকে সত্য জেনেও তার উত্তরণে অর্থাৎ মানবতাবাদী ইতিবাচক সমাধানে অস্তিবাদী সার্ত্র বিশ্বাসী।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের আর্থ-সামাজিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার লগ্নে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা নিয়ে পাশ্চাত্যে লেখা হয়েছে অনেক উপন্যাস। অস্তিবাদী আন্দোলনের প্রথম দিকে অর্থাৎ উনিশ শতকেই রুশ সাহিত্যে দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে। তাঁর নোটস্ ফ্রম দি আণ্ডার-গ্রাউণ্ড, ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট, দি ইডিয়ট, বা ব্রাদার্স কারামোজভ উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বের একাকিত্ব, তীব্র পাপবোধ, তার বিপন্ন বিস্ময় লক্ষ্য করা যায়। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্টে'র নায়ক রাস্কলনিকভ, কিংবা 'ইডিয়টে'র নায়ক মিশকিনের সমস্যা অস্তিবাদী বিচ্ছিন্নতারই সমস্যা। তবে ১৯৪২-এ ফরাসি সাহিত্যে আলবেয়র কামুর 'দি স্ট্রেঞ্জার' উপন্যাসটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সাহিত্যরসিক সচকিত হলো বিচ্ছিন্নতার ভয়ংকর রূপ ও তার সমস্যা সম্পর্কে। অস্তিবাদী দর্শনের প্রবক্তা ও প্রধান তাত্ত্বিক সার্ত্র কামুর এই উপন্যাসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিলেন। কামু কিন্তু সার্ত্রের মতো অস্তিত্বের সংকট ও মানুষের বিচ্ছিন্নতার কোন সমাধান খুঁজে পাননি। তবে অস্তিত্বের সংকট ও মৃত্যুকামনার মধ্যেও যথার্থ অস্তিবাদীর মতো নৈরাশ্যবাদকে কামুও মেনে নেননি। 'দি স্ট্রেঞ্জার'-এর নায়ক মারসল এই পৃথিবীতে বহিরাগত, অনাত্মীয়ের মতো বাস করে। মায়ের মৃত্যুসংবাদেও

সে বিচলিত হয় না। মায়ের মৃত্যুর পরদিনই সে নির্বিকারচিত্তে রমণী-সান্নিধ্যে সময় কাটায় ও তাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। একজন আরবকে আকস্মিকভাবে হত্যা করায়, এবং বিচারকের কাছে প্রাণদণ্ডের আদেশ গ্রহণ করাতেও তার সেই নির্বিকারচিত্ততা অটুট থাকে। এই উপন্যাসে অস্তিত্বের সংকট ও বিচ্ছিন্নতার সমস্যা উপস্থাপনে সার্ত্রের প্রভাব স্পষ্ট। কামুর 'দি প্লেগ', 'দি রেবেল', 'দি ফল' ইত্যাদি রচনাতেও অস্তিবাদী বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ রয়েছে। পাশাপাশি সার্ত্রের 'নসিয়া', 'দি এজ অফ রিজন' প্রভৃতি উপন্যাসেও বিচ্ছিন্নতার সমস্যা মূর্ত। 'নসিয়া'র নায়ক রুকিন্তাঁ অস্তিত্বের সংকট থেকে আত্মহননকামী হয়ে উঠেছে। আর 'এজ অফ রিজনে'র নায়ক ম্যাথু প্রণয়িনী ও তাদের সন্তানের হাত থেকে মুক্তি পেতে গর্ভপাত চায়। কাফকার 'দি ট্রায়াল', 'দি ক্যাসল' বা 'মেটামরফসিসে'-ও অস্তিত্বের সংকট ও বিচ্ছিন্নতার প্রজ্জ্বলন্ত সমস্যা সার্থক শিল্পরূপ লাভ করেছে।

বাংলা উপন্যাসে অবশ্য অস্তিবাদী বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ এতখানি ব্যাপক হয়নি। গোপাল হালদারের মতে আমাদের দেশের সমাজকাঠামো ও চেতনার প্রেক্ষিতে এতখানি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী বিচ্ছিন্নতা ও তার ভয়ংকর রূপ আশা করা যায় না, তাঁর ভাষায় 'আমাদের সনাতন সমাজে আমরা পিতামাতা, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ প্রভৃতির মধ্যে এমনি লেপ্টে থাকি যে নিজের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হই না।' (ভূমিকা অংশ, বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)। তবে বিচ্ছিন্নতা-বোধ মানব প্রবৃত্তির মৌল লক্ষণ। তাই বাঙালি সাহিত্যিকরাও এই ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন। উনিশ শতকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের 'অনন্ত জনস্রোত মধ্যে আমি একা', কিংবা 'রজনী' উপন্যাসে অমরনাথের 'এ জীবন লইয়া কি করিব' উক্তিতে বিচ্ছিন্নতার আর্তি আভাসিত। তবে বাংলা উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতার ভাবনা ঘনীভূত হয়েছে বিশ শতকে, বিশেষ করে ১৯৪০-এর পরবর্তী কালে। বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে, সামাজিক ক্ষেত্রে সংকট ও নিরাপত্তাবোধের অভাব, বামপন্থী শিবিরে ভাঙন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সঙ্গে পাশ্চাত্যের অস্তিবাদী আন্দোলনের প্রভাবের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতার রূপায়ণ ঘটতে থাকে। বিশেষ করে সার্ত্র, কামু, কাফকার উপন্যাসগুলি বাঙালি লেখকদের প্রেরণাস্থল হয়ে ওঠে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী চরিত্রে

বিচ্ছিন্নতার সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। শশী অনেকটা সাত্রঁর 'নসিয়া'র রুকিঁত্যা অথবা 'রোড টু ফ্রীডমে'র ম্যাথুর মতো অস্তিত্বের সংকটে হতাশ হয়েছে। 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের রাজকুমারও বিচ্ছিন্নতার সমস্যায় আক্রান্ত। তার স্বীকারোক্তি: 'কারো সঙ্গে আমার বনে না, সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।' সতীনাথ ভাদুড়ীর 'অচিন রাগিণী', 'সংকট', 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতার রূপায়ণ আরো সার্থক। 'সংকটে'র কর্তব্যসচেতন বিশ্বাসজী যে ভাবে 'অযৌক্তিক অনির্দেশ্য অমোঘ প্রবাহে' ভেসে গেলেন তাতে অস্তিত্বের সংকট যথাযথভাবে ধরা পড়েছে। সে তুলনায় সমরেশ বসুর 'বিবর'-'পাতকের' মতো উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ থাকলেও অস্তিবাদী ভাবনার যথার্থ প্রকাশ ঘটেনি। অবশ্য বিচ্ছিন্নতা ও ক্লান্তি থেকে মুক্তির এষণাও সমরেশের উপন্যাসে দুর্লক্ষ নয়। বাংলা উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা হয়তো পাশ্চাত্যের মতো সেভাবে দানা বাঁধেনি, তবু বেশ কিছু উপন্যাসের নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়, যেগুলিতে কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো প্রচ্ছন্নভাবে এই সমস্যার রূপায়ণ ঘটেছে, যেমন বিমল করের 'পূর্ণ অপূর্ণ', 'ফাল্গুনের আয়ু', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীরার দুপুর', 'প্রেমের চেয়ে বড়', বুদ্ধদেব বসুর 'শেষ পাণ্ডুলিপি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাচের দরোজা', সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা', 'পারাপার' ইত্যাদি। সমকালীন আরো অনেকের লেখায় অস্তিত্বের এই সংকট ক্রমবিস্তারী ছায়া ফেলছে।

অসিত দত্ত

বিষয়বস্তু (উপন্যাস) : উপন্যাস কাব্য-নাটকের তুলনায় অর্বাচীন। মাত্র এক শতকের পরিসরে বাংলা উপন্যাস প্রশংসনীয় বিষয়বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হলেও এখনও সম্ভাব্য অনেক বিষয় ও রীতির সার্থক পরিণতি ঘটেনি। উপন্যাসের স্বরূপ-লক্ষণেই তার বিষয়বস্তু আভাসিত হতে পারে। কিন্তু উপন্যাস লক্ষণ সম্পর্কেও ঐক্যমত নেই। সুনিবদ্ধ আখ্যান (Plot), চরিত্র, সংলাপ, পরিবেশ এবং জীবনসমালোচনা—এই পঞ্চাঙ্গ লক্ষণের মধ্যে কখনো প্লট, কখনো চরিত্র, কখনো বা জীবনসমালোচনাকেই মৌল লক্ষণ বলা হয়েছে। স্বয়ং ঔপন্যাসিকরাও উপন্যাসের প্রকৃত বিষয় এবং উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে ভিন্নমত। বাংলা উপন্যাস এখনও প্রধানত প্লট-নির্ভর। তবু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, এবং রবীন্দ্রোত্তর উপন্যাসে প্লটের বিন্যাস আমূল বদলেছে। পূর্বে ঘটনার চমৎকারিত্ব ও আখ্যানের

নিটোল ঐক্যবিধানের উপায় ছিল চরিত্রের প্রবর্তনা, অধুনা চরিত্রের অন্তর্জীবন বিশ্লেষণ মুখ্য—আখ্যান, পরিবেশ বা সংলাপ তারই অনুগ। আবার জাঁ ক্রিসতফ, ডেভিড কপারফিল্ড বা শ্রীকান্ত বহুতর পার্থক্য সত্ত্বেও একক চরিত্রের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে সগোত্র। এ শ্রেণীর উপন্যাসে লেখকের জীবন-সম্পর্কিত ভাষ্যই প্রধান, প্লট ও চরিত্র যেন উপযোগী নিদর্শন—জীবনভাষ্য যার থেকে আহৃত। সম্প্রতি অনুসৃত চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে মানুষের সামগ্রিক অখণ্ড পরিচয় নেই, আছে কেন্দ্রীয়চরিত্রের স্বগতচিন্তা। উপন্যাসের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য নিয়ে এমন মতপার্থক্য প্রচলিত বলেই তার বিষয়বস্তু নির্দেশ করা কঠিন। ভ্রমণকাহিনী, আত্মচরিত, নিসর্গচেতনা, ইতিহাসবোধ, রাজনীতি, অধ্যাত্ম-প্রেরণা প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়বস্তুরূপে সমাদৃত। কেবল সংক্ষেপের ইচ্ছাতেই এক পংক্তিতে এতগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা হলো, নতুবা প্রতি বিষয়েই বিশিষ্ট লেখক অনুযায়ী উপন্যাস একাধিক উপশ্রেণীতে চিহ্নিত। শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের নানাপর্যায় ও মতকে নিয়েই বিষয় বিস্তারিত হতে পারে। সমাজের পটে ব্যক্তির জীবন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ অবশ্য সব উপন্যাসেরই উপজীব্য। কারণ 'There is never more suffering or worse suffering at any one time in the world than the worst that can be contained in one human consciousness.'

ঔপন্যাসিক থ্যাকারে আক্ষেপ করেছেন, হেনরি ফিল্ডিংয়ের পর উপন্যাসে আর সম্পূর্ণ মানুষের পরিচয় মেলেনি। থ্যাকারে-ঈপ্সিত অর্থে উপন্যাসের বিষয় হবে সমগ্র মানুষের প্রতিফলন, তার স্থূল সূক্ষ্ম দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির সম্পূর্ণ প্রকাশ। ফিল্ডিংয়ের 'টম জোন্স' যে-অর্থে গোটা-মানুষের কাহিনী, বাংলায় তার প্রতিরূপ নেই, যেমন নেই টলস্টয়ের 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীসে'র সমগোত্র।

উপন্যাসের বিবর্তনে বারংবার ঘটেছে বিষয়ের পরিবর্তন। তবু ইতিহাস, রাজনীতি, নিসর্গ, অধ্যাত্মবোধ এসব উপন্যাসের প্রকৃত বিষয়বস্তু নয়, এগুলি আখ্যানেরই অন্তর্গত—আখ্যানকে বিশেষিত করে মাত্র। উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিহিত চরিত্রমাধ্যমে বিন্যস্ত তাৎপর্যময় বক্তব্যে। কোনো উপন্যাসের বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করা যায় না। কারণ কেবল কাহিনী-অংশেরই সারসংকলন সম্ভব, লেখকের কয়েকটি আত্মপ্রক্ষেপমূলক অনুচ্ছেদ, কিংবা নায়ক-নায়িকার

সময়োচিত সংলাপ—তারও নির্ভরযোগ্য সারমর্ম নিবেদন করা যেতে পারে। কিন্তু সেই সংলাপ উচ্চারণের সময় চরিত্রের অনুভূতি, ঔপন্যাসিকের নিরাসক্তি সত্ত্বেও ঘটনা-সংস্থাপনে ও কথোপকথনে বিম্বিত তাঁর জীবনবোধ এবং সর্বোপরি উপন্যাসের এইসব মিলিয়ে পাঠকচিত্তে সঞ্চারযোগ্য একটি জীবনজিজ্ঞাসা—সে তো সংক্ষেপে বর্ণনীয় নয়।

উনিশ শতকের শেষার্ধেই 'যথাযথ' বাস্তব চিত্রণে ঔপন্যাসিকদের অনীহা দেখা যায়। বিজ্ঞান-দর্শনের নানা নতুন আবিষ্কারে জীবনের পুরনো বিশ্বাস, পুরনো সত্যের ভিত্তি ভেঙে গেল। ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান, বের্গসঁর গতিবাদী দর্শনের প্রভাব উপন্যাসে অনুস্যূত হলো। মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌সের অর্থনৈতিক তত্ত্বও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া আনল। তাই 'ঘটনাপ্রধান' (fiction of incident) উপন্যাস হয়ে উঠল 'চরিত্রপ্রধান' (fiction of character)। বহির্মুখ ঘটনাসংঘাতের পরিবর্তে এল অন্তর্ভাবুকতার (Inward Turning) রূপায়ণ। স্কট্, স্মলেট্, ফিল্ডিংয়ের উপন্যাস এবং দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, সমাজ, স্বর্ণলতা, ফুলজানিতে লেখকেরা ঘটনার ঘট ভরিয়েছেন। এসব উপন্যাসে কাহিনী-অতিরিক্ত বিষয়বস্তু কিছু নেই। অন্যপক্ষে, বিষয়বস্তুর মহত্ত্বেই ডস্টয়েভস্কির উপন্যাস কালজয়ী। নতুবা প্রকরণবিষয়ে তাঁর শৈথিল্য প্রচুর। 'ব্রাদার্স কারামাজভ' দীর্ঘকাল ধরে লেখা, তবু অসমাপ্ত। একটি গূঢ় জীবনজিজ্ঞাসা উচ্চারিত হয়েছে বলেই এটি মহৎ উপন্যাস। উপন্যাস-রচনামূলে সক্রিয় এই অন্তঃপ্রেরণাকেই 'Philosophical occupation' বলা যায়। 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীসে'র ইতিহাসপটভূমি উপন্যাসের বহিরঙ্গ বিস্তার মাত্র, প্রকৃত বিষয়বস্তু 'Everyman has a two-fold life ; on the one side is his personal life which is free in proportion as its interests are abstract, the other is life as an element as one hue in the swarm ; and here a man has no chance of disregarding the laws imposed upon him.' মানবচৈতন্যে এই গভীর যন্ত্রণা বিভিন্ন সমাজ-পরিবেশে বিভিন্ন রূপ নেয়। একই বক্তব্য 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীসে' একভাবে এবং 'অ্যানা কারেনিনা'য় অন্যভাবে ব্যঞ্জিত। রাসকল্‌নিকভ, টোমাস্ ফরসাইট, এমনকি উপন্যাসের অগ্রজকল্প গ্রন্থের নায়ক রবিনসন ক্রুশোও এই দ্বৈতলক্ষণে চিহ্নিত চরিত্র। নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, শৈবলিনী, গোরা, কিরণময়ী, নরেন্দ্র (মাধবীকঙ্কণ), শশী (পুতুলনাচের ইতিকথা)

উপন্যাসে বিশেষ বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্ট। অবশ্য উপন্যাসের বক্তব্য এবং চরিত্রসৃজনীকল্পনা লেখকচৈতন্যে অন্বয়সূত্রে অন্বিত।

বলা বাহুল্য, উপন্যাসের বিষয়বস্তু কখনোই প্রবন্ধের বিষয়ের মতো সরাসরি উপস্থাপিত হয় না, উপন্যাস বক্তব্যকে বিবৃত করার ফ্রেম নয়, উপন্যাস প্রধানত একটি শিল্পরূপ। চরিত্রবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লেখকের অন্বিষ্ট বিষয়বস্তু চরিত্রের অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। ঔপন্যাসিকের বিবৃতি সেখানে অবান্তর।

'ফরসাইট সাগা' এবং 'বিষবৃক্ষ' ভিন্নকোটির রচনা, ভিন্ন আকাঙ্ক্ষার বাণীরূপ। তবু রচনা দুটির সামান্য লক্ষণ—শিল্পীর জীবনধারণা ও উপন্যাসবিষয়ের ঐক্য। সোমস্ ফরসাইট, তাঁর ফ্যাশনদুরস্ত বন্যা, অভিজাত পার্লামেন্টসদস্য জামাতা প্রভৃতি সম্পর্কে গলস্‌ওয়ার্দি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। খণ্ডচিত্র রূপে বর্ণনাগুলি সুন্দর, কিন্তু তারা স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, একটি বৃহত্তর বক্তব্য-ব্যঞ্জনার অন্তর্গত হয়েই সার্থক। 'ফরসাইট সাগা'র বিষয়বস্তু 'immense history of middle class family, its rise and finally in the second trilogy, of which Swansong is the last volume, of its disintegration.' 'বিষবৃক্ষে' প্রকাশিত বিধবাবিবাহ বিষয়ে মনোভাব, ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে মন্তব্য, 'বিষবৃক্ষের ফলোৎপত্তি' আধুনিক পাঠকের মনঃপূত না হতে পারে। কিন্তু প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের নব্য বণিকতন্ত্রে পরিবর্তন, বাণিজ্যসূত্রে নগেন্দ্রনাথের কলিকাতা-সংস্রব, প্রণুব-ফেয়ারলির সঙ্গে শ্রীশের সম্বন্ধ, কমলমণি ও সূর্যমুখীর মিস টেম্পেলের কাছে ইংরাজি শিক্ষা—বাংলা উপন্যাসে আধুনিক বিষয়বস্তুর সংযোজন। নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনী তিনজনেই সৎ নরনারী। নগেন্দ্রের চিত্তসংযমের ইচ্ছা ও অসামর্থ্য, সামঞ্জস্যবিধানে সূর্যমুখীর প্রয়াস ও অশক্যতা, কুন্দের জীবনাসক্তি উপন্যাসের ট্রাজিডিকে শোচনীয় করে তুলেছে। এই শোচনীয়তা সেকালের ব্যক্তিস্বাধিকারবাদী নরনারীর অন্তর্যন্ত্রণার নিপুণ আলেখ্য। এখানেই 'বিষবৃক্ষে'র বিষয়বস্তুর তাৎপর্য।

'হিন্দুদিগের বাহুবল' প্রতিপাদন বা মানুচি-কক্র-অর্ম-টড্ বর্ণিত ইতিহাস-প্রেক্ষিতে রাজসিংহ-ঔরঙ্গজেবের সংঘর্ষ 'রাজসিংহে'র প্রকৃত বিষয়বস্তু নয়। 'বৃহৎ যূথবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর গতিশীলতা', অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রামই 'রাজসিংহে'র উপজীব্য। উপন্যাসের পরিণামী সংবেদ-

নায় দেখি: 'অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সেই শ্রেষ্ঠ।' উপন্যাসপ্রসঙ্গে রবার্ট লিডেলের ধারণা—'The novel deals with the individual, it is the epic of the struggle of the individual against society.'—'রাজসিংহ' এবং আধুনিক উপন্যাস প্রসঙ্গে সমান সত্য। অবশ্য উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থান, পরিবেশ এবং প্রকরণ অনুযায়ী এই বিষয়ের উপস্থাপনা ভিন্ন হবে। 'গোরা'র বিষয়বস্তু সিপাহী বিদ্রোহ থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী বাঙালি মানসের স্বদেশসাধনার নানা স্তর, তাদের অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্ব, সংকীর্ণ দেশাভিমান, জাত্যভিমান থেকে মুক্তির যন্ত্রণা উনিশ শতক থেকেই আত্মিক ভারত আবিষ্কারের সূচনা। নতুন বুর্জোয়া সভ্যতার উন্নত উপকরণ আমাদের অনিবার্যভাবেই মুগ্ধ করেছে, অথচ সাম্রাজ্যবাদের পীড়নে আমরা পঙ্গু। একদা শক্তিমণ্ডিত ভিত্তির প্রয়োজনে প্রতিরোধ প্রয়াসে অতীত ইতিহাস পুরাণ শাস্ত্র সাহিত্য মন্থন করা হলো। 'দেশকে সৃষ্টি করার দ্বারাই দেশকে লাভ করার সাধনা আমাদের ধরিয়ে দিতে হবে'—এই তীব্র বেদনা দিয়েই গোরা চরিত্রের সৃষ্টি। উপন্যাসের শেষে সে যেখানে দাঁড়াল, সেখানে জাতি, ধর্ম, দেশের মোহ নেই, জাত্যভিমানের শৃঙ্খল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে তখন বিশ্ববোধ বা মানববোধে সুস্থিত। সুতরাং প্রকরণগত পার্থক্য সত্ত্বেও উপন্যাসের বিষয়বস্তু তার কাহিনী-চরিত্র-বর্ণনা-সংলাপ আশ্রয়ী বিশেষ বক্তব্য। বাচ্যার্থ অনুরণনে জাত ব্যঙ্গ্যার্থের মতোই উপন্যাসের আখ্যান ক্রমে তার অভিব্যঞ্জনা।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

ভাষারীতি: সাহিত্যের সকল শাখার মধ্যে উপন্যাসের শোষণশক্তি সর্বাধিক এবং সেই কারণেই উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষারীতি বহু বৈচিত্র্যে মণ্ডিত। কাব্য বা নাটকের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের কয়েকটি মৌল নিয়ম-নির্দেশ নির্দিষ্ট থাকে। ভাবগত বা ভঙ্গিগত কিছু কিছু বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেলেও কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দোবদ্ধ বাক্যরীতি এবং নাটকের ক্ষেত্রে সংলাপ-নির্ভর ভাষারীতির সাধারণ নিয়ম প্রায় অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু সেই তুলনায় উপন্যাসের আঙ্গিক অনেক বেশি মুক্ত। মূলত, বর্ণনা ও বিশ্লেষণধর্মী গদ্যরীতিই উপন্যাসের বাহন হলেও কতকগুলি অনিবার্য কারণে কাব্য বা নাটকের মতো গদ্যরীতির একটিমাত্র বিশিষ্ট রূপই উপন্যাসের অলঙ্ঘনীয় মাধ্যমরূপে নির্দিষ্ট

হতে পারেনি। উক্ত অনিবার্য কারণগুলির মধ্যে উপন্যাসের শোষণশক্তিই সর্বপ্রধান। উপন্যাসের পটভূমি অতি অল্পকালের মধ্যেই এত ব্যাপ্ত ও প্রসারিত হয়ে পড়েছে যে কাব্যের মন্ময়তা বা নাটকের দ্বন্দ্বসংঘাতমুখরতাকেও উপন্যাস আত্মসাৎ করে নিয়েছে। ফলস্বরূপ উপন্যাসের বিষয়বস্তু বা প্রকাশভঙ্গিতে বর্ণনা বা বিশ্লেষণধর্মিতার আদি-বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম ক'রে কোথাও কাব্যোচিত ভাবকেন্দ্রিকতা, কোথাও বা নাটকোচিত দ্বন্দ্বনির্ভর সংলাপরীতির ব্যাপক প্রসার দেখা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, উপন্যাসের ভাষারীতি বর্তমানে অন্তত একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার দ্বারা সুচিহ্নিত হওয়ার মতো নয়। উপন্যাসের গদ্যরীতিকে বেগবান প্রবাহের নিয়ত পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে তুলনা করাই সমীচীন।

পরিবর্তনশীলতা বা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও উপন্যাসের ভাষারীতি কিন্তু বল্‌গাহারা নয়। ছন্দোবদ্ধ বাক্যরীতির যেমন একটি নিজস্ব মাধুর্য আছে, উপন্যাসের সার্থক ভাষারও তেমনি একটি ছন্দোমাধুর্য আছে। প্রকৃতপক্ষে, উপন্যাসের প্রকাশভঙ্গি বা ভাষারীতির মধ্যে স্রষ্টা-শিল্পীর ব্যক্তিত্বই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ভাষা যে কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর ভারবহনকারী নিষ্প্রাণ যন্ত্রমাত্র নয়,—যে কোনো সার্থক-সৃষ্ট রসোত্তীর্ণ উপন্যাসের ভাষারীতি বিশ্লেষণ করলেই তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। শিল্পী-মানসের যে বিশিষ্ট 'মুড্' থেকে সেই উপন্যাসের জন্ম, সেই বিশিষ্ট মুডের সঙ্গে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর যেমন নিবিড় সম্বন্ধ, তার প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে সম্বন্ধের নিবিড়তা ততখানি। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বর্ণনার ভাষা বিষয়বস্তুর 'অনুগত' নয়, 'সহগামী'। বর্ণনা, বিশ্লেষণ, বাক্যপ্রয়োগ, শব্দ-নির্বাচন, চিত্রকল্প-রচনা—সকল কিছুই সেক্ষেত্রে শিল্পী-মানসের সেই বিশেষ মুডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বর্ণনীয় বিষয়ের রসসার্থকতা সম্পাদন করে। তার ফলে প্রত্যেকটি সার্থক-সৃষ্ট উপন্যাসের ক্ষেত্রেই ভাষারীতির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য দেখা যেতে পারে।

বর্ণনীয় বিষয়ে ভাব-সত্য বা বস্তু-সত্যকে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত করা এবং ফলশ্রুতিরূপে রস-সংবেদন সম্পূর্ণ করাই ভাষার লক্ষ্য। সেদিক থেকে লক্ষ্য-ভেদের অব্যর্থতা যেমন ভাষার ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়, তেমনি তার শিল্প-সুষমাও প্রয়োজনীয়। এই উভয় গুণের সুষম-পরিমিতি ভিন্ন উপন্যাসের সামগ্রিক সার্থকতা সম্ভব নয়। কাহিনী-প্রধান, কল্পনা-প্রধান বা চেতন-অবচেতন মনস্তত্ত্ব প্রধান—যে কোনো ধরনের উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ-কথা প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের

'গোরা' উপন্যাসের ভাষা এবং 'শেষের কবিতা'র ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। 'শেষের কবিতা'র ভাষাকে কবির একটি 'সচেতন নিরীক্ষা-মূলক' ভাষার নিদর্শন রূপে স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা যায় যে উক্ত উপন্যাসের পটভূমি, বিষয়বস্তু এবং বিশিষ্ট ধরনের চরিত্রসৃষ্টির পক্ষে ওই ভাষাই যেন সবচেয়ে উপযোগী হয়েছে। পক্ষান্তরে, ব্যাপ্ত বিশাল ভাবধর্মী পটভূমিতে রচিত 'গোরা' উপন্যাসের ভাষার যে গাম্ভীর্য তা বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ সহগামী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রধানত অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি-রোমান্সের কল্পনাপ্রবণ রীতির বিশেষ প্রভাব পড়েছিল বলে তাঁর ভাষারীতিতে আড়ম্বরময়তা সুস্পষ্ট। অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের সেই রোমান্স-সম্ভব আড়ম্বরবহুল ভাষারীতির সঙ্গে সূক্ষ্ম কাব্যিকব্যঞ্জনা যুক্ত হয়ে তাঁর ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে সত্য, কিন্তু প্রসঙ্গত এ-কথাও অনস্বীকার্য যে বাঙলা-উপন্যাসের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতি মুখ্যত রাজকীয় সমারোহের অনুরাগী। বাক্যবিন্যাসে, শব্দযোজনায় কিংবা চিত্র-নির্মাণে একদিকে সে-ভাষা যেমন সমারোহ-প্রবণ অন্যদিকে তেমনি কাব্যের ভাষার মতো অন্ত্যানুপ্রাসের প্রতিও আগ্রহশীল। দৈনন্দিন জীবন-বাস্তবতার বর্ণনা বা বিশ্লেষণে বঙ্কিমী-ভাষারীতি সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি; অপরপক্ষে কবিচিত্তের প্রসারিত কল্পনা যেখানে পাঠকচিত্তকে এক অনির্বচনীয় রসসুধার জগতে নিয়ে যেতে সক্ষম সেখানে বঙ্কিমী-ভাষারীতি অননুকরণীয়। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে সাগরসৈকতে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনা থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত ক'রে সেই অননুকরণীয় রীতির একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

"অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুইজন চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

"...পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল, যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।"

ইংরেজি সাহিত্যশাস্ত্রে 'Style is the man' বলে যে সুপরিচিত প্রবচনটি আছে, উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষারীতির সঙ্গে উপন্যাস-রচয়িতার শিল্পী-আত্মার একাত্মতার প্রসঙ্গে সেই প্রবচনটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্যের যে-কোনো শাখার আঙ্গিককে আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা রাখলেও মূলত মানব-জীবনে বাস্তবতাকে আশ্রয় ক'রেই উপন্যাস-সাহিত্যের বিবৃদ্ধি। জীবনকে বা জীবন-নিহিত সত্যকে অনুভব এবং শিল্পরূপের মাধ্যমে প্রকাশ করবার শক্তির তারতম্যের দ্বারাই ঔপন্যাসিকের শক্তিমত্তা এবং গুণাগুণের বিচার হয়ে থাকে। জীবন-দর্শনের বিশিষ্টতাই সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়, প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতাই মূলত ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করে। স্রষ্টা-শিল্পীর মনোজগতে আবেগাতিরেক থাকলে তাঁর ভাষায় তার প্রতিফলন পড়তে বাধ্য। সেক্ষেত্রে ভাষায় উচ্ছ্বাস এবং বিশেষণবাহুল্য স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে আটপৌরে ভাষাকে সার্থক সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন কিন্তু তাঁর মনোধর্মে স্পর্শকাতরতা এবং আবেগাতিশয্যের ফলে অনেকক্ষেত্রে ভাষারীতিতে সেই ত্রুটি দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ লেখক আবেগ-প্রকাশের ভাষাকে যথোপযুক্ত প্রস্তুত না ক'রে নিয়েই সোজাসুজি আবেগের অনুভূতিকে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত ক'রে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। সেসব ক্ষেত্রে ভাষা নিতান্ত ভারবাহী বাহন হয়েই রয়ে গেছে, তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণনার ভাষা বিষয়বস্তুর সঙ্গে এত একাত্ম যে বর্ণিত বিষয়ও একটি বিশিষ্ট চরিত্রধর্ম নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'শ্রীকান্ত' কাহিনীর দ্বিতীয় পর্বে সমুদ্রে ঝড়ের বর্ণনা এই জাতীয় প্রাণবন্ত ভাষারীতির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রীতিও মূলত কাব্যধর্মী। কেবল উপন্যাস বা ছোটগল্প নয়, প্রবন্ধের ভাষাতেও রবীন্দ্র-রীতিতে কাব্য-লক্ষণ সুস্পষ্ট। উপমা এবং চিত্রকল্প-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রীতি বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির ভাষা-রীতি বিশ্লেষণ করলে সর্বপ্রথমেই লক্ষ্য করা যায় প্রত্যেক উপন্যাসের ক্ষেত্রেই রীতি-স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। 'গোরা'র ভাষা স্পষ্ট, বলিষ্ঠ এবং কাহিনীর ভাব বা বিষয়বস্তুর বিস্তৃত পটভূমির সঙ্গে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে এগিয়েছে, কিন্তু কোথাও ছেদ নেই। উপমা-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ রস-বোধ

এই উপন্যাসে মূলত প্রধান চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের ক্ষেত্রেই বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে। তা সত্ত্বেও 'গোরা'র ভাষা তার স্পষ্টতা এবং সাবলীলতা নিয়েই উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পেরেছে। 'গোরা'র তুলনায় 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের ভাষা বেশ কিছু পরিমাণে দ্রুতগতি-সম্পন্ন। নিখিলেশ-সন্দীপ-বিমলার দ্বন্দ্ব তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবকেন্দ্রিক বিরোধ ও তার আবর্তে পড়ে বিচলিত বিভ্রান্ত ভারতাত্মার দোলাচলচিত্ততার পটভূমিতে স্থাপিত এই গূঢ়-সাংকেতিক কাহিনীতে লেখক ভাষাকে একদিকে যেমন শাণিত ক'রে নিয়েছেন অন্যদিকে তেমনি এর গতিশক্তিকেও দ্রুত করেছেন। এরই পাশাপাশি 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের সাধুরীতির ভাষা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'আত্যন্তিক কর্মবাদ,' 'আত্যন্তিক রসবাদ' এবং 'সুসমঞ্জস জীবনবাদের' ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপটি দেখাতে গিয়ে বিষয়োপযোগী যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি লেখকের অভিপ্রেত ছিল তা যেন এই ভাষারীতির মধ্যে সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠেছে। 'শেষের কবিতা'র ভাষারীতি এখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে একক এবং অনন্য।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে সর্বব্যাপী জীবনবোধের প্রেরণায় রচিত সার্থক উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশি নয়। যে-নিবিড় এবং গভীর জীবনবোধ ঔপন্যাসিককে জীবন-নিঃসৃত নির্যাসের আস্বাদ দেয়, সেই জীবনবোধ একালের ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে খুব স্বল্পসংখ্যকের রচনায় লক্ষ্য করা গেছে। তথাকথিত 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র লেখক বলে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের অধিকাংশই চমক-সৃষ্টির দ্বারা অভিনবত্ব প্রদর্শনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই ভাষায় সেই চমক-সৃষ্টির প্রয়াস অত্যন্ত প্রকট ছিল বলে উত্তরকালে সেই ভাষারীতির ভিত্তিতে নূতনতর কোনো বলিষ্ঠ ভাষারীতির সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। তবুও 'কল্লোল'-পর্বে যুবনাশ্বের 'পটলডাঙার পাঁচালী'র ভাষারীতি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। যুবনাশ্বের রচনায় ভাষাকে বিষয়বস্তুর উপযোগী ক'রে তৈরি ক'রে নেবার দক্ষতা লক্ষণীয়। বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' উপন্যাসে কাব্য-ব্যঞ্জনাশ্রিত যে ভাষারীতি দেখা যায় তা ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ হলেও সর্বংসহা ভাষারীতি নয়। 'কল্লোল'-পর্ব এবং উত্তর-'কল্লোল' পর্বের কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের রচনায় উপন্যাসের ভাষাকে অতি-সচেতনভাবে সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য ক'রে তোলার যে প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তাকে এক অর্থে ভাষা-

রীতির দৈন্য বলেই অভিহিত করা যেতে পারে কারণ জীবনের সমগ্র স্তরে বিচরণ করবার যোগ্যতা এ ভাষার নেই। 'কল্লোল'-পর্বের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষা-রীতির একটি বৈশিষ্ট্য আছে বটে কিন্তু সেই একই রীতি তিনি এযাবৎকাল উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, জীবনীগ্রন্থ—সবত্রই ব্যবহার করে এসেছেন। সুতরাং তাকে উপন্যাসের বিশিষ্ট ভাষারীতি রূপে গ্রহণ করা যায় না। বরং 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর বাইরে কয়েকজন ঔপন্যাসিকের রচনায় ভাষারীতির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্করের ভাষার গঠন দুর্বল কিন্তু যে প্রাণধর্ম ভাষাকে সজীব করে, তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলিতে সেই প্রাণধর্ম বিদ্যমান। রাঢ়ের রুক্ষ পটভূমিতে তারাশঙ্করের উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলিতে ভাষারীতির সেই প্রাণধর্মিতা লক্ষণীয়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসের সরল অথচ মর্মস্পর্শী ভাষারীতি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই রোমান্টিক উপন্যাসখানিকে এক অসাধারণ মাধুর্য দান করেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' বা 'আরণ্যক' কেবলমাত্র বাংলাসাহিত্যের সম্পদ-ই নয়, অনাড়ম্বর এবং অব্যর্থ ভাষারীতির নিদর্শনরূপেও অনন্য। শিল্পী-মানসের সঙ্গে বর্ণনীয় বিষয়বস্তুর লক্ষ্যভেদী নিবিড় একাত্মতায় বর্ণনার ভাষা অনলংকৃত হয়েও প্রাণধর্মের গুণে সজীব ও রূপময় হয়ে ওঠে—তার নিদর্শন আছে বিভূতিভূষণের এই সকল উপন্যাসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য তার তির্যক প্রকাশ-ভঙ্গিতে। বাস্তবজীবন-নিঃসৃত বেদনার জ্বালা লেখকের শিল্পী-মানসকে যে যন্ত্রণাবোধে কাতর করেছে সেই বেদনার অভিব্যক্তি আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তির্যক ভাষারীতিতে।

বর্তমান কালে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ভাষারীতির যে বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান সেগুলিকে মোটামুটি এই কয়শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে,—[ক] পূর্বাপর প্রচলিত সনাম রীতি। এই রীতিতে বাক্যের গঠন, শব্দযোজনা, অলংকার-প্রয়োগ ইত্যাদি প্রচলিত ঐতিহ্যের অনুসারী। [খ] সংলাপ-প্রধান নাটকীয় রীতি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে এই রীতির অল্পবিস্তর প্রয়োগ আংশিকভাবে দেখা দিয়েছিল। [গ] চমক-প্রধান রীতি। বাক্য-বিন্যাসে

অতি-সংক্ষিপ্ততা, সচেতনভাবে শব্দনির্বাচন, অপরিচিত শব্দ-প্রয়োগের প্রবণতা ইত্যাদি এই রীতির বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রধান। [ঘ] বুদ্ধি-প্রধান রীতি। মুখ্যত সচেতনভাবে বুদ্ধিনির্ভরতার প্রতি এই রীতির প্রবণতা লক্ষণীয়। বিষয়বস্তুর চেয়েও ভাষার সর্বাত্মক অলংকরণের প্রবণতায় এই রীতি উপন্যাসের ভাষারূপে কতখানি সার্থক তা বলা কঠিন।

অনিলকুমার সেনগুপ্ত

মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস: এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছিলেন, 'ঔপন্যাসিক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন', যদিও তাঁর উপন্যাসে 'ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ'ই সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছিল। বস্তুত উপন্যাসমাত্রেই যেহেতু মানুষের মন, তার সংশয়, অস্থিরতা, হতাশা, তার আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে, দেখাতে চায় কেমন ক'রে প্রবৃত্তি, সংস্কার ও ইচ্ছার সংঘাতে জীবনে জটিলতা দেখা দেয়, তাই একদিক থেকে যে-কোনো রচনাতেই মানুষের মনের কথা থেকে যাবে যতই কেননা ঘটনাপরম্পরার বিবরণ তাতে প্রাধান্য পাক। 'কপালকুণ্ডলা'য় যেখানে নবকুমার ও মতিবিবির দেখা হচ্ছে ও সম্ভাষণ হচ্ছে, অথবা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ যেখানে রোহিণীর ঘড়া ছলাৎ ক'রে উঠলো সে-সব ক্ষেত্রে দু-একটি আপাত অপ্রাসঙ্গিক তথ্য বা ঘটনার উল্লেখ আসলে মানসিক অবস্থারই পরিচয় দিতে চাচ্ছে। কিন্তু এরকম ইঙ্গিতগত দৃশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে খুবই কম, আসলে হয়তো তাঁর লক্ষ্য ছিল ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিচরিত্রের নিহিত প্রবণতাগুলির উদ্ঘাটন—সেইজন্য সরাসরি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারো মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা দেখাবার জন্য 'সু' আর 'কু'-র অবতারণা করেছেন তিনি।

সম্ভবত এই দিকটা লক্ষ্য রেখেই 'চোখের বালি' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত, এখনও হয়; তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই···নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানাঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানববিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার ['চোখের বালি'র] পূর্বে গল্প অবলম্বন ক'রে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি।'

বাংলা উপন্যাসের দিক থেকে ভেবে দেখলে রবীন্দ্রনাথের এই দাবি নিশ্চয়ই মান্য না-ক'রে উপায় নেই। যাকে বলা যায় 'মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস', 'চোখের বালি' তারই একটা বড়ো নজির। কিন্তু এখানে বোধহয় কতকগুলি তথ্যের দিকে চোখ ফেরানো উচিত, যে-তথ্যগুলো আমাদের বুঝিয়ে দেবে তথাকথিত মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের সূচনা কেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় হলো—কেন তার আগে ঠিক এইভাবে কোনো উপন্যাসকে চিহ্নিত করা যায়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে—ও বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে—ইয়োরোপে কতকগুলি বড় ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল, অন্তত উপন্যাসের ক্ষেত্রে যাদের প্রভাবকে দূরস্পর্শী ও বিকীর্যমান হয়ে উঠতে দেখা গেছে। জিগমুণ্ড ফ্রয়েড, কার্ল মার্ক্স, আলবের্ট আইনস্টাইন ও মাক্স প্লাঙ্ক—অন্তত এই ক-জন ব্যক্তিত্ব আমাদের কতকগুলি বদ্ধমূল সংস্কারকে ভেঙে দিয়ে গিয়েছিলেন। মানুষের মনের রিরংসাচালিত তিনটি স্তর, সামাজিক জীবনে শ্রেণীসংঘাত ও তৎপ্রসূত গতিময় সংশ্লেষণাবেগ, পদার্থজগতে বহুবিধ ঘন বা আয়তনের অস্তিত্বস্বীকার ও বিদীর্ণ অণুর প্রচণ্ড ক্ষমতা—এইসব চিন্তা ও আবিষ্কার জগতের দিকে তাকাবার ভঙ্গিটাই বদলে দিয়ে গিয়েছিল। এমন নয় যে ঔপন্যাসিকেরা এইসব ব্যাপারের প্রত্যক্ষ সংস্রবে এসেছিলেন বা এসব নিয়ে সবাই বিস্তর পড়াশোনা করেছিলেন—কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় কতকগুলি বৈপ্লবিক চিন্তা একেক সময়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই এসব চিন্তা, বাতাসের মধ্যে বীজাণুর মতো, ঘুরে বেড়াতো। এবং তার ফলেই, রচনাকালে, কোনো-না-কোনো ভাবে এদের প্রভাব বা অভিঘাতকে এড়ানো সম্ভব হয়নি।

আসলে আধুনিক সাহিত্যে 'মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস' কথাটি অচল হয়ে এসেছে, কেননা এর দ্বারা আমরা যে কথা বোঝাতে চাই, তা হয়তো অন্য কতগুলো অভিধাতেই আরো ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়। 'চেতনা-প্রবাহমূলক উপন্যাস'—এই নামটা হয়তো উদ্দেশ্যকে আরো স্পষ্ট ফোটায়। কারণ যদি 'মনের সংসারের কারখানাঘরে' নেমে আমরা 'আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি'র ফলে কীভাবে 'দৃঢ় ধাতুর মূর্তি' জেগে ওঠে দেখতে চাই তাহলে মানবচেতনার বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকাটা বিশেষ জরুরি হয়ে পড়ে। সাবেককালের উপন্যাসে পাঠক আর উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে

একটি বনেদি বিরোধ ছিল—সেখানে ঔপন্যাসিক থাকতেন এই দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ ঘটাবার জন্য। চরিত্রদের মনের খবর সেসব ক্ষেত্রে জানতেন কেবল ঔপন্যাসিক—তিনি যতটুকু পাঠককে বলে দিতেন বা ইঙ্গিতে বোঝাতেন, সেটুকুই ছিল পাঠকের সম্বল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ঔপন্যাসিক আমাদের একেবারে চরিত্রের মনের মধ্যে এনে হাজির ক'রে দিলেন। আসলে কবে থেকে যে এর সূচনা হলো বলা মুশকিল। সাহিত্যে কোনো কিছুই হঠাৎ একদিন দুম ক'রে গজায় না। হয়তো রিচার্ডসন, স্মলেট বা ডিকেন্স কোথাও-কোথাও এর ধারকাছ দিয়ে গিয়েছেন। লরেন্স স্টার্নের 'ট্রিস্ট্রাম স্যাণ্ডি' একদিক থেকে হয়তো এরই প্রথম নিদর্শন। কিন্তু তবু আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা কখনো-কখনো কোনো তারিখ বা কোনো খুঁটিকে মেনে নিই। তেমনি একটি তারিখ ও স্তম্ভ এক্ষেত্রে হলো ১৮৮৭, যখন *La Revue Indépeodante* কাগজে এদুয়ার্দ দুজাঁর্দার *Les lauriers sont coupés* উপন্যাসটি ধারাবাহিক-ভাবে বেরুতে শুরু করে। এই উপন্যাসটি যদি কেউ 'কাহিনী'র জন্য পড়তে যান তো বিপুলভাবে ঠকে যাবেন। কেননা 'কাহিনী' যেটা আছে সেটা অতি সরল, বয়ঃসন্ধিভারাতুর ও কৌতুকপ্রদ : প্যারীর একটি সদ্যোযুবা একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে শুতে চায়; অভিনেত্রীটি তাকে শত হস্ত তফাতে রাখে বটে, কিন্তু তার কাছ থেকে উপহার বা টাকাকড়ি নিতে একটুও দ্বিধা বা দেরি করে না। উপন্যাসে কেবল একটি সন্ধ্যাবেলার বিবরণ দেওয়া হয়েছে; সেদিন সন্ধ্যায়, অন্যান্য দিনের মতোই, যুবকটি ভেবেছিল অবশেষে বুঝি 'মাদ্‌মোয়াজেল' তারই হবে—কিন্তু বলাই বাহুল্য, এই আশা করাটাই তার ভুল হয়েছিল। সোজাসুজি বলে দিলে এর চেয়ে পাংশুল, তুচ্ছ ও হাস্যকর হয়তো আর-কিছুই হতে পারতো না—তবু এই বইটি সজীব, কল্পনাকুশল ও তপ্ত চিত্রলতায় ভরা। কেননা 'এর প্রথম পঙ্‌ক্তি থেকেই' পাঠক 'গ্রন্থের নায়কের মনে আটকে থাকেন'—এবং একেবারে শেষ পংক্তি পর্যন্ত নায়কের মনের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে হয় পাঠককে।

'Monologue intérieur' বা অন্তরীণ সংলাপের সূত্রপাত ঘটেছিল এই বইতেই। স্থানে-কালে নির্ভরশীল যে-বস্তুময়তা, দুজাঁর্দার এই উপন্যাসে তার আঙ্গিক বদলে গেল; কেননা বইটির মধ্যে যা-যা ঘটেছিল, তা প্রায় সবই ঘটেছিল একটি মোহমান, আবিষ্ট ও শৌখিন ফরাশি যুবকের চেতনায়—আর

গ্রন্থের ভিতর স্থান বলতে এমনিতে আছে কেবল কতকগুলি বুলভার। উপন্যাসটি আগাগোড়াই অন্তর্ময়, কখনও নায়কের মনের বাইরে যাননি দুজার্দাঁ, গোটা ব্যাপারটা ঘটেছে কেবল একটিমাত্র সন্ধ্যায়—কয়েক ঘণ্টায়, এবং ঘটেছে কেবল চিন্তারই ভিতর—কোনো ক্রিয়াকলাপে নয়। ১৯০২ সালে একবার প্যারী থেকে ডাবলিন যেতে-যেতে রাস্তায় এই বিস্তৃত গল্পটি পড়েছিলেন জেমস জয়েস; আর তারও এক যুগ পরে বেরিয়েছিল তাঁর 'ইউলিসিস'—জয়েসের বৃহদায়তন ডাবলিন-ওডিসি।

এই 'monologue intérieur' ব্যাপারটি কী? সের্গেই আইজেনস্টাইন বলেছেন যে অন্তরীণ সংলাপ হলো 'নায়কের পুনরভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করার সময় বিষয় ও বিষয়ীর পার্থক্য লোপ ক'রে কেলাসিত চেহারা দেবার সাহিত্যিক পদ্ধতি'—অর্থাৎ রোমান্টিকতার যা একটি মূল সূত্র: 'বিষয় থেকে সরে গিয়ে বিষয়ীর মনে ঘোরাফেরা ক'রে আবার বিষয়ের কাছে ফিরে-আসা রোমান্টিকদের রচনার বৈশিষ্ট্য। বিশেষত এর্নস্ট্ টিয়োডর আমাডিয়ুস হোফ্মান, নোফালিস, জেরার দ্য নেরভাল প্রভৃতির কথা এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়।' আইজেন-স্টাইনের এই কথাগুলো আরও স্পষ্ট হবে যদি আমরা উইলিয়ম জেম্স-এর 'মনস্তত্ত্বের সূত্রাবলী' (১৮৯০) পড়বার চেষ্টা করি:

'মনের ভিতর যে-স্বাধীন জলস্রোত বহমান, প্রতিটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রতিমা বা চিত্রকল্প যে শুধু কেবল তার ভিতর ডুবেই থাকে তা নয়, তার দ্বারা রঞ্জিত ও অনুরঞ্জিত হয়। প্রতিটি প্রতিমা তার তাৎপর্য, গুরুত্ব ও মূল্য লাভ করে সেই উজ্জ্বল-বর্তুলতা বা উপচ্ছায়া বা ছায়ালোকের কাছ থেকে, যা তাকে ঘিরে থাকে।' আরো: 'চেতনা বা ভাবনা কখনো ছেঁড়া-ছেঁড়া বা টুকরো-টুকরো ভাবে আত্মপ্রকাশ করে না।...কতকগুলি টুকরোকে জোড়া লাগিয়ে বানানো হয়েছে, চেতনা মোটেই সে-রকম নয়। সে স্রোতের মতো, নিয়তই বহমান।...তাকে বরং বলতে পারি ভাবনার স্রোত, চেতনার প্রবাহ, অন্তর্জীবনের অবিচ্ছেদ গতি।' 'চেতনাপ্রবাহ' কথাটা কোথা থেকে এসেছে, তা সহজেই বোঝা যায়। ভার্জিনিয়া উলফ একবার আধুনিক উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় উইলিয়ম জেমস থেকে মস্ত উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে মে সিনক্লেয়ারও ডরোথি রিচার্ডসনের 'তীর্থযাত্রা' উপন্যাসের আলোচনায় 'চেতনাপ্রবাহ' কথাটির পুনর্ব্যবহার করেছিলেন। উইলিয়ম জেম্স্

যে-কথা বলেছেন, তার একটি আক্ষরিক সাহিত্যিক তর্জমা 'ইউলিসিস' থেকে তুলে দেয়া যাক ; একটি অন্ত্যেষ্টিতে যাচ্ছে লিয়োপোল্ড ব্লুম, চুপচাপ বসে আছে চারচাকার গাড়িতে :

"তারা বার্কলে স্ট্রীটে মোচড় নিতেই নদীর ধারের রাস্তার একটা বাড়ি থেকে হুড়মুড় ক'রে তাদের উপর এসে পড়লো বড়ো-বড়ো ঘরের ঝনঝনে ঝমঝমে কোলাহল ও গান। কেলিকে দেখেছো কি কেউ, কোনো দিনও ? ক-য়ে এ-কার, ল-য়ে হ্রস্ব ই-কার। মৃতেরা কুচকাওয়াজ ক'রে এল 'সল' থেকে। বদ এই লোকটা, ঠিক যেন বুড়ো আন্তনিয়ো। ছেড়ে চলে গেল আমায় ; নিজেই নিয়ো নিজেকে—এই তার মোদ্দা বুলি। নাচতে-নাচতে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ঘুরপাক! 'দুর্দশার সূত্রে বদ্ধ মাতৃমূর্তি।' ধর্মের পথ। আমার বাসাটাও ওখানে। মস্ত জায়গা, বিরাট। দুরারোগ্যদের জন্য বিশেষ-একটা ধন্বন্তরীবিভাগ আছে আবার ওখানে। খুবই উৎসাহজনক। মেরিমাতার সরাইখানা : মুমূর্ষুদের জন্য চমৎকার সুব্যবস্থা! হাতের কাছেই কবরখানা—খুব কাছেই, তলার দিকে। বুড়ি রিয়োর্ডান ওখানেই অক্কা পেয়েছিল। এই ধুমশো মেয়েগুলোকে কি ভীষণ দেখায়! যে-পেয়ালাটায় পথ্য খেত, চামচে দিয়ে কিনা তার ঠোঁট ঘষতো বারবার। তারপরে তার রোগশয্যার চারদিকে পর্দা টাঙিয়ে দিলে। কেন ? না, এখন সে মরবে। বেশ ভালো ছিল ছাত্রটি, ভিমরুলের কামড় খাবার পর সে-ই আমার পট্টি বেঁধে দিয়েছিল, থুরথুরেরা যে হাসপাতালে গিয়ে মরবে বলে শোয়, এখন নাকি সে সেখানে আছে। এক চূড়া থেকে আরেক চূড়ায়—মধ্যটা বেবাক ফাঁক!"

বলাই বাহুল্য, এখানে আমরা একেবারে ব্লুমের মনের মধ্যে এসে পড়েছি। যেন একটি ঢাকা খুলে দেয়া হলো—দেখলাম মনের মধ্যে কত পোকা কিলবিল করে! যাকে এককালে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস বলা হতো, এটাই তার পরিণতি। মার্সেল প্রুস্ত-এর 'অতীত স্মৃতি', হেনরি জেম্স-এর উপন্যাসপর্যায়, উইলিয়ম ফকনর-এর ইয়োকনোকটোপাওয়ার কাহিনীগুলি, ভার্জিনিয়া উলফ-এর 'ঢেউ', 'আলোকস্তম্ভের উদ্দেশে' প্রভৃতি, হেরমান ব্রোখ-এর 'ভার্জিলের মৃত্যু', টোমাস মান-এর উপন্যাসগুলি- এইসব তা-ই নানা দিক থেকে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্মরণীয়। আসলে এই ধরনের রচনা পরিণামে প্রতীকী বা সাংকেতিক হয়ে পড়তে বাধ্য : কেননা শেষ পর্যন্ত পরাবাস্তবতা, চেতনাপ্রবাহ

ইত্যাদির সাহায্যে যেটা লেখকরা ধরতে চাইছেন সেটা হলো মানুষের অভিজ্ঞতার সব স্পষ্ট-অস্পষ্ট কোণ, ছায়াসীমান্ত ও অন্ধকার। আর সেইজন্যে স্তেফান মালার্মের বিরংসা-তাড়িত 'ফনের দিবাস্বপ্ন'কেও এ-প্রসঙ্গে স্মরণ না ক'রে উপায় নেই, যেখানে 'প্রত্যক্ষ উরু ও পৃষ্ঠ ধ্বনিসর্বস্ব কবিতার একতাল ওংকারে পরিণত'; 'নন্দনতত্ত্বের আর কোনও ব্যাখ্যায় আস্থা রাখলে, শোষিত আঙুরের নির্মোকে ফুৎকার ভ'রে, সারা দিন সে-ভাস্বর গুচ্ছের দিকে তাকিয়ে, তৃষ্ণানিবারণ তার (ফনের) সাধ্যে কুলত না।' আধুনিক উপন্যাসে নিশ্চয়ই এই কারণেই কবিতার সংক্রাম ঘটেছে, উপন্যাসও হ'য়ে উঠেছে কবিতার সহযোগী ও সহযাত্রী।

'চোখের বালি' সত্ত্বেও সেই জন্যেই বাংলা ভাষায় চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের প্রথম চেষ্টা আসলে বুদ্ধদেব বসু প্রণীত 'লাল মেঘ'; পরে নানা ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু অন্তর্ময় উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছিলেন: 'কালো হাওয়া'য় হৈমন্তীর মনোবিপর্যয়, 'তিথিডোর'-এর বিখ্যাত শেষদৃশ্য, 'নির্জন স্বাক্ষর' এর সোমেন, 'অন্য কোনখানে' উপন্যাসে তন্ময়ের রেলযাত্রা, 'পাতাল থেকে আলাপ' প্রভৃতি উপন্যাস ও উপন্যাসের অংশ সেইজন্যই এই দিক থেকে স্মরণীয়। অবশ্য এই ধরনের উপন্যাস সবচেয়ে মগ্নভাবে প্রথম লেখার চেষ্টা করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; তাঁর 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহানা' নামক তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি কোনো-কোনো দিক থেকে প্রুস্ত-এরও স্মারক—বিশেষ ক'রে সময় নামক আয়তনের নিপুণ ব্যবহারে—আর চেতনাপ্রবাহের সঙ্গে তার যোগাযোগ খণ্ড তিনটির নামেই উদ্ভাসিত। যাকে বলি জীবনখণ্ড, 'Slices of life', বিশ্বধর্মী উপন্যাস, যার মধ্যে রয়েছে স্বাভাবিকতার পরাকাষ্ঠা, আসলে চেতনা-প্রবাহমূলক উপন্যাস তারই প্রতিক্রিয়া প্রসূত। এমিল জোলাদের রচনাবলীর বিরুদ্ধেই ছিল এই ধরনের উপন্যাসের বিদ্রোহ।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকাব্যোপম উপন্যাস : সচেতন ভূমিকাবিঘোষণে মহাকাব্যোপম উপন্যাস আলোচ্যদের মধ্যে দুজন কথাশিল্পীই রচনা করেছেন। প্রাচীন হেনরি ফিল্ডিং ও নবীন অন্নদাশঙ্কর রায়। উপন্যাসের সূচনাকালে 'জোসেফ অ্যাণ্ড্রুজ' 'টম জোন্‌স,' 'জোনাথান ওয়াইল্ডে'র স্রষ্টা 'মক্‌ এপিক' লিখেছিলেন, আর সাম্প্রতিক-পরিণতিযুগে 'সত্যাসত্যে'র রচয়িতা লিখেছেন 'এপিক তথা রূপক'।

মাঝখানে রাজনীতি-অর্থনীতি দর্শন-বিজ্ঞানে দুশো বছরের বিচিত্র চলচ্চিত্র, বহুলভঙ্গিম ব্যক্তিসংগ্রামের আর্তপ্রমত্ত ব্যাপ্ত ইতিহাস। বস্তুত ব্যাসকূটময় এক জটিল ও অভিনব 'কুরুক্ষেত্র'-ইতিবৃত্ত, 'বীর নই যুদ্ধে যুদ্ধে' সত্ত্বেও, এ-উপলক্ষে অন্বিষ্ট। উপস্থিত মাত্র কতিপয় দৃষ্টান্তে মহাকাব্যোপম উপন্যাসের চরিত্রসমীক্ষায় দ্রষ্টব্য যে, মুখ্যত এ-দুই আত্যন্ত লক্ষণে এজাতীয় উপন্যাসের অখণ্ড-জৈব অস্তিত্ব চিহ্নিত। বিপ্লব-বিজল্পিত পরিহাস বা আর্তিসংক্রাম 'মকারি'র দিকে : পর্বে পর্বে দ্বন্দ্বময় জীবনের সম্ভোগ ও দুর্ভোগজনিত 'কমিক স্যাটায়ার', 'ট্র্যাজিক আয়রনি', 'হিউমার' ইত্যাদি মানব-'নবরস' সংবেদন, মৃত্তিকাচারী মৌল মানুষের প্রাণ-স্পন্দনে স্বকাল-পরকাল সংক্রান্তি। 'They were able to mock and to flay the vices of the old world but they by no means uncritically accepted the new'। সান্ত ও অনন্ত-আকাশী 'রূপক'ত্বের দিকে : 'রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।' অথবা 'অতি প্রাচীন এই অরণ্যানী, এই ফুল যাকে বসন্তের বাতাস জাগিয়ে তোলে, কেউ বলতে পারে না কত দীর্ঘ শতাব্দীর উদ্দাম প্রাণবন্যা বয়ে এনেছে আজকের এই গোলাপ।' অথবা 'to create by his (novelists') imaginative effort, the typical man, the hero of our times'—প্রাচীন ও অকৃত্রিম মহাকাব্য-নায়কের তুলনায় যতই তারা 'unheroic' হোক, যেহেতু আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিশৃঙ্খল ও বিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার চাপে, প্রতিকূল সমাজ-সামঞ্জস্যে 'unheroic' হওয়ার বাধ্যতা-মূল্যেই তাদের বীরত্ব-নায়কত্ব সংশ্লিষ্ট। অতএব অবশ্যম্ভাবী সেই 'Philosophical attitude to life' যা নইলে সুগোচর-সুলভ অজস্র বস্তুপুঞ্জ ও সাধারণের শত সামান্যীকরণ অসম্ভব।

হোমারের 'বীর'-যুগ পর্যবসানে 'সম্ভ্রমযুগ' ও সামন্ততন্ত্রের ক্রান্তিকালীন কথাকার বোকাসিয়োর, বিদ্রূপকার র‍্যাবলে ও পরিহাসজল্পনার কথাকোবিদ সারভেনতিস। এঁদের, সবিশেষ সারভেনতিসকে, অগ্রগণ্য পশ্চাৎভূমি ক'রে মক-এপিক লেখক ফিল্ডিং-এর আবির্ভাব। অষ্টাদশ শতাব্দীর লণ্ডন থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর স্পেন অনেক দূর। কারণ প্রথমোক্ত স্থানকালের নাগরিক-লেখক ছিলেন একাধারে 'রাজনীতিক, সাংবাদিক ও কর্মযোগী';

'যখন তাঁর দারিদ্র্যদুর্গতির অন্ত হলো, প্রভাবপ্রতিপত্তির বিস্তারে হলেন ম্যাজিস্ট্রেট, সংবিধান-লঙ্ঘনের অনেক দুর্নীতিকে তিনি আক্রমণ করলেন, বিচারযন্ত্রের অকর্মণ্যতাকেও ক্ষমা করলেন না।' আর দ্বিতীয়োক্ত স্থানকালের নাগরিক-শিল্পী ছিলেন প্রথমদিকে 'স্প্যানিশ আর্মাডা'র স্বার্থে দেশে-দেশে ভ্রাম্যমাণ শুল্ক-সংগ্রাহক, পরে উক্ত নৌবাহিনীর পরাজয়ে জাতীয় দুর্দিনে হলেন জেলের কয়েদি। অথচ "আক্ষরিক অর্থে অপরাধী আখ্যা তাঁকে আমরা কখনোই দিতে পারি না। ভিতরে ছিল সেই সূক্ষ্ম অহমিকা, সুকুমার শালীনতাবোধ ও সর্বব্যাপী উদার মানবতা—বহু কারাগারের অন্তরের ইতিহাস তিনি তাই উপলব্ধি করেছিলেন। তথাকথিত কারাগার তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি, কিন্তু আর একধরনের বন্দীজীবনে তাঁকে প্রবেশ করতে হয়—দারিদ্র্য, হতাশা আর বিত্তবান মদান্ধ মানুষের কাছে নিষ্ফল আবেদনে, শত অসত্য ও জঘন্যতার বিপরিণামে তাঁর এই 'নবজীবনে'র সূচনা।" ফলত 'বাস্তবের আপেক্ষিকত্বকে তিনি জাদুমন্ত্রবলে শাণিত বিদ্রূপে কশায়িত করেছেন, ভ্রান্তির সঙ্গে সত্যের নিত্য সংগ্রামের নবদ্বার উদ্ঘাটন করেছেন'; 'জিল ব্লাশ, টম জোন্‌স্‌, উইলহেল্‌ম্‌ মেস্টার, মিঃ পিকউইক, এবং স্যাম ওয়েলার—সবাই তাঁর প্রাণস্পর্শের গতিবেগে অনুভবময়'; এমনি তাঁর দূরদর্শী সাফল্য যে, 'তিনি ইবসেন, উনামুনো, প্রুস্ত, পিরান্দেল্লো, মান ও জয়েসের স্তরকেও' বুঝি 'অতিক্রম করেছেন'। 'আমাদের সাহিত্যের মহান্‌ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনিই নবীনতম, কারণ তিনিই প্রথম পুরুষ ও প্রাচীনতম, সম্ভ্রান্ত উন্নাদের আখ্যান একজন জরাজীর্ণ মানুষেরই জীবনোতিহাস। জ্ঞানের রাজ্যেও তিনি সর্বোত্তম।' সুতরাং 'wise through time and narrative with age'—হোমার-অনুবাদকালে পোপের এই মৌলিক পঙ্‌ক্তিময় মহাকবি-ঔপন্যাসিকের গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রবর্তনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তদশকে যে পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞান ও দর্শন করেছিল, সে আর আশ্চর্য কী। সুতরাং মহৎ নেতৃত্বে উপন্যাসের নবীন যাত্রা আরম্ভ হলো। কর্মযোগে ফিল্ডিংয়ের সাফল্যহেতু তাঁর রচনায় মাত্র র‍্যাবলের সোল্লাস বিদ্রূপ ও সারভেনতিসের নিশ্ছিদ্র শ্লেষ প্রকাশিত হয়নি, প্রত্যক্ষ-সরল সমাজচেতনা ও সহৃদয় মানববোধও প্রতিভাত হয়েছে। সমকালীন সমাজজীবনে, নতুন অর্থনীতি ও রাজনীতির নিয়ামকতায় বহুবিধ বিকার ও স্ববিরোধ তাঁর লক্ষণীয় হয়েছিল, তাঁর জীবনবোধে তাই

সুস্থতর ভারসাম্যরচনার দায়িত্বজ্ঞান সংযুক্ত। 'প্রতিষ্ঠিত সত্য'-বাদী মহাকাব্যের নায়কের মতো তাঁর নায়কও একাধারে যেমন 'prescribed act' সম্বন্ধে সজ্ঞান, তেমনি 'good heart' সম্বন্ধেও সচেতন। যে-সময়ের প্রভাবে-প্রতিক্রিয়ায় তিনি সমুত্থিত, তাঁর বড়ো দান এই স্বভাবধর্মের শিক্ষা সেই সময় ও সমাজ হয়তো নেয়নি, কিন্তু ইতিহাস তাঁকে রক্ষা করেছে। জীবনের 'why' সম্বন্ধে পরবর্তী ডস্টয়েভস্কি প্রভৃতির মতো ফিল্ডিং তৎপরতা বা কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি সত্য, কিন্তু তাঁর 'how'-এর তাৎপর্য-বিশ্লেষণে যা প্রাপ্য তাও কম কী। বড়ো কথা ডেফো ও তিনি, র‍্যাবলে-সারভেন্‌তিস্‌-এর উপযুক্ত পটভূমিকায় নবোত্থিত বুর্জোয়াসমাজের প্রকৃষ্ট কল্পনাশক্তিমান প্রতিনিধিস্বরূপ উপন্যাসকে নতুন নরনারী-পরীক্ষার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন।

অতঃপর স্ফূর্তির থেকে অবসাদ, স্বাস্থ্যের থেকে ক্ষয়, ব্যক্তিত্বের প্রতিরোধ-শক্তি ও সংগ্রাম থেকে আত্মগত সংক্ষোভ ও সংবরণ, বন্ধনের চিৎকার থেকে মুক্তির আক্ষেপে পরিস্থিতি ও প্রতিকৃতির দ্রুত পরিবর্তন ব্যতিক্রমগতি ও বিপরিণতি লাভ করতে থাকে। প্রথম উত্থানের উদ্যম ও উদ্যোগ ক্রমাবনতির ধাপে ধাপে ইতিহাসকে, ঘটনাকে, সমাজধর্মের চেয়ে ব্যক্তির ধর্মকে মাত্র অগত্যা অবলম্বন ক'রে 'অব্যর্থ শয়ের ব্যাপ্তি'তে, একরূপ নিরাশ্রয়, ছড়িয়ে পড়ে। এ-অবস্থার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ ব্যক্তিত্বের তথা নায়কোচিত দৃঢ় ও একাগ্র আচরণের অদৃশ্যতা। নবজাগ্রত শিল্পবাণিজ্যের দম্ভ ও দর্পে, অর্থশক্তির মদমত্ততায়, তার বিচিত্রজটিল নাগপাশে সময়-স্বভাবের সামগ্রিক লালসায়, অন্তঃসারশূন্য আত্ম-স্ফীতির তাণ্ডবে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'র ধারণা সেকেলে হয়ে গেছে। ফলত বালজাকের মতো শক্তিমান মহাকথাশিল্পীর 'দি হিউম্যান কমেডি' সম্পর্কেও তাই বলতে হয়, 'The reader is held by the pattern of events'। পূর্বসূরী স্তঁদালের 'division of mind' এড়িয়ে গিয়েও, ঘটনা বা কর্মের সঙ্গে চরিত্রকে যথার্থ সংযোজনে অধিক পারদর্শিতা দেখিয়েও, অজস্র গল্প ও খণ্ডোপন্যাসে আস্তৃত বৃহৎ দিকচক্রবালে মানবতার সমগ্র চিত্র সূর্যসনাথ পৃথিবীর মতো উদ্ভাসিত করতে চেয়েও তিনি জগৎ-দেখা চোখে জীবনের 'নিত্যতম' 'সত্যতম' মহত্ত্বকে তবু পান না। যাদের পান তারা 'misers, intriguers, old soldiers, old maids, aspiring journalists, all motivated by crude loves, hatreds and ambitions.' তথাপি

বালজাকের জগৎ 'a vast panorama', জীবনের চিত্র 'classified according to a theory of the humours, and compared to the varieties of the animal world.' ফিল্ডিং যেমন তাঁর 'classical worldliness'-এর জন্য বায়রনের কথামতো 'prose Homer of human nature', বালজাক তাঁর 'grand naturalism'-এর জন্যই মহাকবিতুল্য।

পক্ষান্তরে টলস্টয়ের ইতিহাস-সন্ধান ও ধর্মাশ্রয় তৎকালীন ব্যক্তির অধিকতর বলহীনতার রূপান্তর। ইতিহাস ও ব্যক্তির অন্যোন্য সম্পর্কে তাঁর এই অভিমত :

'The life of man is twofold—one side of it is his own personal experience, which is free and independent in proportion as his interests are lofty and transcendental, the other is his social life as an atom in the human swarm which binds him down with its laws and forces him to submit them. For although a man has a conscious individual existence, do what he will, he is but the inconscient tool of history and humanity.'

এই 'নিয়তি-কৃতনিয়মে'র অধীন ও 'কালের পুতুল' মনুষ্যত্বের যে-ছবি 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' শত-শত পৃষ্ঠায় বহুল বিবরণে উন্মোচিত করে, সেখানে নেপোলিয়ন, তাঁর প্রতিনায়ক ও অন্যান্য জন-নায়করা একাকার, আকবর বাদশা ও হরিপদ কেরানিতে কোনো তফাৎ নেই। এই মহদুপন্যাসের 'wide sweep' ও 'vast array of characters' তাই তার মহাকাব্য-দাবিত্বের একমাত্র মীমাংসা নয়। মানবজীবনের শান্ত ও করুণরসাত্মক তাঁর 'এপিলোগ-'অংশের মর্মবাণী যে 'their happiness and greatness' অপেক্ষা 'their grief and humiliation'-এরই অত্যাবশ্যক কথকতা তা এজন্যেই বারবার হানা দেয়। 'সংহার'-কালের বীরত্ব তাদের বড়ো কথা নয় বলি না, কিন্তু শান্তিপর্বের উপসংহারেই তাদের ভীরুতা ও আত্মতৃপ্তি সমধিক যথার্থ, লক্ষ্যভেদী ও চির-আবেদনাত্মক। ইতিমধ্যে সাত বছর কেটে গেছে, নিকোলাস রোস্তোভ একটি ধনী পরিবারের কন্যাকে বিয়ে করেছেন, ছেলেমেয়ে হয়েছে, পীয়োর ও নাটাশা তাঁদের কাছে প্রায়ই এসে বসেন। নাটাশাও বিবাহিত, সন্তানের জননী। কিন্তু সেই পুরাতন উচ্চাশা ও জীবনাগ্রহের নদীবেগ শুষ্ক আত্মতুষ্টির বালুস্তূপে চাপা পড়েছে, পরস্পরের প্রতি প্রেমেও কী অতিসাধারণ অগৌরব, কী ক্লান্তিকরতা! কত সমস্যা, সংকট, ক্লেশ ও বিক্ষোভ-যন্ত্রণার শেষে এই

মধ্যবয়সী আত্মতৃপ্তি। সেই সুন্দরী আনন্দ-রহস্যময়ী নাটাশা আজ নিতান্তই এক আটপৌরে পুরস্ত্রী! পীয়োর আরও মোটা হয়েছেন, এখনো তেমনি সৎ ও স্বাভাবিক, কিন্তু পরিণাম-রমণীয়তার কোনো চিহ্ন তাঁর কোথাও নেই।— উপন্যাসের সুখজনক সমাপ্তি এতই বিরূপ এমনি বিষাদান্ত অথচ এতই অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী যে, টলস্টয় যেন জীবনের এই সাবলীল সত্যকথনের বিড়ম্বনা সহজেই মেনে নিয়েছেন, একদা-অগ্নপ্রাণিত মানুষগুলির এই অবস্থাবশ্যতা, এই দাস্য-মনোভাব বর্তমান 'শান্তি'র পরিপ্রেক্ষিতে যত মর্মান্তিক হোক, স্বতঃস্ফূর্ততম ও নিবিড়তম বাস্তব সত্য, একে এড়িয়ে যাওয়া সময়ের অসাধ্য, তাঁরও অসাধ্য। এজরা পাউণ্ডের ভাষায় 'sombre fire of pessimism' এমনি অগ্নিশিখা ও ভস্মরাশির যুক্ত-অপাবৃত আচরণেই পরিস্ফুট হয়, 'eternal passion' ও 'eternal pain'-এর ক্ষীণদ্যুতি বীরোচিত ভঙ্গিসংগীতহীন ঘটনাকৈবল্যের বিচিত্র একঘেয়েমিতেই সংলগ্ন হয়ে থাকে। পূর্বে বালজাকের প্রসঙ্গে যেমন দেখেছি, এই উপন্যাসও নায়ক-নায়িকাহীন, কোহেনের ভাষায় আরও : 'The book contains no heroes or heroines, but just people living out their lives on the margin of events.' ব্যাপক যুদ্ধযাত্রা, বিপুল সাজসজ্জা ও কামানগর্জন-কোলাহল ছাড়া তাদের ম্যাড়মেড়ে জীবনে কোনো 'অতিরিক্ত মাত্রা' সম্ভব ছিল না। তথাপি কতকাংশে 'ডাইনাস্ট্‌স্'-এর টমাস হার্ডিতে ছাড়া 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীসে'র জাতীয়জীবন-ব্যক্তিজীবনের এই একাত্মক মহত্ত্ব-মাহাত্ম্য অন্যত্র দুর্লভ (বাংলা সাহিত্যে 'রাজসিংহ' কিছুপরিমাণে এজাতীয়)। ইলিয়াড এর ট্রোজান সমর ও তন্নিহিত বিশ্বনৈতিকতার মানদণ্ডেই মাত্র এর বিচার ও তুলনীয়তা চলে।

বস্তুতপক্ষে ১৭শ-১৮শ শতাব্দীবাহী টম্ জোন্‌স্-প্রভৃতির 'realism'-এর অবক্ষয়সম্ভব এই বীরমৃত্যুযজ্ঞ। ফ্লবেয়ার-জোলার 'naturalism' এই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। তারপর বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদে রোলাঁর প্রসন্ন মানবতা অথবা মানের বিশ্ববীক্ষা, যতই বীরোচিত হোক, 'অব্যর্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি'কে ঠেকাতে পারেনি। জাঁ ক্রিস্তফ-এর লেখক সম্পর্কে স্বয়ং রোলাঁ :

"I was isolated : like so many others in France I was shifting in a world morally inimical to me : I wanted air : I wanted to react against an unhealthy civilisation, against ideas corrupted by a sham e'lite : I wanted to say to them : 'You lie! You do not represent France!' To do so I needed

a hero with a pure heart and unclouded vision...(with) the right to speak ...voice...loud enough for him to gain a hearing."

ধৈর্য ও নিষ্ঠার অপেক্ষা ব্যর্থ হলো না। জাঁ ক্রিস্তফ উপন্যাস এই পরিকল্পনার মহত্ত্বে ও অন্য নানা কারণে টলস্টয় প্রভৃতির শেষ সার্থক উত্তরাধিকার। এ-গ্রন্থ সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, 'it clears the air', জীবনের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে নদীর সন্ধানী আবেগ-বেগে এর ভাবাবহ বয়ে যায়, চিরমানবতার সমুদ্র-অবগাহনে বর্তমান 'বিচ্ছিন্ন' জীবনের যাবতীয় যন্ত্রণা, নিঃশব্দ বিপর্যয়, ও বিক্ষুব্ধ বিশৃঙ্খলামণ্ডিত বিষক্রিয়ার উপশম ঘটে। কিন্তু পরিত্রাণ? তার বুঝি উপায় নেই। শিল্পীমানসের স্বাধীনতা ও 'শান্তির ললিত বাণী'তে নয়, জীবনের বিস্তৃততর পরিহাসে, সংগ্রামে, সংঘাতে রোলাঁ। 'বিমুগ্ধ আত্মা'য় জড়িয়েছেন নিজেকে : 'রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংগ্রাম' শেষে এখানে 'শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতে'র সংঘর্ষ। ১৯২২ থেকে যে 'অনিশ্চয়তা ও অধীর জিজ্ঞাসা'র যুগ পুনরারম্ভ হলো তার পটভূমিতে নতুন জীবনসম্পর্ক ব্যাপকাকারে খুঁজতে এসে রোলাঁ অমিতপ্রেমতরণী থেকে বহুদূরাগত সময়-পরিণত জননী আনেতের মতোই অবশেষে বুঝলেন : গতির সঙ্গে, স্রোতের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারাই মহামুক্তি।—জাঁ ক্রিস্তফ্-এর শিল্পীবিবেকের সেই নদীপ্রাণ সমুদ্রসঙ্গম। এই অসীমসাহসী মহাগতির মূল্যে রোলাঁ মহাকাব্যাস্বাদী। অনুরূপ বিদ্যাবৈদগ্ধ্য ও ধ্রুপদী সাহিত্যরুচির অধিকারী টমাস মান 'isolation' বা সমাজ থেকে ব্যক্তির নাড়ীবিচ্ছেদ-দর্শনের বলবান পথিকৃৎ। তিনি রোলাঁর মতো আশাবাদী ও স্বাস্থ্যবিশ্বাসী নন। ভবিষ্যতের সুদূর আহ্বানে বা আমন্ত্রণেও তাঁর কান নেই। বরং তিনি অতীতচারণে, বিকার ও অস্বাস্থ্যের ক্ষয়ে ব্যক্তির সময়সীমা-লঙ্ঘনে, তার আত্মঘাতী প্রকৃতিজয়ী প্রচেষ্টায় দুর্লভ বীরত্ব সন্ধান করেন। তাঁর নীরন্ধ্র শব্দব্যূহকৌশলাক্রান্ত প্রস্তরসৌন্দর্যময় রচনার জাদু এখানে যে, তাঁর বিশ্ব-চেতনা ও আত্ম-ভাবনায় যেমন কোনো ফাঁকি নেই, রচনালিপিতেও তেমনি কোনো ফাঁক নেই। 'বুডেনব্রুক্‌স্' ও 'দি ফরসাইট সাগা'র তুলনায় তা সহজবোধ্য। উনিশ-শতকান্তিক ইংরেজ ব্যবসাদারদের প্রবঞ্চনা, জালিয়াতি ও ছলাকলার বিচিত্র জালে গল্‌স্‌ওয়ার্দি গা ছেড়ে দেন, প্রতিভা সত্ত্বেও মহাশিল্পী-অসুলভ ভ্রম ও পাতকে জড়ান। কিন্তু টমাস্ মান তাঁর সওদাগরশ্রেণী-প্রতি-কৃতির অনেক ঊর্ধ্বে। তার ঊর্ধ্বচারিতা ও উন্নতমনস্কতার কোনো সীমা নেই।

'দি ম্যাজিক মাউন্টেন' তার সার্থক দৃষ্টান্ত—এই অচল কঠিন শূন্যতা-দর্শনেরও একটা যে অসাধারণ মোহ আছে, স্বতন্ত্র মহিমা আছে তা আরও বুঝি এজন্যে যে, তাঁর ক্ষয়ব্যাধির জগতেই যেন নিজেদের অসংগতি ও দুর্গতির চরমরূপ বিধৃত, মনুষ্যত্বের পরম সত্তা আবৃত—তাঁর নৈরাশ্যবিষাদের জীবনদর্শনও তাই এমন আজানুঅভগ্ন, এমন অবসাদহীন, মননশক্তির প্রাচুর্যে মহাকাব্যিক ঠাট ও জমকের গমকে-গমকে সাবয়ব, সমুন্নত। একহিসাবে য়ুনামুনো ডন কুইকজোটে যে 'spiritual order' প্রত্যক্ষ করেছেন বলে সারভেনতিসকে 'কবির কবি'-রূপে আখ্যাত করেছেন, টমাস মানেও সে-লক্ষণ একভাবে বিদ্যমান। এবং আরেকভাবে প্রুস্তে, অন্য আরেকভাবে জয়েসে—তাঁরা একালের বহুবিখ্যাত, ব্যক্তিত্বে বহুভঙ্গ, তবু উৎকেন্দ্রিক মানুষের আত্মিক-প্রহরায় রুদ্ধশ্বাস ধ্রুবতারা, মহাকাব্যিক এই সামান্যতম লক্ষণেও তাঁরা প্রাসঙ্গিক। সমাজ-সাম্রাজ্যনির্লিপ্ত বিশিষ্ট-নির্বিকার আত্মম্ভরিতার প্রতিমূর্তি মার্সেল প্রুস্ত *Remembrance of Things Past*-এর 'privileged moments' অন্বেষণেও চিরন্তনের অভিসারিক। আধুনিক মানুষের সংশয় সংকটত্রাণে কোনো সুনিশ্চিত বিশল্য-করণী তিনি বহন করেননি হয়তো, কিন্তু তাঁর মহাকায় গ্রন্থ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ—ত্রিমাত্রিক মহাকাব্যের জগতে কালমাত্রার সংযোজনে আরেক অমোঘ আয়তনকে স্বপ্রতিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ করেছে। অডিসিয়সের কাহিনী পুনর্বিন্যাসে জেম্‌স জয়েস মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার দিন-রাত্রি-দিনে 'চিরদিন' সন্ধানে আগ্রহ দেখিয়েছেন। রোলাঁর নদীবাহিত সমুদ্রতৃষ্ণা, মানের পার্বত্যপ্রতিকৃতি, প্রুস্তের আত্মানুকৃত ক্ষণশাশ্বতীর ধ্যান অচেতন-অবচেতন-সমন্বয়ে যে অপরূপ 'জাতীয় মিথ' বিশ্বস্থিত করেছে 'ইউলিসিসে', বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বিশ্বকথাসাহিত্যে তা তুলনারহিত। সমুদ্রোপকূলের প্রস্তরমন্দিরে (তাঁর সুসংহত রচনানৈপুণ্য মানের একাগ্রতায় নয়, স্বকীয় 'archaeo-technical' বহুধা ঐক্য 'architectural') তিন হাতের (মিঃ ব্লুম, মিসেস ব্লুম ও ডেডেলাস) 'কালের মন্দিরা' অবিরাম বেজে চলেছে, সেই সভ্যতা-ঊষাকালীন অডিসিয়স, পেনিলোপি, টেলিমেকাস ভীরু ও অবীরের অন্তরতন নৈরাজ্যে ফিরে এসেছে, 'unheroic heroism' অক্ষত-অব্যাহত রয়েছে নিঃস্ব ও নিঃসহায় বর্তমান ব্যক্তির অন্তর্মুখিতায়, স্বগতোক্তিময় পাণ্ডুর রতি-রীতির কৈবল্যে সূর্যাস্তপর গোধূলির রক্তিমা বিস্তৃত হয়েছে, এতে যে আশ্চর্য সংকল্প ও চমৎকার বরাভয় সূচিত হয়েছে তাতে শতবিক্ষুব্ধ ও বিপর্যস্ত বিস্তীর্ণ

বিশ্বচিত্রপটে সুখে-দুঃখে বিবিক্ত শান্ত জাতি-চিত্ত দীপনির্বাণের প্রাক্‌মুহূর্তের মতো আরেকবার জ্বলে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যের শতাধিক বছরের উপন্যাসসাধনায় মহাকাব্যোপম সৃষ্টির সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। তার মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য 'রাজসিংহে'র 'vast panorama' বা 'wide sweep' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ : 'বঙ্কিমবাবু যেন এই দিগন্তপ্রসারিত ধূসর মৃত্তিকাপটের উপর তাঁহার বইখানি ছাপাইয়া মধ্যাহ্ন রৌদ্রের সোনার-জল-করা অনন্ত নীলাকাশের মলাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন।' এবং এই মহাপটের উপযুক্ত নির্লিপ্ত মহৎ জীবনালেখ্য : 'গল্পটা সৈন্যদলের চলার মতো ; ঘটনাগুলা বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।' যেন 'নিঝ'রগুলা নদী হইতেছে—ক্রমেই গভীরতর হইয়া, ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া, পর্বত ভাঙিয়া, পথ করিয়া…মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই।' ব্যক্তির দিকে এই 'মহাপরিণাম' জেবউন্নিসার 'আপন সচেতন অন্তরাত্মা'য় প্রত্যাবর্তন। বহু চরিত্রের কলকোলাহলে কালস্রোতের 'নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র' হয়ে বেজে উঠেছে, 'ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে', আর সেই জাতীয় মহা-সংকটের দুর্দিনে জেবউন্নিসা 'অন্তরবাসী মহাপ্রাণীর আলিঙ্গন অনুভব' করছে, যেন প্রত্যক্ষ করছি : 'জেবউন্নিসা সম্রাটপ্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল।' এই 'ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া' নদী, নৌকা ও সমুদ্রোৎকণ্ঠার একাত্ম-মাহাত্ম্যে বঙ্কিম যে মহদুপন্যাস রচনা করে গেলেন, তার ধারারক্ষী-রূপে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই শতকান্তে অবতীর্ণ দেখলাম। তাঁর সমগ্রতাসন্ধানী শিল্পীমানস রোলাঁর মতো কোনো শিল্পী-জাঁ ক্রিস্তফের অনুবর্তন না ক'রে একটি গোঁড়া ও একগুঁয়ে হিন্দুর আপাত-সাধারণ চলাচলে, কিন্তু গভীর-গম্ভীর সংকটে-সংশয়ে, তার বহু-পরীক্ষোত্তীর্ণ পরাজয়-জয়ে বিশ্বময়ী-বিশ্বমায়ের ভারত-লুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্তে সমুত্তরণ স্বচ্ছন্দভাববেগেই ঘটিয়ে দিয়েছেন ; আনন্দময়ী-গোরার সাবলীল সম্ভাষণে ও পরেশবাবু-সুচরিতা-গোরার সহজ সরল সম্পর্ক রচনায় দেখিয়েছেন যে, গোরা এত পথ ঘুরে এত নদীজল ঘেঁটে অবশেষে সত্যসত্যই

চরিতার্থ হয়েছে। তাঁর সিদ্ধিলাভে একটি জাতীয় দুঃসময় ও দুর্গতির ফলাফল অবাধে সংযুক্ত হয়েছে। সে 'জগৎবাসিনী রমণী' জেবউন্নিসার মতো আকস্মাৎ জেগে ওঠেনি, ধীরে ধীরে, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আত্মনিগ্রহ দুঃখবরণের মধ্যে দুর্গম পথ বেয়ে সে, একদা দুর্বিনীত ধর্মান্ধ যুবক, আজ উদার বৃহদ্ধর্মে দীক্ষিত মানবহিতৈষী জগৎবাসী পুরুষ। 'চতুর্দিগবর্তী মনুষ্যসমাজ তার সমগ্র উত্তাপ প্রয়োগ ক'রে আমাদের প্রত্যেককে প্রতিক্ষণে ফুটিয়ে তুলছে' এবং 'মানুষের লক্ষলক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে—যার দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা শিকড়ের মতো বিবিধ রসাকর্ষণ করছি' : এই উভয় চিন্তায় আমোদিত রবীন্দ্রনাথ যে অখণ্ড-মানুষ রচনায় সাফল্যলাভ করবেন, মহাকাব্যের বিস্তৃত বক্ষপটে বিধৃত বীরোচিত সাহস ও নির্ভীক সঙ্কল্প-ব্রতধারী 'গোরা'র সচল আবির্ভাব ঘটাবেন সে সংগত আশা ব্যর্থ হয়নি। এবং 'যোগাযোগ'-এও তিনি 'বিশ্বনীতি' বা ইতিহাসের আরেক সংঘর্ষ-সত্য উন্মোচিত করতে চেয়েছিলেন। পরিকল্পনা-মতো বিস্তারের অভাবে চরিত্রায়ণের অসতর্কতায়, স্বদেশের বৈশ্যশক্তিকে অনু-ধাবনের অসম্পূর্ণতায় তাঁর এই অসাধারণ উপন্যাস-কল্পনা খণ্ডিত হয়েই রইল—এজন্য মহাকাব্যোপম উপন্যাসের অনটনে আরেকটি নিশ্চিত সমৃদ্ধির ইতোভ্রষ্টতা পাঠকদের নিশ্চয়ই মর্মাহত করে।

অতঃপর অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য'-এ পূর্বঘোষণার মতো উত্তুংভাষণের গৌরব না-ঘটলেও তিনি যে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের অজ্ঞাতপ্রায় বৃহৎ ও অস্থির পটভূমিতে সুধী-র ইনটুইশন্, বাদলের ইন্‌টেলেক্ট ও উজ্জয়িনীর আত্মনিবেদনাত্মক ত্রিমার্গ সাধনা-সন্ধান একাগ্রচিত্তে পরিচালিত করেছেন তা নিঃসন্দেহ স্বাস্থ্যশক্তি। সর্বোপরি তিনি জেনেছেন 'সত্যাসত্যে'র হিসাবনিকাশেই চির সত্য। বিষামৃত মন্থনেই জীবনের সারভাগ। তাই 'বিশুদ্ধ ও বিপুল' 'আকাঙ্ক্ষা', 'একাগ্র ও একান্ত' 'অধ্যবসায়', 'নিবিড় ও নিগূঢ়' 'নিষ্ঠা' সহযোগে এই নদী-উপনদী-শাখানদী সাধনায় মূলত তিনি যে ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটালেন, তাতে 'সংকটারূঢ় মানবাত্মা'র প্রতীক উজ্জয়িনীই হয়তো অপ্রতিহত-বেগ, ভারতীয়তার আদর্শ সুধীই হয়তো অপ্রতিরোধ্য গতি, কিন্তু ইউরোপীয় ইন্‌টেলেক্ট বাদল কি মাত্র দুর্নিবার জিজ্ঞাসা?—ততোধিক কিছু না-হলেও 'সত্যাসত্যে'র সাফল্য সামান্য নয়। টলস্টয়, রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথকে একপাত্রে পান ছাড়াও অবশিষ্ট কিছু অমৃতস্বাদ থাকে, যা নিশ্চিতই বিশ্বরীক্ষার্থী অন্নদাশঙ্করের। কোনো আন্তর্জাতিক

পটভূমি সন্ধান না ক'রেও স্বদেশ-বগতে, মনোবিকলন-সংকলনে, চৈতন্যপ্রবাহ-রীতির এতাবৎ অপরীক্ষিত বাঙালি ঘরানার পথে জীবন-জিজ্ঞাসাকে কত তুমুল ও উত্তুঙ্গ ক'রে তোলা যায় ধূর্জটিপ্রসাদের ট্রিলজি 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহানা' তার প্রমাণ। খগেনবাবুর সংকট ও যন্ত্রণা তার স্মৃতিচারণ ও মননকে অনিবার্য করেছে, সেই মনন ও বিতর্ক নতুন যন্ত্রণাকে আবাহন করেছে। এভাবেই সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ধূর্জটিপ্রসাদের মন এমন অকপট, তাঁর ব্যক্তি-স্বরূপ এত ব্যাপক, তাঁর অনুসন্ধিৎসা এ-রকম মর্মস্পর্শী' যে ধূর্জটিপ্রসাদ তথা খগেনবাবুর অনুপ্রাণিত মনীষা মাহাত্ম্যে উপন্যাসটি 'আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতীক হয়ে উঠেছে।' মনের এই অকাপট্য, স্বভাবের পবিত্রতা ও চরিত্রের বিশুদ্ধতা মিশিয়ে যে প্রসন্ন-মনোহর প্রকৃতি মানবীয় যুক্ত-জীবনযাত্রার অন্তর্ভেদী মহৎ প্রতিচ্ছবি-নির্মাণ এ-শতকের তিরিশের যুগ সম্ভব করতে পেরেছিল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার নির্মল নিদর্শন। 'পথের পাচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক' ও 'ইছামতী'র মধ্যে খণ্ড খণ্ড উজ্জ্বলতায় মহাকাব্যোপম প্রশান্ত-নির্লিপ্ত প্রাকৃতিকতা বারবার ফুটে উঠেছে, অবশ্য কোন উপন্যাসেই তার অখণ্ড অধিকার পরিব্যাপ্ত হয়নি। অন্য অনেক কৃতিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত-আঞ্চলিক তারাশঙ্কর এবং প্রত্যয়-প্রত্যয়ে অস্থায়ী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় মহাকাব্যোচিত একাগ্রতা, ঘনত্ব ও সংহতি সাধনে বহুবার ভ্রষ্ট হয়েছেন, নইলে অন্তত তারাশঙ্করকে হার্ডি বা *Independent people*-এর আঞ্চলিক-গুণান্বিত বা সাগা-সাহিত্যিক লক্ষণে কিঞ্চিৎ-সার্থকতাযুক্ত হয়েই পরিতুষ্ট থাকতে হতো না, মানিককেও গ্রামীণ জীবনবেদ রচনায় 'ইতিকথা'র নায়ক শশীর অনায়াস আত্মোৎক্রমণে সমুচিত সাফল্যলাভ করতে হয়তো দেখা যেত, উপন্যাসের শেষে প্রায় সুররিয়ালিস্টিক কবিতার স্বাদে আমাদের আত্মতৃপ্ত ভরপুরতার বাঞ্ছিততম অবসান হতো। সম্প্রতি কালে এমনি আরো অনেক অসম্পূর্ণতার নজির আছে। তার আগে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথমদিকে সংরচিত 'উপনিবেশ' উপন্যাসটির প্রসঙ্গ প্রয়োজনীয়। তিরিশের ঔপন্যাসিকদের গৌরবযুগ অনস্তমিত রাখার দায়িত্ব তিনিই বহন-সক্ষম ছিলেন। অধিকন্তু চর-ইসমাইলের কাহিনী বিষয়গত মহাকাব্যোপম গৌরব তাঁর সুগোচর ছিল। কিন্তু চরিত্রগতি বিবর্তন যে এজাতীয় উপন্যাসে একহারা বা দোহারা নয়,

তার সফল পরিণতি যে অতিরিক্ত মাত্রা বা আয়তন দাবি করে তা তিনি হয়তো মাত্র পরোক্ষ করেছিলেন, প্রত্যক্ষ করাতে পারেননি। আধুনিক কালের দায়ভাগ সত্ত্বেও, দায়িত্বজ্ঞানের অনটনে আমরা যে অচলপ্রতিষ্ঠায় সুঅভ্যস্ত হচ্ছি, সে দুর্ভাগ্যে তিনি 'উপনিবেশে'ই তৎক্ষণাৎ ইতি ঘটাতে পারতেন, কিন্তু প্রটবর্ষের কঠিন অনুশাসনে অবশ হয়ে তিনি উক্ত স্থানকালীন মহাবর্তকে মহদুপন্যাসের চিরকালত্বে সমাসীন করতে পারেননি। এমনি আরও দু'একটি সৎসুন্দর সম্ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও অবয়বে অসীম রায়, গুণময় মান্না সম্প্রতি নষ্ট করেছেন। তা সত্ত্বেও নবীনদলে অমিয়ভূষণ মজুমদার ও প্রবীণদলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মহাকাব্যোচিত বিস্তৃত কালপটে যে পুনরায় জাতীয় জীবনকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন, সংযুক্ত করেছেন নিটুট-বলিষ্ঠ সত্যসৌন্দর্য-কল্পনা, সমৃদ্ধ করেছেন স্থানকালপাত্রসমীক্ষার ব্যাপ্তি ও গভীরতাজ্ঞান, আমাদের এজাতীয় সাহিত্যের অবসাদগ্রস্ততার অপবাদ রহিত করেছেন, ইতিহাস সেজন্য তাঁদের স্মরণ করবে। অমিয়ভূষণের 'গড় শ্রীখণ্ডে' উত্তরবঙ্গের ছিন্নমূল জীবন ও জীবিকার মৌলিক সম্পর্ক ও সংস্কারাদি কোনরূপ আঞ্চলিকতার আপাত মুগ্ধকর প্রয়াসে ধরা না দিয়ে অনন্ত বিপুল জীবনের স্বচ্ছন্দ সাবলীল ঐকতানে ঝংকৃত হয়েছে। সঞ্জয়বাবুর 'প্রবেশ প্রস্থানে' পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গীয় প্রায় পাঁচটি দশকের এতকাল মৌন ইতিহাস বিচিত্র কর্মচক্রে বাঁধা মানুষের নিয়তি লঙ্ঘনের দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় 'গতাগতি'র গর্জনে-ঘর্ষণে-ক্রন্দনে, আত্মজয়ী পরাভবের বিরল জঙ্গমতায়, স্রোতে-মেশা মালিন্য-বিমলতাময় অকৃত্রিম 'চলোর্মি-আঘাতে' 'Joy beneath sorrow' 'Joy through sorrow'-র বীরোচিত অন্বেষণে, জলন্ত জীবন্ত আসক্তি আক্ষেপ ও নির্বেদসংক্রান্ত বিবিক্ত দর্শনে অদ্ভুত বেদনায় ফুটে উঠেছে। 'Show us History the operator, the organiser, Time the refreshing river'—অডেনের এই প্রার্থনার প্রত্যাশা যেন তিনি অসামান্য প্রতিভাবলে পূরণ করেছেন। অভিনব জীবনের উপন্যাস-মহাকাব্য রচনায় তাঁর এই সর্বাত্মক সাফল্য দিক্‌নির্ণয়ী।

নিখিলকুমার নন্দী

রসপরিণতি : কথাসাহিত্য হলো মানবহৃদয়ের ছবি, 'মানুষের স্বরূপের অভিব্যক্তি' তাই ঔপন্যাসিকের আদর্শ। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের ভাষায় মানুষের স্বরূপসন্ধান, তার হৃদয়ের ছবি তথা সমগ্রভাবে জীবনই কথাসাহিত্যের মৌল

লক্ষ্য। সাহিত্যিক এই জীবনকে আবিষ্কার করেন স্বীকার করেন, তাই সাহিত্য মানবজীবন সম্পর্কিত অনুভূতি ধারণ ক'রে প্রকাশ ক'রে সহৃদয়হৃদয়ে সঞ্চারিত ক'রে দেয়। তার মধ্যে আমরা আপনাকে এবং আপনার প্রতিবেশকে প্রত্যক্ষ করি, এই আত্মোপলব্ধির তথা জীবনরসাস্বাদনের অলৌকিক আনন্দ কথাসাহিত্য পাঠে পাই বলে তা সার্থক শিল্প : এইজন্য কথাসাহিত্যে 'কথা' প্রধান ধর্ম হতে পারে কিন্তু তাকেও জীবনধর্মী হতে হয়। কোন্ কথাই বা জীবন-বহির্ভূত? কাহিনী চরিত্র প্রভৃতি যাই হোক না কেন তাকে জীবনকেন্দ্রিক হতে হয়। ব্যাপকতর অর্থে উপন্যাস হলো একটি ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ জীবনানুভব (a personal, a direct impression of life)। উপন্যাস-পাঠকালে আমরা তার সন্ধান করি, তার প্রাপ্তিতে আমাদের রসতৃষ্ণা তৃপ্ত হয়।

'কথা' শব্দটির আধুনিক তাৎপর্যের সঙ্গে তার প্রাচীন অভিধা মিশে আছে, জিজ্ঞাসা ঔৎসুক্য বা কৌতূহল তার অন্তর্নিহিত ব্যাপার। কথাসাহিত্যে এই কথা হলো মৌলিক এবং অপরিহার্য। নাটকেও কথা ছিল, কথা ছিল মহাকাব্যে কিংবা নাট্যধর্মী ও মহাকাব্যোপম রচনায়; অথচ স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা হলো কথাসাহিত্যকে ; কথা এক্ষেত্রে কত প্রধান তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য সাধারণ গল্প থেকে কথাসাহিত্যের এই 'কথা' একটু স্বতন্ত্র। শুধু ঘটনাবিবৃতির স্থান এখানে নেই, কালনিবদ্ধ ঘটনাপরম্পরার মধ্যে রহস্যময়তা এবং অসম্ভাব্য না হলেও অপ্রত্যাশিতের সৃষ্টি করা ঔপন্যাসিকের কর্তব্য। জাগতিক ঘটনা-সম্বন্ধে লেখক সচেতন থাকেন বলে লেখকের অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডার সতত সমৃদ্ধ ও প্রবৃদ্ধ হতে থাকে। প্লট ও চরিত্র নির্মাণের পশ্চাতে লেখকের এই সুগভীর জীবনবোধ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা সক্রিয়, সহৃদয় পাঠক এ সকলের সান্নিধ্যে এসে আত্মোপলব্ধিতে ও আত্মবিষ্কারে উল্লসিত হয়ে উঠেন : 'Character, in any sense in which we can get at it, is action, and action is plot, and any plot which hangs together······plays upon our emotion, our suspense, by means of personal references.'

ঘটনা সর্বদা জীবনকেন্দ্রিক বলে ঘটনার সমাগমে চরিত্র অনিবার্যভাবে চলে আসে। 'এক যে ছিল' দিয়ে গল্প অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে 'রাজা' নামক ব্যক্তিটির আগমন অনিবার্য। 'নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন' কিংবা

'অনেকদিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম' এর মধ্যেও একই ব্যাপার সংঘটিত। ঘটমান অতীতে রচিত প্রথম বাক্যটির পর চরিত্রকে সরিয়ে রেখে নৌযাত্রার বর্ণনা এবং অপর ক্ষেত্রে যাত্রাকথার পরিবর্তে 'আমি'র পরিচয় প্রাধান্য অর্জন করেছে ; অন্তত এটুকু বেশ বোঝা যায় ঘটনা ও চরিত্র ভাই-বোনের মতো পরস্পরের হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়েছে। 'মহিমের পরম বন্ধু ছিল সুরেশ'—এর মধ্যে আছে দুটি চরিত্র আর তাদের পরম বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ। কিন্তু ছোট সমাপিকা ক্রিয়াটি ইঙ্গিত করছে এক অশুভ ব্যাপার, যা 'ছিল' অর্থাৎ এখন আর নেই কিংবা থাকবে না অথবা কি যেন হয়ে যাবে। অপূর্ব অদ্ভুত রহস্যময়তা জিজ্ঞাসা কৌতূহল এখানে এসে জড়ো হয়ে দাঁড়ায়। এই 'ছিল' সংকেত করছে ঘটনার অনিবার্য রূপান্তর, পরিবর্তন ও casuality। এভাবে সম্ভাব্য অপ্রত্যাশিত বিকশিত হয়ে চলেছে, ঘটনা ও চরিত্র ফুটে উঠছে ; সুতীব্র অনুভূতি আর বিস্তৃত সহানুভূতি নিয়ে উপন্যাস দ্রুতবিকাশাত্মক হয়ে পড়ল। কথাসাহিত্য-পাঠের ফলশ্রুতিতে সকল সহৃদয়ের হৃদয় এর সংস্পর্শে এসে ব্যাপ্তি ও বিশালতা লাভ করল, ফলে ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ তার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে গেল।

মানবহৃদয়কে অবলম্বন ক'রে মানুষের স্বরূপসন্ধান এবং জীবনজিজ্ঞাসা সমস্ত কিছুরই মূলে বিদ্যমান। একটি পরিবারের বাতিঘর দেখতে যাওয়ার যে আয়োজন তার মধ্যেও ঘটনা আছে, ঐতিহাসিক দুর্গ অবরোধের কোনো কাহিনীর তুলনায় তা চিত্তাকর্ষক কম নয় ; মানবজীবনের আশা-নৈরাশ্য আকাঙ্ক্ষা-অস্থিরত্বের দোলায় তা প্রাণবন্ত এবং যতই চঞ্চল ততই চমৎকার। প্রাচীন দুর্গসম্বন্ধীয় অজ্ঞানতাজনিত রহস্যময়তা, পাষাণপ্রাকারের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা, কারাগারকে কেন্দ্র ক'রে যুগ যুগ সঞ্চিত বেদনা দীর্ঘশ্বাসের ভাব—সমস্ত কিছু সুবিপুল বিস্ময়বোধ জাগ্রত করে। কিন্তু যে মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা দিগন্ত-প্রসারী জীবনসমুদ্রে সতত সঞ্চরমাণ, মানুষের যে তুচ্ছ প্রাত্যহিকতা তীব্র অনুভূতির সঙ্গে বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে তাও মহতোমহীয়ান। তাই প্রাণরক্ষার নিমিত্ত যে প্রবীণ মানুষটি আদিম ও রুদ্র সমুদ্রের মুখ থেকে গ্রাস ছিনিয়ে আনে সেই সংগ্রামী মৎস্যশিকারীর সঙ্গে যখন আমরা আত্মীয়তা অনুভব করি তখনই আমরা মহৎ হয়ে উঠি কারণ উপন্যাসটির সুর এই সমুচ্চ ও মহৎ জীবনবোধের গ্রামে বাঁধা। উপন্যাস এখানে পরিণত।

জীবন সম্বন্ধে লেখকের প্রসারিত দৃষ্টি ও সুতীব্র সহানুভূতি-সঞ্জাত অভিজ্ঞতা

চরিত্র কাহিনী প্রভৃতির আশ্রয়ে পরিবেশিত হয় এবং তা সহৃদয়হৃদয়সংবাদী হয়। সুন্দর ও সমর্থ নীতিবোধের দ্বারা এই জীবনদর্শন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃত মহৎ শিল্প মূলত নীতিবোধের সঙ্গে যুক্ত; শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির জন্য শিল্পী নীতিকে উপেক্ষা বা তার বিরুদ্ধতা করতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশ প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য : 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।' মনে হয় যেন মঙ্গলসাধন ও সৌন্দর্যসৃষ্টির কোন অপরিহার্য বন্ধন নেই, তাই এক্ষেত্রে তিনি একটির বিকল্পে আরেকটির অর্থাৎ যে কোন একটির অনুমোদন করেছেন। কিন্তু 'উত্তরচরিত'-এ কাব্য ও নীতিজ্ঞানের উদ্দেশ্যসমতা এবং 'সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধিবিধান' সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তার মর্মকথা হলো, 'সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।'

শিল্প জীবন-সমুৎপাদিত, জীবনের উপরে সে ক্রিয়াশীল; এইজন্য জীবনের প্রতি শিল্পের দায়িত্ব অস্বীকার করা চলে না। নীতি এভাবে জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকার ফলে প্রকারান্তরে তা সাহিত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে। জগৎচরাচরব্যাপী যে নিয়মের রাজত্ব চলছে তার সঙ্গে মানুষের ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখের কাহিনী একই সূত্রে গ্রথিত—একথা মহৎ শিল্পীমাত্রেই সর্বদা স্মরণ রাখেন। মহাকালের পদস্পর্শে তুচ্ছ থেকে মহৎ সকলেরই উজ্জীবন ঘটে। তাই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন এত সমুন্নত মহিমান্বিত। এর নৈকট্যে এসে সহৃদয়ের পরিশীলিত চিত্ত বিস্ফারিত হয়ে যায়।

পশুপতি শাসমল

রাজনৈতিক উপন্যাস : সমসাময়িক জগতের উদ্‌ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা যেমন কাব্যে তেমনি রাজনৈতিক সংগ্রামের উগ্র উত্তেজনা, বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সংঘর্ষ, নূতন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা-স্থাপনের স্বপ্নবিহ্বল আকুতি ও সুকুমার আদর্শবাদ উপন্যাসে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। সেইজন্য স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর, ১৯৪২-এর আগস্ট-আন্দোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতা, কংগ্রেস ও কমিউনিজ্‌ম মতবাদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, স্বাধীনতা-লাভের পর বৈষম্যবর্জিত নূতন সমাজ গড়ার একাগ্র প্রচেষ্টা, দেশ-প্রেমিকের আত্মোৎসর্গের প্রেরণা নিয়ে আধুনিক যুগের বহু উপন্যাসই রচিত হয়েছে। এই দেশব্যাপী উত্তেজনার মোহ যেন সাহিত্যিককে পেয়ে বসেছে ও

তার শাশ্বত মূল্যবোধকে অনেকটা আচ্ছন্ন করেছে। এ বিষয়ে লেখক ও পাঠকের মধ্যে এমন একটি অনায়াস-লভ্য যোগসূত্র বর্তমান, এমন একটি সুলভ আবেগপ্রবণতা ও ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশোন্মুখ, লিখতে বসলেই এমন একটি নিবিড় আবেশ ঘনিয়ে আসে যে এই প্রলোভন-সংবরণ অমানুষিক আত্মসংযমের ব্যাপার। দেখতে দেখতে নদীতে জোয়ার আসার মতো, ভাবের ও ভাষার দুর্দম উচ্ছ্বাসে উপন্যাসের কলেবর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পাঠকের সঙ্গে রুচিসাম্য, ভাবোচ্ছ্বাসস্ফীত নিজ অন্তরের সমর্থন, প্রতিবেশের বৈদ্যুতী-শক্তির প্রাণময়তা—জনপ্রিয়তার নিশ্চিত আশ্বাস—কোন্ লেখক এই সমস্তের সম্মোহন প্রভাব অতিক্রম ক'রে ভবিষ্যতের প্রমাদহীন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতি নিজ লক্ষ্যকে নিবদ্ধ করতে পারেন? রাজনৈতিক উষ্ণ প্রস্রবণে অবগাহন দেহে-মনে এমন আরাম ও তৃপ্তি আনে যে মনে হয় যে এতে গা ভাসালেই স্রোতোবেগে চরম সিদ্ধির উপকূলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে।

এই রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্যে স্থায়িত্বের যে কোনো উপাদান নেই তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। দেশব্যাপী ভাবাবেগের ঘূর্ণাবর্তে, আদর্শবাদের দুরারোহ শিখরের দিকে যাত্রাপথে মানবপ্রকৃতির যে বিশিষ্ট রূপটি উদ্ঘাটিত হয়, যে অসাধারণ পরিচয়টি ফুটে ওঠে, তার সার্থক রূপায়ণের চিরন্তন মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু এই পরিচয়টি মানবের গভীরতম সত্তা সম্বন্ধে হওয়া চাই। মানবচিত্তের যে অংশ তর্ক করে, বক্তৃতা করে, দলে ভিড়ে সংগ্রাম করে, মাঝে মধ্যে আদর্শের ব্যর্থতায় ক্ষোভের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ও শেষে চরম আত্মোৎসর্গের সাহায্যে অমর খ্যাতির পুষ্পকরথে আরোহণের যোগ্যতা অর্জন করে, তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের সুগভীর তত্ত্বটি নিহিত থাকে না। সৈনিকের বীরত্ব, দেশ-প্রেমিকের ভাবোচ্ছ্বাস, মতবাদ-প্রচারকের অমোঘ যুক্তিশৃঙ্খলা ও তেজোগর্ভ বাণী, বিদ্রোহীর অনমনীয় দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ-শক্তি—এ সমস্তই সমষ্টিগত কর্মপ্রণালীর পূর্বনির্দিষ্ট পথ বেয়ে প্রবাহিত হয়। এর মধ্যে ব্যক্তিত্বস্ফুরণের অবসর খুব বেশি নয়। যেমন স্টীমরোলারের চাপে রাস্তার উঁচু-নিচু সব গুঁড়িয়ে সমতল হয়ে যায় তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সমষ্টিগত উদ্দেশ্যসাধনের অন্তরালে আত্মগোপন করে। ভাবপ্রবণতার উষ্ণ বাষ্পনিষ্কাশন যে অস্পষ্ট বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করে তাতে অবয়ব ও অন্তঃপ্রকৃতির তীক্ষ্ণ রেখাবেষ্টনী অদৃশ্যপ্রায় হয়। প্রতিবেশচিত্র ব্যক্তিগত চরিত্র-চিত্রণকে

গৌণ ক'রে প্রধান হয়ে ওঠে। সুতরাং উপন্যাসের যে প্রধান লক্ষ্য চরিত্রাঙ্কন; চরিত্ররহস্যের গভীরে অন্তর্দৃষ্টি এই জাতীয় উপন্যাসে তা প্রায়ই সার্থক হয় না। ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে ত্রুটি তা রাজনৈতিক উপন্যাসে পুনরাবৃত্ত, এমন কি তীব্রতর হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক উপন্যাসের আরও একটি বিপদের দিকে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। এর বিষয়বস্তু আমাদের সাধারণ চেতনায় এমন অচ্ছেদ্যভাবে অঙ্গীভূত হয়েছে যে এটি সাহিত্যের বিশেষ গুণের অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীন কালে মঙ্গলকাব্যের মতো এটি আমাদের চিন্তাকাশকে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত করেছে যে এর সাহিত্যিক রূপায়ণ অনেকটা নির্বিশেষ ও সাধারণ-লক্ষণাক্রান্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অবশ্য মধ্যযুগের সঙ্গে তুলনায় আধুনিক যুগে সাহিত্যিকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আরও সুপ্রতিষ্ঠিত ; যুগধর্মের এই অপরিহার্য লক্ষণটুকু বাদ দিলে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে রীতি-পার্থক্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও রচয়িতার মানস-সাম্যের অন্তরালে চাপা পড়েছে। লেখকের মনোভাব সম্বন্ধে আমরা পূর্ব থেকেই অনুমান করতে পারি ; তাঁর মনন ও বর্ণনার মধ্যে অভিনবত্ব ও অভাবনীয়ত্বের চমক ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে। রাজনৈতিক জোয়ালে জোড়া প্রেমিকযুগল, মুখে যতই আস্ফালন করুক, মতবাদের বৈপ্লবিকতার লঘু বাষ্পে যতই স্ফীত হয়ে উঠুক, চক্রনেমিক্ষুণ্ণ, পূর্বনির্ধারিত পথরেখাকেই অব্যভিচারীভাবে অনুসরণ করছে। মানবপ্রকৃতির স্বাধীন, অব্যাহত স্ফুরণ, এর চরিত্রের নিগূঢ় উৎস হতে উদ্ভূত, অথচ অতর্কিত বিবর্তন এই সমস্ত রাজনৈতিক-মতবাদ-নিয়ন্ত্রিত উপন্যাসে যথেষ্ট অবসর পায় না। সিন্ধবাদের মতো আমাদের স্কন্ধে যে দৈত্য চেপে বসেছে তারই অঙ্কুশাঘাতে আমাদের প্রতি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত হয় : তারই বজ্রমুষ্টির চাপে আমাদের শ্বাসক্রিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। আবার ভাবের নেশায় আমরা অর্ধ-সচেতনভাবে তারই নির্দিষ্ট পথে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে চলি। এই স্বপ্ন, কল্পনা, প্রচেষ্টা, উত্তেজনা হয়ত আমাদের অন্তরশায়ী প্রাণপুরুষকে স্পর্শই করে না।

রাজনৈতিক উপন্যাসের অতি-প্রাদুর্ভাবের আর একটি পরোক্ষ ফল দাঁড়াচ্ছে যে এতে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে সীমারেখা অস্পষ্ট ও বিলুপ্তপ্রায় হয়ে উঠছে। উপন্যাস যেন প্রাত্যহিক ঘটনাবলীর দিনলিপিতে পর্যবসিত হতে চলেছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভে যে আবেগময় নিবন্ধ রচিত হয়, যেরকম

আলোচনা প্রসারলাভ করে, সাহিত্যে তাই অকিঞ্চিৎকর পরিবর্তনের সঙ্গে ঔপন্যাসিক চরিত্রের সংলাপ ও মনোভাব-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশিত হচ্ছে। সাংবাদিকের নৈর্ব্যক্তিকতা ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-চরিত্র চিত্রণের অক্ষম প্রয়াসে প্রায় অপরিবর্তিত থাকছে—ঔপন্যাসিক পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে সম্পাদকের বাণী ও বাচনভঙ্গিই আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। যা ঘটছে, যার বাস্তব রূপ আমাদের শিরা-স্নায়ু-চিন্তাকে অভিভূত করছে, যে বিতর্ক আমাদের সংশয়বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে তুলছে, যে দ্রুতসঞ্চরণশীল ছায়াপটে প্রতিটি মুহূর্ত নিজ ক্ষণিক প্রতিচ্ছবি ফেলছে, তার ভবিষ্যৎ, চিরন্তন প্রতিকৃতিটি সাহিত্যে ধরা পড়ছে না। বিভ্রান্তকারী বিক্ষোভের কেন্দ্রস্থলে সত্যের যে শাশ্বত মূর্তি স্থির, অবিচলভাবে বিরাজমান—সাহিত্যিকের দৃষ্টি সেই গভীরতর স্তরে পৌঁছচ্ছে না। সমস্ত সাহিত্য উৎকটভাবে প্রচারধর্মী, তাৎপর্যহীন বস্তুপুঞ্জের ভারে পীড়িত, সাময়িক উদ্‌ভ্রান্তিতে বিহ্বল ও অস্বচ্ছ হয়ে উঠছে। এই প্রবণতা প্রতিরুদ্ধ না হলে সাহিত্যিক আদর্শই বিকৃত হয়ে পড়বে, সমস্ত সাহিত্যই সাময়িকতার মলিন, চঞ্চল আবরণে এর জ্যোতির্ময় সত্তাটি হারিয়ে ফেলবে। সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টির সংরক্ষণ বর্তমান কালের একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রাউণ্ড ক্যারেকটার—দ্র, চরিত্র।

রূপক উপন্যাস—দ্র, রোমান্স।

রোমান্স: একদা 'রোমান্স' বলতে বোঝাতো ভাষা,—'রোমান' অর্থাৎ লাতিন থেকে আগত ভাষা। প্রাচীন ফরাসিতে সেই অর্থেই 'রোমান্স' শব্দের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়। প্রাচীন ফরাসিতে নাইটদের বীরত্বপূর্ণ কীর্তি-কাহিনীর প্রচলন থাকায় তাকেই সাধারণভাবে রোমান্স বলা হতো। এইভাবে ধীরে ধীরে 'রোমান্স' শব্দের অর্থসংকোচ শুরু হয়, পরে ভাষাগত আধারের ভেদ লুপ্ত হয়ে 'রোমান্স' শব্দ আবার অর্থ প্রসারলাভ করে। প্রেম এবং বীরত্বপূর্ণ কাল্পনিক কথাসাহিত্যকে বর্তমানে রোমান্স বলা হয়।

পৃথিবীর সর্বত্রই রোমান্স-সাহিত্যের জন্ম মধ্যযুগে। মধ্যযুগের আলো-আঁধারি ছায়ালোকে যে-সাহিত্য গড়ে উঠলো তার সঙ্গে জীবনের যোগ ছিল অকিঞ্চিৎ-

কর। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পুরোহিততন্ত্রের নির্দেশে প্রাচীন জীবনানুগ ক্লপদী সাহিত্যের পরিবর্তে পুরাণ ও ধর্মকথার প্রসার যেরকম অপ্রতিরোধ্য হলো, তেমনি সাহিত্যে প্রবেশ করলো পলায়নী মনোবৃত্তি, প্রশ্রয় পেল অলৌকিকতা, রঙিন চশমার মধ্য দিয়ে দেখা হলো জগৎ ও জীবন। অন্যদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে তখন সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সমাজের উপরতলা ও নিচেরতলার মধ্যে ভেদ ক্রমবর্ধমান। এ অবস্থায় অভিজাত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মনোরঞ্জনের জন্য যে-সাহিত্যসৃষ্টি, তারই নাম রোমান্স। রোমান্সে কল্পনানির্ভর অবাস্তব কাহিনী স্থান পেল, বাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন না ক'রে বাস্তবাপেক্ষা সুন্দরতর আদর্শায়িত একটি জগতের চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হলো। রোমান্সের নায়কনায়িকা, রাজা বা রাজপুত্র, শেষপর্যন্ত সকল বিপদ অতিক্রম ক'রে জয়লাভ করবে। স্বভাবতই অভিজাত সমাজের আকাঙ্ক্ষা নিজেদের অবস্থাকে স্থায়িত্বদান। মধ্যযুগে রোমান্সের সঙ্গে অবসর-উপভোগী সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উত্থানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদিও পরোক্ষভাবে রোমান্স-রস উপভোগ করেছে নিচেরতলার মানুষ, যারা সব দিক দিয়ে বঞ্চিত বলেই তাদের আশা এবং আশ্বাসের জগৎ গড়ে তুলতে চেয়েছে রোমান্সের মধ্যে। বাস্তববিস্মৃতি তথা আত্মবিস্মৃতিই অভিজাত ও অনভিজাতকে একই উপভোগ্যতাসূত্রে গ্রথিত করেছে। জীবনের অনিবার্য ক্লান্তি ও একঘেয়েমিকে সাময়িকভাবে ভোলবার জন্যই রোমান্সের বর্ণাঢ্য সুতীব্র আনন্দবেদনার জগতে প্রবেশ, যেখানে জীবনের ছায়া আছে, কিন্তু দীর্ঘতর বৃহত্তর এক ছায়ারূপ, যা অভিভূত করে,—কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তলকে স্পর্শ করে না।

রোমান্স এক স্বপ্নময় জগৎ গড়ে তোলে—ধূসর, অস্পষ্ট, কল্পনা দিয়ে গড়া। বীরত্ব, শৌর্য, প্রেম, দুঃসাহস, অভিযাত্রা—এই হলো মধ্যযুগের রোমান্সের বিষয়। সাহসী রাজপুত্র, অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা, দুষ্ট রাক্ষস বা যাদুকর ; আর আদর্শায়িত প্রেম। মধ্যযুগীয় রোমান্সের মধ্যে সর্বদাই একটা নীতি-বাক্য লুকিয়ে থাকতো। আসলে রোমান্সের জন্মলগ্নে একদিকে যেমন রাজসভার প্রভাব, অন্যদিকে তেমনি মঠ-মন্দিরের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব অলক্ষ্যে কাজ করেছে। সৎলোক জয়লাভ করবে এবং অসৎ লোক শাস্তি পাবে—এ সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত, এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। রোমান্সের জগৎটাই অবিমিশ্র ভালো এবং অবিমিশ্র মন্দ—এই দুজাতের মানুষ নিয়ে গড়ে উঠেছে, এবং রোমান্সের কাহিনী

গড়ে ওঠে ভালো-মন্দের সংঘাত নিয়ে। আধুনিক পরিভাষায়, সমতলসদৃশ চরিত্রই (ফ্ল্যাট ক্যারেকটার) কেবল রোমান্সে স্থান পায়। অন্যদিকে রোমান্সে চরিত্রের থেকে ঘটনার প্রাধান্য, ঘটনাই সেখানে চরিত্রকে চালনা করে। অবশ্য চরিত্রের আধুনিক সংজ্ঞাও সেখানে প্রযোজ্য নয়, যদি না সমতলসদৃশ চরিত্রকে সর্বদাই রূপকের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ক'রে দেখি। আসলে রোমান্সের আকর্ষণ ঘটনার ঘনঘটায়,—ফলে চরিত্রের অভাব সেখানে অনুভব করাই যায় না।

মধ্যযুগের অবসানে রেনেসাঁসের অভ্যুত্থানে উপন্যাসের জন্ম হলো, এবং স্বভাবতই জীবনমুখিতা, বাস্তবচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় রোমান্সের প্রতি আকর্ষণ কমতে শুরু করলো। উপন্যাসে জটিলতা অনিবার্য—গল্পেও বটে, চরিত্রেও বটে। কিন্তু অতিলৌকিকের ব্যবহার সাহিত্য-ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হলো না, কারণ অতিলৌকিক শুধু শিশু মনোরঞ্জন বা ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রয়োজনে দেখা দেয় না, তার অন্যতর একাধিক ভূমিকাও আছে। মধ্যযুগীয় রোমান্সের রূপান্তর ঘটলো রূপক-কাহিনীর মধ্যে, তার একটি কারণ হয়তো তখনো রচনার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকাশ অভীপ্সিত ছিল না, সুতরাং তিরস্করণীর প্রয়োজন থেকে গেল; কিন্তু রূপকের প্রতি আকর্ষণের আরও গভীর তাৎপর্য আছে। দান্তের মহাকাব্যে অলৌকিকতা আছে, রোমান্সের প্রয়োজনে নয়,—রূপকের প্রয়োজনে। সার্ভেন্তিস্ এমনকি রাব্‌লেকে পর্যন্ত মানবশক্তির অভিনব সম্ভাবনা ও বিদ্রোহকে প্রকাশের জন্য রূপকাশ্রয়ী অতিলৌকিকতার উপর নির্ভর করতে হয়েছে। আরও আধুনিক কালে সুইফ্‌টও তাঁর শ্লেষাত্মক বক্তব্য পরিবেশনে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। সুতরাং অতিলৌকিকতা সর্বদাই বাস্তব ও জীবনমুখী সাহিত্যের শত্রু, এমন বিবেচনা করা যায় না। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মধ্যযুগীয় কাব্যেও তাই পশুগণের ক্রন্দন, বা নদনদীদের কলিঙ্গযাত্রা অতিলৌকিকতার স্পর্শ সত্ত্বেও রূপকধর্মের অনিবার্যতায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদি এর প্রেরণা হয় আদর্শবাদ, তবে কি আলডস হাক্সলির 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' (১৯৩২) থেকে 'দি আইল্যাণ্ড' (১৯৬২) পর্যন্ত বহু উপন্যাস এই রীতিরই অনুবর্তন?

অবশ্য রোমান্স তার পুরনো চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে ছদ্মরূপদী সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ায় রোমান্টিক যুগের পুনরুত্থানে। ঠিক পুরনো চেহারা হয়তো নয়, কারণ নতুন যুগের ভিন্নতর প্রয়োজনে তার রূপরীতি অনেকখানি

পরিবর্তিত হয়েছে। স্কটের বা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস একালের রোমান্স। রোমান্টিক কাব্যান্দোলন অতীতের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেছে ; বর্তমানের বন্ধুর, রূঢ়, পরিচিত দিবালোক তার সব কিছু অসম্পূর্ণতা নিয়ে দৃষ্টিগোচর বলেই অতীতের সেই দূরত্বটুকু কাঙ্ক্ষিত, যা আখ্যানবস্তুকে দেয় স্বপ্নের মাধুর্য, জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ রাত্রির মোহময় সম্পূর্ণতাবোধ। কিন্তু মধ্যযুগের রোমান্সের জগৎ দূর-কল্পনার জগৎ। রোমান্টিক যুগের রোমান্স বর্তমানের সঙ্গে যোগেই সম্পূর্ণতা পেয়েছে। 'ফ্যান্সি' এবং 'ইম্যাজিনেশন'-এর প্রভেদ নির্ণয়ে আধুনিক বিতর্ক শুধু কবিকল্পনার উচ্চাবচ বৈচিত্র্য-সম্পর্কিত নয়, তার পিছনে গভীর জীবন-দর্শন এবং প্রত্যয়ের প্রশ্ন আছে। কোলরিজ, যিনি 'বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া' (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ) গ্রন্থে রোমান্টিক কাব্যাদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জানালেন, 'It was agreed that my endeavours should be directed to persons and characters supernatural, or atleast romantic; yet so as to transfer from our inward nature a human interest and a semblance of truth sufficient to procure for these shadows of imagination that willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith', তিনি নিজে লিখলেন 'ক্রিস্টাবেল' এবং 'দি এনসেণ্ট ম্যারিনার', রচনা করলেন এক কল্পনার জগৎ যা লৌকিক এবং অলৌকিকের মধ্যে রচনা করে সহজ-সেতু। বলাবাহুল্য এখানে মধ্যযুগীয় রোমান্স বা রূপকের অলৌকিকতা ভিন্নতর তাৎপর্য গ্রহণ করেছে। বাইরে থেকে দেখলে আধুনিক রোমান্সের মধ্যেও ঘটনার চমৎকারিত্ব, অ-লৌকিকতা, অবিমিশ্র ভালো আর মন্দের অবতারণা, —সবই আছে। কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করলে দেখবো মধ্যযুগীয় রোমান্সের সঙ্গে এর মৌলিক প্রভেদ, রূপকথার জগৎ রূপকের মধ্য দিয়ে রোমান্টিক যুগে যখন এসে পৌঁছলো তখনই ঘটেছে এই মৌল পরিবর্তন। রোমান্টিক যুগে ঘটনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে চরিত্র, কখনো ঐতিহাসিক কখনো মিশ্র বাস্তবাশ্রিত, যার যোগ নিঃসন্দেহে বর্তমানের সঙ্গে। অলৌকিকতা আর ঘটনার উপর নির্ভর করে না ততখানি, যতখানি করে আবহ রচনার উপর। ভালো-মন্দের বোধ নির্দেশিত হয় রোমান্টিক আদর্শবাদের প্রেরণায়। লঘুপক্ষ-স্বেচ্ছা-বিহারী-অসংযমী কাল্পনিকতা শুধু নিয়ন্ত্রিত হয়নি, তার স্থান নিয়েছে নির্দিষ্ট

লক্ষ্যসন্ধানী-আত্মচালিত পরিকল্পিতা। ফলে মধ্যযুগীয় লোকসাহিত্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র প্রভেদ শুধু কালগত বা কলাগত নয়,—দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শগতও বটে।

'কপালকুণ্ডলা'র রোমান্টিক আদর্শ পরবর্তীকালে অক্ষুণ্ণ থাকেনি। ফলে 'চন্দ্রশেখর' বা 'রজনী'তে অলৌকিকতা এসেছে মধ্যযুগীয় রোমান্স-ধারানুসরণে। খুব সম্প্রতিকালে বাংলা ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসগুলিতেও সেই প্রাক্তন সংস্কার চক্রবৎ হয়তো ফিরে আসছে। কিন্তু রোমান্সের বর্ণাঢ্যতা ধরা পড়েছিল আমাদের দেশে রবীন্দ্রযুগের একাধিক উপন্যাসে, যাকে আধুনিক রোমান্স-ধর্মী উপন্যাস বলাই ভালো। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'র প্রাথমিক দুর্বলতা ক্ষমার্হ হলেও, 'শেষের কবিতা'র তৃপ্তিদায়ক ঘটনাপরম্পরা রোমান্সের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করে। মণীন্দ্রলাল বসু থেকে বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত একাধিক লেখক উপন্যাসে এই একই রোমান্সাদর্শ গ্রহণ করেছেন। এখানে বলে রাখি, উপন্যাসের অপসৃষ্টিকে রোমান্স আখ্যা দেওয়া উচিত নয়। মিলন-মিশ্রণ সত্ত্বেও রোমান্স ও উপন্যাসের আদর্শ পৃথক। উপন্যাস ও রোমান্সের স্বাদ স্বতন্ত্র, তাদের বিচারের মানদণ্ডও পৃথক হওয়া উচিত। য়োরোপে রোমান্টিক যুগের রোমান্সের প্রতিক্রিয়ায় প্রকৃতিবাদের প্রসার, আমাদের দেশেও বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষ থেকেই অবিমিশ্র বাস্তবের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। কিন্তু সাহিত্যে রূপভেদ ও রসভেদ অনিবার্য, সুতরাং রোমান্স লয় পাবে না, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে। হয়তো তার রূপ-রীতি পরিবর্তিত হবে, কারণ যুগ-কালের সঙ্গে রোমান্সের বিবর্তনের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

অলোক রায়

লুজ প্লট—দ্র, প্লট।

সংলাপ : নাটক সংলাপ-নির্ভর ; নাট্যকার নেপথ্যে থাকেন বলেই কাহিনী বা চরিত্রের ভার সবকিছুই সংলাপকে বহন করতে হয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক উপন্যাসের কাহিনী এবং চরিত্রের সঙ্গেই চলেন, চরিত্র যেখানে নীরব সেখানে তিনি বর্ণনা, বিবৃতি বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ক'রে সমগ্র পরিস্থিতিকে পাঠকের সামনে উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন। সেদিক দিয়ে উপন্যাসে সংলাপের গুরুত্ব নাটকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।

কিন্তু আধুনিক উপন্যাসে সংলাপ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। উপন্যাসের সর্বগ্রাসী আবেদনের ফলে উপন্যাসের গদ্যভাষার মধ্যে একইসঙ্গে কাব্যরস ও নাট্যরস যুগপৎ কুক্ষিগত। উপন্যাসে ব্যবহৃত সংলাপের মাধ্যমে একদিকে আমরা উপন্যাসে বর্ণিত পাত্রপাত্রীর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যলাভ করি, অন্যদিকে কাহিনীটি নাটকের মতো প্রত্যক্ষবৎ হয়ে ওঠে। সংলাপের মাধ্যমে কাহিনী অগ্রসর হলেও, সংলাপ প্রধানত অন্তর্জীবনের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি ঘটায়। পাত্রপাত্রীর আবেগ-অনুভূতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় সংলাপের মাধ্যমে। এদিক দিয়ে সংলাপরচনায় নাট্যকার অপেক্ষা ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত জটিল। পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অনেকখানি যেমন সংলাপে ধরে রাখতে হয়, তেমনই লেখকের নিজের ভাষারীতিকেও অব্যাহত রাখতে হয়। ঔপন্যাসিক নিজের স্টাইল কখনই বিসর্জন দিতে পারেন না, আবার কয়েকটি পৃথক ব্যক্তিত্বকে সংলাপের মাধ্যমে তার মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট ক'রে তোলেন।

উপন্যাসের সংলাপরচনার পদ্ধতি দ্বিবিধ। প্রথমত, ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে সংলাপ যথাযথভাবে অন্বিত হবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক না কেন কাহিনীকে বিকশিত ক'রে তুলবে এবং চরিত্রের সঙ্গে ঘটনার যোগসূত্র স্থাপন করবে। যে-সংলাপ কাহিনী বা চরিত্রের বিকাশের সহায়ক নয় বা এ-দুটির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে অক্ষম—সে জাতীয় সংলাপ উপন্যাসের ভারস্বরূপ, উপন্যাসের ঐক্যচেতনার বিরোধী।

দ্বিতীয়ত, চরিত্রের ব্যক্তিত্বের এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংলাপ হবে স্বাভাবিক, সুসংগত এবং নাটকীয়। চরিত্রের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অন্বিত হলে সংলাপ হবে স্বাভাবিক, ঘটনা পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সংলাপ হবে সুসংগত এবং পাঠকের কাছে জীবন্ত, আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ হলে সংলাপ হবে নাটকীয়। আদর্শ সংলাপের এগুলি সাধারণ ধর্ম। ব্যাপারটি আপাত সরল বলে মনে হলেও, সংলাপরচনায় এই ধর্মগুলির সামঞ্জস্যবিধান ঔপন্যাসিকের কাছে দুরূহ সাধনা-সাপেক্ষ। সাধারণ লোক দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষায় কথা বলে, বা মার্জিত রুচির লোক বিশেষ পরিস্থিতিতে যে ভাষায় কথা বলে—উপন্যাসের সংলাপরচনায় তা আক্ষরিকভাবে প্রয়োগ করলে অনেক সময় কৃত্রিম বলে মনে হতে পারে। আবার বাস্তবজীবনের সঙ্গে সংগতি রাখতে গেলে সংলাপের ভাষা হয়তো স্বাভাবিক হয়, কিন্তু তার নাটকীয় গুণ অন্তর্হিত হয়ে যায়। অন্যদিকে

সংলাপে নাটকীয়ত্ব আনতে গেলে তা জীবনানুগ নাও হতে পারে। সংলাপের এই দোলাচলবৃত্তি এড়িয়ে চলার জন্য লেখক বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত কথ্যভাষা থেকে সংলাপ আহরণ করবেন, কিন্তু তার মধ্যে নাটকীয়ত্ব আরোপ করার জন্য গ্রহণ-বর্জনরীতি অনুসরণ করবেন। এবং এই গ্রহণবর্জন-রীতি নির্ভর করে উপন্যাসের বিষয়বস্তু, ঘটনা ও চরিত্রের বিন্যাসপদ্ধতির সঙ্গে সংলাপের সংগতিরক্ষার উপর। বাস্তব জীবনের অধিকাংশ সংলাপই আকর্ষণীয় নয়, মানবমনের গভীর ও গোপন জটিল গ্রন্থিগুলি উন্মোচনে তা প্রায়শই অক্ষম, অন্যের মনে সঞ্চারণ-ক্ষমতা তার সীমাবদ্ধ; অধিকন্তু তাতে থাকতে পারে অতিশয়োক্তি বা পুনরুক্তি দোষ—যা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে; সেক্ষেত্রে সে জাতীয় সংলাপরচনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে বাধ্য। তাই লেখককে সচেতনভাবে নির্বাচন, বিন্যাস ও বিশিষ্টতা মণ্ডিত ক'রে সংলাপ পরিবেশন করতে হয়। সংলাপরচনায় কতটুকু বর্জন করতে হবে, ঔপন্যাসিকের পক্ষে এই জ্ঞানই আদর্শ সংলাপরচনার প্রাথমিক ভিত্তি।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কথ্যভাষাকে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে স্বাভাবিকতা ও সজীবতার দাবিতে সংলাপরচনার উপাদানরূপে ব্যবহার করেন। কোন উপন্যাসে বর্ণনীয় বিষয় যেখানে প্রাত্যহিক, গতানুগতিক ও সাধারণ মাত্র—সেখানে এ জাতীয় কথ্যভাষা প্রয়োগ কিছুটা স্বাভাবিক ও সংগত। কিন্তু আবেগ-উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে বা কোন ট্র্যাজিক মুহূর্তে প্রাত্যহিক জীবনের কথ্যভাষায় সংলাপরচনা কতখানি সার্থক ও সংগত তা বিতর্কের বিষয়। বাস্তব জীবনে আবেগ-উত্তেজনার মুহূর্তে মানুষ সাধারণত শোকে মুহ্যমান, আবেগে রুদ্ধবাক্, ক্রোধে তোতলাতে থাকে। এই পরিস্থিতিগুলিতে সংলাপের মাধ্যমে ভাবাবেগের গভীরতাকে পরিস্ফুট করা লেখকের পক্ষে সংকটরূপে দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক নানাভাবে পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। প্রথমত, অনেক লেখক পাত্রপাত্রীকে একবারে মূক রেখে বা শারীরিক আচরণগত বর্ণনা দ্বারা চরিত্রের অন্তর্নিহিত আবেগকে পরিস্ফুট করেন। এক্ষেত্রে নাট্যকার অপেক্ষা ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব অনেক সহজতর হয়ে যায়। তবে এ পদ্ধতিটি আসলে উপযুক্ত সংলাপ রচনায় যে সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধান নয়, তাকে প্রকারান্তরে এড়িয়ে যাবার একটি চতুর কৌশলমাত্র। দ্বিতীয়ত, বাস্তবজীবনে দৃষ্ট আবেগ-উত্তেজনার মুহূর্তে মানুষের বাক্-ভঙ্গি যেমন অসংযত, অসংলগ্ন ও পুনরুক্তিদোষপূর্ণ—সংলাপের

মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক অবিকল সেই বাক্‌-ভঙ্গিই অনুসরণ করেন। এতে উপন্যাসে বাস্তবতার স্বাদ সঞ্চারিত করা হয় বটে, কিন্তু সংলাপের যে মূল উদ্দেশ্য—পাঠকমনে ভাবাবেগ সঞ্চারিত করা—তা ব্যাহত হয়। এ জাতীয় সংলাপে পাঠকমনে কোন অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। তৃতীয়ত, বাস্তব আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আবেগ-উত্তেজনাজনক পরিস্থিতিতে অনেকসময় ঔপন্যাসিক কাটা কাটা বাক্য, অপূর্ণ বা বিস্ময়বোধক বাক্য দ্বারা সংলাপরচনা করেন। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য যদিও বাস্তবতা সৃষ্টি, আসলে পদ্ধতিটি বাস্তবতার ভাণমাত্র। অধিকন্তু এ জাতীয় সংলাপে পাঠকমনে কোন ভাবাবেগ আদৌ সঞ্চারিত হয় কিনা সন্দেহ; কারণ কাটা কাটা বাক্য বা অপূর্ণ বাক্যের মধ্যে কোন ভাব-বহন ক্ষমতা নেই। উপরন্তু এ জাতীয় সংলাপ-সংবলিত উপন্যাসের মুদ্রিতাংশ ড্যাস্‌, ফুট্‌কি ইত্যাদিতে কণ্টকিত—যা পাঠকের দৃষ্টির পক্ষে পীড়াদায়ক।

এই কারণেই অর্থাৎ কথ্যভাষার মধ্যে নাট্যরসের অসদ্ভাব রয়ে গেছে বলেই অনেক ঔপন্যাসিক সংলাপরচনায় একটি বিপরীত পন্থা অবলম্বন করেন। অনেক সময় চরিত্রের কোন অতলশায়ী বেদনাদায়ক মুহূর্তে বা ট্রাজিক বেদনার মুহূর্তে পাঠকমনে অনুরূপ ভাবাবেগ সৃষ্টির প্রেরণায় লেখক আবেগ উচ্ছ্বসিত বা আলঙ্কারিক বাক্‌-ভঙ্গির দ্বারস্থ হন। সংলাপরচনার ক্ষেত্রে এই আবেগ-আতিশয্য যতই নাট্য ও কাব্যরসাশ্রিত হোক না কেন—তা বাস্তবতার পরিপন্থী। কারণ বাস্তবজীবনে মানুষ ট্রাজিক বেদনার মুহূর্তে ট্রাজিক মহিমায় কথা বলে না। সাধারণ মানুষের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা যত গভীরই হোক না কেন, বাক্‌সংযম তার অনিবার্য ফলশ্রুতি। এই পরিস্থিতিতে উপন্যাসে সংলাপ-রচনায় বাক্‌সংযম তাই স্বাভাবিকতার দাবিতে একান্ত প্রত্যাশিত। নাটক অপেক্ষা উপন্যাসে সে সুযোগও বেশি। কারণ উপন্যাসে বর্ণনা দ্বারা সংলাপের ঘাটতি অনেকখানি মেটানো যায়।

বস্তুত কথ্যরীতির মধ্যে এই সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে বলেই এবং আবেগ-আতিশয্যপূর্ণ বা আলংকারিক বাক্‌ভঙ্গি যেহেতু জীবনবিবিক্ত—তাই সংলাপ-রচনার ক্ষেত্রে কথ্যভাষার উপর ভিত্তি ক'রে ঔপন্যাসিক একটি সুপরিকল্পিত ভাষা তৈরি করে নেন। এই সুপরিকল্পিত ভাষাই শিল্পের ভাষা—জীবনের স্থূলতা যেখানে অপসৃত, কল্পনার অতিরেক সেখানে অবদমিত। আবেগ-উত্তেজনা, বা কোন বেদনাদায়ক পরিস্থিতিকে পরিস্ফুট করার জন্য বাস্তব-

জীবনের কথ্যভাষাকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে নির্বাচিত, বিন্যস্ত ও স্টাইলযুক্ত ক'রে সংলাপরচনায় একটি সুপরিকল্পিত প্যাটার্ন তৈরি করাই ঔপন্যাসিকের পক্ষে সংলাপরচনার সংকট-মুক্তির একমাত্র উপায়। কখনও সংলাপের মধ্যে ভাবানুষঙ্গ অনুযায়ী কয়েকটি বিশেষ বস্তুর মধ্যে সাংকেতিকতা আরোপ ক'রে, কখনও বাক্-ভঙ্গির মধ্যে ভাবঘন ও সুদূরপ্রসারী ব্যঞ্জনাধর্ম আরোপ ক'রে, কখনও স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সুবিন্যস্ত প্রয়োগে সংলাপের মধ্যে ধ্বনিসৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রে, কখনও বা বাক্-ভঙ্গির মধ্যে ছন্দ-স্পন্দন সৃষ্টি ক'রে লেখক সংলাপরচনায় একটি নিজস্ব স্টাইল প্রবর্তন ক'রে সংলাপরচনার অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে অন্বিত এই জাতীয় সুপরিকল্পিত সংলাপই উপন্যাসের আদর্শ সংলাপ।

সংলাপের মাধ্যমে হাস্যরসসৃষ্টির জন্য লেখক অনেক সময় লঘু চরিত্রের অবতারণা করেন। অধিকাংশ লঘু চরিত্র সরল, একরঙা এবং টাইপধর্মী। এ জাতীয় একরঙা চরিত্রের বাক্-ভঙ্গির মধ্যে খুব বেশি বৈচিত্র্য থাকে না —সংলাপ নিতান্তই বাঁধাধরা। সেক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে ঔপন্যাসিককে সচেতন থাকতে হয়। প্রথমত, এ জাতীয় চরিত্রের উপস্থিতি ও এদের মুখে সংলাপ যেন নিয়ন্ত্রিত হয়। বারবার এ জাতীয় চরিত্রের উপস্থিতি এবং হাস্যরসসৃষ্টির একঘেয়ে সংলাপপ্রচেষ্টা পাঠকের পক্ষে বিরক্তিকর হতে পারে। দ্বিতীয়ত, লঘু চরিত্রের সংলাপকে কাহিনীর অগ্রগতির কাজে ব্যবহার করতে পারলে অনেকসময় এদের একঘেয়ে সংলাপ পাঠকের পক্ষে সহনীয় হয়ে উঠতে পারে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে নানাভাবে সংলাপরচনা করতে দেখা যায়। প্রথমত, লেখক আক্ষরিকভাবে অতীত যুগের ভাষা ব্যবহার করতে পারেন। তাতে যুগরস সার্থকভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। অবশ্য সংলাপরচনার এই পদ্ধতিটি কিছুটা সীমাবদ্ধ। কেবল নিকট-অতীত যুগের কাহিনীতে এটা সম্ভব। কারণ লেখকের সমকালীন ভাষার সঙ্গে নিকট-অতীত যুগের ভাষার পার্থক্য সামান্য—পাঠকের পক্ষে সহজেই তা বোধগম্য হতে পারে। কিন্তু দূর-অতীতের কাহিনীতে দূর-অতীতের বাক্-ভঙ্গি প্রয়োগ করলে পাঠকের পক্ষে তা দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে পারে—ফলে ঈপ্সিত যুগরসসৃষ্টি ব্যাহত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সংলাপরচনায় একজাতীয় নেতিবাচক প্রাচীনত্ব আরোপ করা হয়। এ জাতীয় সংলাপে কেবলমাত্র যে-শব্দ বা প্রসঙ্গগুলি একান্তভাবে সমকালীন সেগুলি

এড়িয়ে লেখক মোটামুটি তাঁর স্ব-কালের ভাষা ব্যবহার করেন। তৃতীয়ত, যে-কোন যুগের ইতিহাস নিয়ে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংলাপে সরাসরি স্ব-কালের ভাষা ব্যবহার করা হয়। তবে একথা ঠিক প্রাচীন ভাষার অজুহাতে কোন কৃত্রিম ভাষা সংলাপরচনায় ব্যবহার করা সংগত নয়। তাতে সমকালীন ভাষাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি।

আজকের দিনে সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের যুগে যখন সমস্ত দেশে একই গতানুগতিক সংস্কৃতি প্রসারিত হচ্ছে, যেখানে অধিকাংশ লোকই সংবাদপত্র পাঠ করছে, রেডিও শুনছে, নাগরিক জীবনে ব্যবহৃত কথাভাষা সমস্ত দেশেই ছাড়িয়ে পড়ছে—সেখানে শিষ্টজনের কথ্যভাষার মধ্যে খানিকটা স্বাধীনতা, বৈচিত্র্য ও সজীবতা আনার জন্য এই গতানুগতিক কথ্যভাষার বাইরে গিয়ে লেখকের পক্ষে কোনো উপভাষার দ্বারস্থ হওয়া স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। সংলাপরচনায় উপভাষার ব্যবহার প্রচলিত কথ্যভাষাকে অনেকসময় পুষ্ট ক'রে তুলতে পারে। কিন্তু সেখানেও লেখকের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। প্রথমত, উপভাষার মধ্যে কেবলমাত্র সেগুলিকেই সংলাপে ব্যবহার করা যেতে পারে যেগুলি প্রচলিত কথ্যভাষার সঙ্গে বোধগম্যতার দিক দিয়ে দূর ব্যবহিত নয়। দ্বিতীয়ত, উপভাষার শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি একান্তভাবে স্থানীয় সেগুলিকে বর্জন ক'রে উপভাষার বাক্-রীতিটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, উপভাষার নামে প্রচলিত কোন কৃত্রিম ভাষা সংলাপে ব্যবহার করা। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় পদ্ধতি, এর ফলে সমকালীন ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

উপন্যাসে সচেতনভাবে সংলাপের ব্যবহার সাম্প্রতিক কালের ব্যাপার। অবশ্য উপন্যাসে সংলাপের অপব্যবহারও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। প্রথমত, প্রায়ই দেখা যায় যে, কাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ নেই এমন অনেক রাজনীতিঘটিত বা দর্শনঘটিত সংলাপ পাত্রপাত্রীর মুখে লেখক ব্যবহার করেন, যার কারণ হয় লেখক উক্ত বিষয়ে কোন মতবাদ প্রচারে বা বিতর্কে ব্যক্তিগতভাবে অত্যধিক আগ্রহী ; বা কোন বিষয়ে জ্ঞান-দান সম্পর্কে অহমিকা-বিলাসী ; বা নিতান্তই আলস্যবশত এজাতীয় সংলাপ রচনায় ব্রতী। অপ্রাসঙ্গিক কোনো বিষয়ে সংলাপরচনার মতো সহজ আর কিছুই নেই। এ জাতীয় সংলাপে উপন্যাসের ক্ষতিই হয় সমধিক ; পাঠকের পক্ষে ব্যাপারটি বিরক্তিজনকও বটে। দ্বিতীয়ত, অনেক ঔপন্যাসিক তাঁর পাত্রপাত্রীর মুখে সংলাপের মাধ্যমে একজনকে

দিয়ে অন্যজনের বাক্-ভঙ্গির প্রশংসা করেন—এটি আসলে লেখকের আত্মস্তুতিরই নামান্তর। সংলাপ রচনার এই পদ্ধতি পাঠকের দিক দিয়ে বিরক্তিকর। তৃতীয়ত, তুচ্ছ বা অবান্তর সংলাপ উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে। এ ব্যাপারে নাট্যকার অপেক্ষা কথাসাহিত্যিকের সুবিধা অনেক বেশি। নাটকে কোনো দৃশ্যে উপস্থাপিত চরিত্রের মুখে কিছু না কিছু সংলাপ দিতেই হয়—কিন্তু উপন্যাসে কোনো চরিত্রের মুখে সংলাপ না দিলেও চলে। সুতরাং কোনো চরিত্রের মুখে তুচ্ছ বা অবান্তর সংলাপ ঔপন্যাসিক ইচ্ছা করলেই পরিহার করতে পারেন। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় নিছক উপন্যাসের কলেবর-বৃদ্ধির তাগিদে লেখক বহুক্ষেত্রে তুচ্ছ এবং অবান্তর সংলাপ রচনা করেন। লেখকের পক্ষে এ জাতীয় প্রচেষ্টা নিন্দনীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য দু একটি ক্ষেত্রে এ জাতীয় তুচ্ছ এবং অবান্তর সংলাপের কিছুটা সার্থকতা আছে। অনেক সময় ঔপন্যাসিক ব্যক্তিত্ববর্জিত ও ঘটনা-নিরপেক্ষ কিছু কিছু সংলাপ, যেমন—'আজ খুব গরম পড়েছে' ইত্যাদি কোনো চরিত্রের মুখে বসাতে পারেন—উদ্দেশ্য অন্য চরিত্রের মুখ দিয়ে চমৎকার প্রত্যুত্তর নির্গলিত করা। এরকম উদ্দেশ্য-বর্জিত তুচ্ছ এবং অবান্তর সংলাপ যথাসাধ্য পরিহার্য।

শ্যামাপ্রসাদ সরদার

সংস্কৃত কথাসাহিত্য—দ্র. প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্য।

সামাজিক উপন্যাস : উপন্যাস তার জন্মলগ্ন থেকেই সমাজ-সচেতন শিল্পকর্ম। এই অর্থে বিচার করলে সব উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস এসেছে সামাজিক উপন্যাসের পরে। নেপোলিয়নের পতন আর ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্ভব প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে ফরাসি বিপ্লব থেকে নেপোলিয়নের পতন পর্যন্ত কালখণ্ড য়ুরোপীয় জনসাধারণের কাছে ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় করে তুলেছিল। ঐতিহাসিক রস-সমন্বিত ঐতিহাসিক উপন্যাস স্বভাবতই এই প্রেরণা থেকে জন্মেছে। কিন্তু সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমন কোনো বিশেষ ঘটনাকে কালনিরূপক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। আধুনিককালে স্বাতন্ত্র্য-সচেতন ব্যক্তিমানস এবং সমাজপট পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় সর্বদাই মথিত। এর জন্য কোনো বিশেষ ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে যদি বা গণনা করা চলে, তাকেই প্রারম্ভবিন্দু

কল্পনা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্ব স্বীকৃত, সামাজিক উপন্যাসে সে ক্ষেত্রে সামাজিক ঘটনা অপেক্ষা তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া, সামাজিক সমস্যা, বা সমাজের প্যাটার্নের ও মানসিক বৃত্তের ভাঙচুর অধিক তাৎপর্য পায়। উপন্যাসের সঙ্গে সমাজগতির সম্পর্ক অতি নিবিড়। সমাজে অগ্রণী শ্রেণী হিসাবে মধ্যবিত্তের ভূমিকা যখন স্পষ্টতা লাভ করে, গদ্য প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে শক্তিশালী হতে থাকে, পাঠকসাধারণের বাস্তবাগ্রহ যখন তীব্র হয়ে ওঠে—উপন্যাস সাহিত্য তখনই উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে বিকশিত হয়।

সমাজচিত্রপ্রধান সামাজিক উপন্যাসে দুটি গুণগত শ্রেণী কল্পনা করা চলে। প্রথমটিতে ঔপন্যাসিক প্রচলিত সমাজপটের প্রতিষ্ঠাভিত্তিকে আঘাত হানেন, যেমন—থ্যাকারে। দ্বিতীয়টিতে সমাজের পূর্বস্থির মূল্যগুলির ক্ষেত্রে নতুন প্রশ্নের উদ্ভবকে লেখক যাচাই করেন, যেমন—জর্জ ইলিয়ট। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ব্যবহৃত কালখণ্ডের বৈশিষ্ট্যের ভিতর থেকে ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্বরূপকে নিষ্কাসিত করে নেয়া হয়। সুতরাং লেখকের ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিশিষ্টতায় রসেরও বিশিষ্টতা সম্পাদিত হয়। সামাজিক উপন্যাসে লেখকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতায় তাঁর চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বরূপের রূপায়ন রসগত বিশিষ্টতা লাভ করে।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫) বাংলা সামাজিক উপন্যাসের প্রথম ইঙ্গিত বহন করলেও বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রকৃত উদ্ভব ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ঐ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ধীরে ধীরে নবজাত নাগরিক মধ্যবিত্ত নতুনকালের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। এই সচেতনতার সূত্র ধরেই পরিণত হয়েছে গদ্য-মাধ্যম। নতুন কালের সংঘাত-জনিত সংক্ষোভের মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়েই জীবনের সাহচর্যে বাংলা গদ্য পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতা লাভ করল। আবার এই সংঘাতজনিত সংক্ষোভের দ্বন্দ্বকে ঘিরেই বাংলা সাহিত্য সামাজিক উপন্যাসের প্রথম পদক্ষেপে চিহ্নিত হলো। 'আলালের ঘরে দুলাল' (১৮৫৮), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'সংসার' (১৮৮৬), অথবা 'সমাজ' (১৮৯৪) এই কয়টি উপন্যাসের মধ্যে থীম্ অথবা রসসার্থকতার যে তারতম্যই থাক না কেন, চারটি উপন্যাসেই কমবেশি ক'রে সমাজের স্থিতি ও গতি সংক্রান্ত দ্বন্দ্বকে উপলব্ধির প্রয়াস রয়েছে। এই দ্বন্দ্বকে উপলব্ধির চেষ্টা না থাকলে যে ধরনের পারিবারিক উপন্যাস সৃষ্ট হয় তার নিদর্শন 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪)। আবার

এই দ্বন্দ্বকে অবহিত হয়ে যে পারিবারিক উপন্যাস সৃষ্ট হয় তার শৈল্পিক সার্থকতার নিদর্শন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)।

এই সূত্রে বাংলা সামাজিক নাটকের সঙ্গে ঐ সময়ের বাংলা সামাজিক উপন্যাসের পার্থক্যটিও অনুধাবনীয়। সামাজিক স্থিতি ও গতির দ্বন্দ্বের সার্থক প্রতিকৃতি বাংলা সামাজিক নাটকে প্রতিফলিত হয়নি। কারণ বাংলা দেশে নবকালের আলোড়ন শেষপর্যন্ত মানসিক স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে—প্রত্যক্ষ বাস্তবমূর্তি পরিগ্রহ করেনি। বিধবাবিবাহ বিধিসঙ্গত হওয়া উচিত কিনা এটা বিক্ষুব্ধ সামাজিক বিতর্কের বিষয় হয়েছিল বটে, কিন্তু বিধবাবিবাহ বাস্তবার্থে কোনো ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি করেনি। যেখানে প্রত্যক্ষতা ছিল স্তিমিত, অথচ নবকালের আলোড়নকে সমগ্রভাবে শৈল্পিক স্তরে উপলব্ধির প্রশ্নটা ছিল মুখ্য সেখানে স্বভাবত উপন্যাসই উপযুক্ততর মাধ্যম বলে বিবেচিত হয়েছে। যখন বাঙালি মধ্যবিত্ত নবজাগরণের প্রথম তরঙ্গে বিদ্রোহের বন্যাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তখন নাটকের প্রথম সুযোগের সদ্ব্যবহার নানা কারণে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর, যখন বিদ্রোহের প্রথম বন্যাবেগ মন্দীভূত হবার পর সমগ্রকে অনাসক্ত অনুধাবনের প্রশ্নটি বড় হলো তখন অনিবার্যভাবে উপন্যাসেরই ডাক পড়ল। প্রথম পর্যায়ের সামাজিক উপন্যাসে এই চেতনা সক্রিয়।

সমাজদৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে এই সময়ে ব্যঙ্গরসপ্রধান বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাব হলো। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কল্পতরু' (১৮৭৪) এবং যোগেন্দ্র-চন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সমাজের গতিছন্দের সঙ্গে কথাসাহিত্যের সম্পর্কের নিবিড়তার তুলনা দিতে গিয়ে কোনো বিদেশি সমালোচক হাত এবং দস্তানার সম্পর্কের কথা তুলেছেন। সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ তুলনা অধিকতর প্রযোজ্য। বাংলা সামাজিক উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায় সম্বন্ধে সমাজচেতনার পরিধি বিস্তারের কথা অবশ্যই ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' (১৯১০) এবং শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' (১৯.২) বাংলা সামাজিক উপন্যাসের দ্বিতীয় যুগের বিশিষ্ট নিদর্শন। এর আগে পর্যন্ত সামাজিক উপন্যাসে নবকালজনিত গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্বে মধ্যবিত্ত-প্রতিক্রিয়াই প্রধান বিষয় ছিল। 'গোরা' থেকে বাংলা উপন্যাস বৃহত্তর সামাজিক চেতনার ব্যাপকতা লাভ করল। জাতীয় চেতনার বিস্তৃতি এবং জাতীয় আন্দোলনের

প্রথম উদ্যোগের মধ্যে ছিল এই সামাজিক চেতনার প্রেরণা। ইংরেজ শাসকের অনাত্মীয় ঔদাসীন্যে ও কালবৈগুণ্যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পতনের সমগ্র স্বরূপ অঙ্কন, সংকটের মূল নির্দেশ এই পর্যায়ের উপন্যাসের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। পুরুষার্থের নব তাৎপর্যসন্ধানী চরিত্র-পরিকল্পনায় নায়কের দ্বন্দ্বের নতুন প্রকৃতি কল্পিত হলো। একদিকে বিচ্ছিন্নতাকে জয় করার চেষ্টা অন্যদিকে দুর্বার প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রামের ভিতরে এ যুগের মধ্যবিত্ত নায়ক এক নতুন আয়তন পেয়েছে। অন্যদিকে প্রেমের সামাজিক সমর্থনের বিষয়টিকেও লেখকেরা পৃথক দৃষ্টিতে পুনর্বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে এর সূত্রপাত হলেও শরৎচন্দ্রই এই পুনর্বিচারের প্রশ্ন বিশেষভাবে উত্থাপন করেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪) প্রভৃতি উপন্যাসে পূর্বোক্ত বৃহত্তর সমাজদৃষ্টির উত্তরাধিকার বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামসমাজের অর্থনৈতিক বিন্যাসকে ও তার রূপান্তরকে তিনি উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে বনফুল 'জঙ্গম' উপন্যাসটির ভিতরে সমকালীন বাঙালি নাগরিক সমাজের পূর্ণাবয়ব অঙ্কনের চেষ্টা করেন। বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক থেকেই মার্ক্সবাদ অল্পবিস্তর বাংলা উপন্যাসে ও গল্পে প্রভাবসম্পাত করে। শ্রেণী-সংগ্রাম নিয়ে কোনো উপন্যাস লেখা না হলেও শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতমূলক বেশ কিছু উপন্যাস লিখিত হয়েছে। তারাশঙ্করের 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩১) ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলি' (১৯৪০) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের কালে বাংলা সামাজিক উপন্যাসের তৃতীয় যুগের সূচনা, পরবর্তী সময়ে তার বিকাশ। এই সময়ের নিদারুণ আঘাতে মধ্যবিত্ত তার গৌরবময় উজ্জ্বলতা হারাল। তার এতদিনের নীতিবোধ, মূল্যমান নিষ্ঠুর জটিলতায় অদৃশ্য হতে থাকল। হারিয়ে গেল তার উচ্চাভিলাষ। মধ্যবিত্তের বিপন্নতাই তখন উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠল। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তরে' এর ক্ষীণ সূচনা, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠান' এবং সন্তোষকুমার ঘোষের 'মোমের পুতুলে' এই বিপন্নতার বিষয়টি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজের উদাসীন শীতলতা, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব, বিপন্নতা ও উদ্বেগই অতঃপর বাংলা সামাজিক উপন্যাসের এক অংশে প্রবল হয়ে উঠেছে।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতিচারণা—দ্র, নেপথ্যবিধান।

হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস : "রূপকথার রাজকন্যার নাকি হাসিতে মানিক আর কান্নায় মুক্তা ঝরিয়া পড়িত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ভাবরূপে হাসি ও কান্নার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, মূল্যের দিক দিয়া তাহাদের সেরূপ কোন দুস্তর ব্যবধান ছিল না।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) উপন্যাসেও দেখি হাসি-কান্নার গঙ্গা-যমুনা মিলেমিশে অবস্থান করে। নিছক হাস্যরস পরিবেশনের জন্য উপন্যাস কমই লেখা হয়েছে,—এমনকি হাস্যরস স্থষ্টির জন্য যাঁরা খ্যাতিমান, যেমন ফিল্ডিং এবং ডিকেন্স, তাঁরাও নক্শা জাতীয় রচনা ছাড়া পুরোপুরি হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস লেখেননি। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্র-নাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কমিক চরিত্র আছে, বিচ্ছিন্নভাবে হাস্যরসপূর্ণ দৃশ্য আছে, কিন্তু উপন্যাসে হাস্যরস কখনও প্রাধান্য পায়নি। তুলনায় গৌণ লেখকেরা হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস লিখেছেন, যা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের গৌরব দাবি করে না। আসলে হাস্যরস স্থষ্টি হয় বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলে, যাকে আমরা তির্যক-দৃষ্টি বলতে পারি। হাস্যরসের এক প্রান্তে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার, আর এক প্রান্তে প্রচ্ছন্ন অশ্রু—মাঝে অনাবিল কৌতুকের শুভ্রতা। যথার্থ হাস্যরসিক আনন্দ-বিষাদের মিশ্রণে একই অঙ্গে স্বভাবাশ্রয়ী এবং স্বভাবাতিরিক্ত এক জগৎ নির্মাণে সক্ষম।

ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার অসংগতি, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের অসংগতি, কথার সঙ্গে কার্যের অসংগতি—কৌতুকহাস্যের জন্ম দেয়। তবে এখানে একটা মাত্রাভেদের প্রশ্ন আছে—"অসংগতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়।" (রবীন্দ্রনাথ)। অন্যদিকে কৌতুক-হাস্যের প্রকারভেদও অনেক রকম। আমোদের হাসি আর কৌতুকের হাসির মধ্যে পার্থক্য আছে। গজপতি দিগগজ (দুর্গেশনন্দিনী) আর মানিকলাল (রাজসিংহ), গিরিজায়া (মৃণালিনী) আর ইন্দিরা—সবগুলি চরিত্রের মধ্যে হাসির উপাদান থাকলেও তার প্রকাশ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র।

হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস-রচয়িতার মধ্যে দেখা যায় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, কৌতুক স্থষ্টির পিছনে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আস্তিক্যবোধ ও এক-ধরনের গভীর গম্ভীর জীবনদৃষ্টি, শিল্পের প্রয়োজনে অতিরঞ্জনের আশ্রয়

নেওয়া সত্ত্বেও শিল্পীসুলভ সংযমবোধ, এবং সংকেতময়তা তথা ব্যঞ্জনাসৃষ্টির ক্ষমতা। তবে সুপরিকল্পিত কাহিনীবৃত্তে আগাগোড়া হাস্যরসের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ নয়। হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস তাই নকশাধর্মী রচনা—সেখানে বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমাবেশ—স্বতন্ত্রভাবে দৃশ্যগুলি উপভোগ্য, কিন্তু তাদের মধ্যে যোগসূত্র অল্প। অন্যদিকে হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসে চরিত্রগুলি অধিকাংশ সময়ই সমতলসদৃশ (flat character)—চরিত্রের একটিমাত্র দিকই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়—ফলে চরিত্রকে কখনও পূর্ণায়ত রক্তমাংসের নরনারী মনে হয় না। তবে মুরারি শীল বা ভাঁড়ু দত্তের সঙ্গে পানুবাবু (গোরা) বা নরেন মিটার (শেষের কবিতা) চরিত্রের পার্থক্য আছে। মধ্যযুগে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে 'টাইপ' চরিত্র অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছে, অধুনা সেই একই প্রয়োজন সিদ্ধ করছে 'ইণ্ডিভিজুয়াল টাইপ'। অলডাস হাক্সলির উপন্যাসের চরিত্রের কথা মনে পড়বে। তবে উপন্যাসের চরিত্র আর কমিক চরিত্র এক নয়। হাস্যরসপ্রধান উপন্যাস রচয়িতার ঝোঁক কমিক চরিত্রের দিকে। আর এইখানেই হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ছিল মূলত স্থূলতা বা ভাঁড়ামি মাত্র। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদসাহিত্যে অধিকাংশ সময়েই হাস্যরস শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মধ্যযুগে ষোড়শ শতকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী এবং অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র যথার্থ হাস্যরস সৃষ্টিতে সমর্থ হন বললে অত্যুক্তি হবে না। উনিশ শতকে বাংলাসাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র এবং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র হিউমার জাতীয় হাস্যরসের প্রবর্তক। উনিশ শতক অবশ্য মধ্যযুগীয় হাস্যরসের স্থূলতাকে সর্বাংশে অতিক্রম করতে পারেনি। দীনবন্ধুর পরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তরে' উৎকৃষ্ট হাস্যরসের নিদর্শন রাখলেন। উনিশ ও বিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের হাতে বাংলা সাহিত্যের সার্বিক সমৃদ্ধি ঘটে। তাঁদের সৃষ্ট চরিত্র, বিশ্লেষণী মন্তব্য প্রভৃতিতে রসরসিকতার পরিচয় পাওয়া গেলেও হাস্যরসাত্মক উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, সে ধরনের কোন উপন্যাস তাঁরা রচনা করেননি।* কিন্তু বর্তমানে আমাদের আলোচ্য হাস্যরসাত্মক

* এই ধরনের উপন্যাসে লেখক সমাজের বা জীবনের কোন অসংগতি নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেন। নেপথ্যে সমাজসংস্কারের ভূমিকাও থাকে।

উপন্যাস। এই শ্রেণীর রচনায় প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ)। রহস্যরসিকতা ছিল তাঁর মজ্জাগত। তাঁর হাস্যরসাত্মক উপন্যাসের মধ্যে 'কল্পতরু' (১৮৭৪), 'ক্ষুদিরাম' উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা প্রশংসিত 'কল্পতরু' প্রথম ব্যঙ্গমূলক উপন্যাসরূপে অভিনন্দিত। অবশ্য উপন্যাস হিসাবে খুব একটা সার্থক নয়। এখানকার যে রসিকতা তার সঙ্গে যেন উপন্যাসের কাহিনীর যোগ নেই। এবং উপন্যাসের অগ্রগতিতেও বাধা সৃষ্টিকারী। অবান্তর মন্তব্য আমাদের হাসির খোরাক যোগায়; কিন্তু উপন্যাসের সৌন্দর্য ও সার্থকতার পথে তারা বারেবারেই বাধা সৃষ্টি করেছে। অবশ্য চরিত্র রচনা ও বর্ণনাকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে লেখকের মন্তব্য ব্যঙ্গের তীব্রতা কাটিয়ে সহৃদয় রসিকতার সামিল হয়েছে। তাঁর 'ক্ষুদিরাম' উপন্যাসে কিছুটা পরিণত মানসিকতার ছাপ রয়েছে। এটিকে উপন্যাস না বলে লেখকের মত অনুযায়ী 'গালগল্প' বলাই ভালো। ঘটনা সন্নিবেশের আকস্মিকতা, স্থূল রসিকতার বাড়াবাড়ি, উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠতার অভাব এই গ্রন্থটির আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করেছে। ব্রাহ্মধর্ম এবং ঐ ধর্ম প্রবর্তিত নানা প্রগতিমূলক আন্দোলনকে যেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে লিখিত।

ইন্দ্রনাথের সুযোগ্য শিষ্য যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। তিনি রচনাশক্তিতে মাঝে মাঝে ইন্দ্রনাথের কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মূলত শিক্ষিত প্রগতি-বাদী সমাজ-সংস্কারক ও স্বদেশহিতৈষী পুরুষ ও নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে। তাঁর সৃষ্ট 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৫), 'কালাচাঁদ' (১৮৮৯-৯০), 'চিনিবাস চরিতামৃত' (১৮৮৬), 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' (১৯০২), 'নেড়া হরিদাস' বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর সৃষ্ট ব্যঙ্গ ঘটনাগত নয়, চরিত্রগত। অতিরঞ্জন তাঁর হাস্যরসের একটি উৎস। এবং ত্রুটিও বটে। তুচ্ছ বিষয়কে গুরুতর ভাষার প্রলেপ দিয়ে এবং লঘু ও হীন চরিত্রকে ছদ্মগম্ভীর বা mock heroic রীতিতে বর্ণনা করে তিনি হাস্যরস সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর 'মডেল ভগিনী' ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হুল ফুটিয়েছিল, তা তদানীন্তন সময়ে তুমুল বিক্ষোভ ও আন্দোলন সৃষ্টি করে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাঝে উপন্যাসের লক্ষণ বহু জায়গাতেই বিপর্যস্ত হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতের অনুকরণে 'চিনিবাস চরিতামৃত' নামকরণ করে লেখক ব্যাজস্তুতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সামান্য-তম অবস্থা থেকে চিনিবাসের অভাবনীয় উন্নতি ও রাজা উপাধি প্রাপ্তির

কৌতুককর কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত'-কে মনে করিয়ে দেয়। বইটিতে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি লেখক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সোচ্চার হয়েছেন। 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' উপন্যাসে খাঁটি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্রতা অন্যান্য উপাদানের সংযোজনের জন্য কিছুটা কম মনে হয়। নানাবিধ রস সঞ্চারের জন্য এর আখ্যায়িকা কিছুটা আকর্ষণীয়। 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'র মতো বিপুলায়তন উপন্যাস অনেক সময়েই পাঠকের ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও দেশপ্রীতিমূলক যে সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে তার পরিধির মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম ভালো। ধর্মের ভণ্ডামি বা অন্ধবিশ্বাস ভালো নয়—এই দিকেও যোগেন্দ্রচন্দ্র যথেষ্ট দৃষ্টি দিয়েছেন। ফলে 'মডেল ভগিনী' জাতীয় গ্রন্থ তৎকালীন সময়ে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ করেছে।

হাস্যরসের উপস্থাপনায় ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা সাহিত্যে এক সর্বজনস্বীকৃত নাম। যদিও আজ তাঁর প্রবর্তিত ধারা বিলুপ্তপ্রায়। উদ্ভট কাহিনী, কিম্ভূত, অদ্ভুত, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের সংযোগ সাধনে তিনি এক বিচিত্র কৌতুক রসের সন্ধান দিয়েছেন। রূপকথার কল্পনাকে মিশিয়ে দিয়েছেন বাস্তব জীবনের সঙ্গে। হাস্যরসাত্মক উপন্যাসের ধারায় তাঁর 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) এক অভিনব সংযোজন—একাধারে উপন্যাস, রূপকথা ও ব্যঙ্গ রচনা। 'কঙ্কাবতী' আমাদের সঙ্গে এক অসাধারণ শিল্পীর সাক্ষাৎ ঘটায়। 'কঙ্কাবতী'র দুটি খণ্ড বলা যায়। —(১) গার্হস্থ্যজীবনীমূলক। (২) অবাস্তব কল্পনাশ্রিত। ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক আক্রোশ ছাড়াও যে নির্দোষ ব্যঙ্গ রচনা করা যায়, কিংবা স্নিগ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করা সম্ভব, 'কঙ্কাবতী' তারই স্বাক্ষর। শুধু ত্রৈলোক্যসাহিত্যে নয় বাংলা সাহিত্যে 'কঙ্কাবতী' বিশিষ্টতার দাবি রাখে। 'কঙ্কাবতী'র মধ্যেই তাঁর পরবর্তী নব রচনার বীজ নিহিত। শিশুসাহিত্যের আজবরাজ্যের গোড়াপত্তনেও কঙ্কাবতীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ত্রৈলোক্যনাথের অবলম্বন সাধুভাষা। সংলাপের ভাষাও সাধু। তৎসত্ত্বেও কোথাও বক্তব্যের সরসতা বা লঘুতা একতিলও কমেনি। 'কঙ্কাবতী'তে লেখকের নীতিবাদী মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে মানবধর্মী ছিলেন তারও প্রকাশ ঘটেছে কঙ্কাবতীতে।

তাঁর 'ফোকলা দিগম্বর' (১৯০০), 'মুক্তামালা' (১৯০১), 'ডমরুচরিত' (১৯২৩)

হাস্যরসমূলক রচনাধারায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উদ্ভট কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তিনি যে চরিত্র বিকাশ ঘটিয়েছেন তা আমাদের চমৎকৃত করে। বিশেষ করে 'ডমরুধর' চরিত্র, যা পৃথিবীর ব্যঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি। সমস্ত অন্যায়, নীচতা, স্বার্থপরতা সত্ত্বেও তার নিঃসংকোচ সত্যভাষণ যা নিজের সম্পর্কে উচ্চারিত তা আমাদের সহানুভূতি আদায় করে নেয়।

ডমরুধর চরিত্র লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতীক। ডমরুধর কবিকঙ্কণের ভাঁড়ু দত্তের উত্তরপুরুষ। সে অপমানে লাঞ্ছনায় নির্বিকার, স্বার্থসাধনে তৎপর, আত্মবিশ্বাসে বলিষ্ঠ। সে জগতের কাউকে ভয় করে না। শুধুমাত্র স্ত্রী এলোকেশীকেই তার যত ভয়। আর এখানেই কাহিনীর উপভোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাকে মানবিক স্তরেও নামিয়ে এনেছে।

তাঁর 'ফোকলা দিগম্বর' 'ডমরু চরিত'-এর অনেক আগের রচনা। এই একমাত্র উপন্যাস যেখানে লেখক কোন নৈতিক উপদেশ দেননি। পাপ ও পরিণামের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণেও সচেষ্ট হননি। প্রণয় ও কৌতুকের সামঞ্জস্যে গঠিত এটি একটি সুন্দর ঝরঝরে রচনা।

ত্রৈলোক্যনাথ উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস-আলোকিত মনের যথার্থ দাবিদার ছিলেন। শুধু রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের জন্য নয়, সমস্ত জাতির নৈতিকমান গঠনে তাঁর শিক্ষা এখনও সমান উপযোগী। তিনি সবরকম ভণ্ডামি, অন্যায়, অবিচার দূর করতে চেয়েছেন। সর্বত্রই তাঁর মানবতাবাদীমনের স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষণীয়।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে আর একজনের নাম অবধারিত—পরশুরাম বা রাজশেখর বসু। দুজনের মধ্যে এক আশ্চর্য মিলও লক্ষ্য করা যায়। শ্রেষ্ঠ হাস্যরসস্রষ্টাদের মধ্যে তাঁরা দুজনেই শীর্ষস্থানীয়। তবে ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ অশ্রু-ঘেঁষা আর পরশুরামের তিরস্কার-ঘেঁষা। একজন হৃদয় দিয়ে আর একজন যুক্তি দিয়ে সংসারকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে রাজশেখর বসুর বিশেষ আলোচনার অবকাশ নেই। কারণ হাস্যরসাত্মক উপন্যাসে তাঁর উপস্থিতি আমাদের দৃষ্টির বাইরে।

উপন্যাসক্ষেত্রে হাস্যরসের উপস্থাপনায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই স্মরণীয়। উপন্যাসে হাস্যরসিকদের মধ্যে বোধহয় তাঁর স্থানই সর্বোচ্চে। তাঁর রচনায় একটি ঘরোয়া বৈঠকী দিলদরিয়া মেজাজ অনুভব করা যায়। কৌতুক ও কারুণ্যের অপূর্ব মিশ্রণে তিনি জলভরা মেঘের উপর সাতরঙা ইন্দ্রধনুর এক

বিচিত্র আলোকসম্পাত ঘটিয়েছেন। হাসির প্রবাহে এক বিষাদ বেদনার ঝংকার তাঁর রচনার বিশিষ্ট সম্পদ। 'শেষ খেয়া' (১৯২৫), 'ভাদুড়ী মশাই' (১৯৩১), 'আই হ্যাজ' (১৯৩৫), 'কোষ্ঠীর ফলাফল' (১৯৪৫) হাস্যরসাত্মক উপন্যাস হিসাবে উল্লেখ্য। এদের মধ্যে 'ভাদুড়ী মশাই' ও 'কোষ্ঠীর ফলাফল' তাঁর প্রতিভার বিশিষ্টতায় বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁর উপন্যাসে হাস্যরসের সঙ্গে চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সুসংগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কোথাও কোথাও গ্রাম্যতা দোষ থাকলেও হাস্যরসের প্রবল উচ্ছ্বাসে তা ভেসে গেছে। হাসি ও কারুণ্যের অদ্ভুত সমাবেশে 'কোষ্ঠীর ফলাফল' এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এটি তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নামে উপন্যাস হলেও পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের লক্ষণ এগুলোর মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। আকারে বড় হলেও এরা ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত। episodic,—বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে উপন্যাস পরিণতি লাভ করেছে। কোথাও কোথাও ইংরেজি ও হিন্দি শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার ও উচ্চারণ-বিকৃতির মধ্যে দিয়ে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় হাস্যরসকে সাহিত্যের যথার্থ উচ্চতর মার্গে স্থাপন করেন। কাহিনী গ্রন্থনার নৈপুণ্য, রঙ্গব্যঙ্গপূর্ণ পরিবেশসৃষ্টির দক্ষতা এবং কৌতুকরসের প্রাচুর্যে তার 'রাণু' ও বাজেশিবপুরের গণেশ-ঘোঁৎনার দলটিকে ভোলা অসম্ভব। তাঁর হাস্যরস গল্পের সীমানা ছাড়িয়ে উপন্যাসকেও ঋদ্ধ করেছে। এই প্রসঙ্গে 'পোমুর চিঠি' (১৩৬১), 'কাঞ্চনমূল্য' (১৩৬৩) গ্রন্থ দুটি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এদের যথাযথ উপন্যাস বলা না গেলেও উপন্যাসধর্মী রচনা হিসাবে হাস্যরসাত্মক রচনার ধারায় বিশেষ স্মরণযোগ্য।

সাম্প্রতিককালে হাস্যরসাত্মক সৃজনকর্মে বিরূপাক্ষ বা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং কুমারেশ ঘোষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও হাস্যরসিক উপন্যাসশিল্পী হিসাবে তাঁরা নিজেদের পরিচিত করতে পারেননি।

হাস্যরসসৃষ্টিতে শিবরাম চক্রবর্তী অবশ্যই এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' হাস্যরসপ্রধান উপন্যাসের ভালো দৃষ্টান্ত। পরিমল গোস্বামীর 'দুই রহস্য —দুই শহরের' বইতে দুটি হাস্যরসপ্রধান রহস্য উপন্যাস পাওয়া যায়। কৌতুকের বাতাবরণ সৃষ্টিতে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ইদানীংকালের এক আকর্ষণীয় নাম। তবে যুগের প্রয়োজনে সব কিছুর যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনি উপন্যাসের রূপ ও স্বরূপেও পরিবর্তন ঘটেছে। তাই সঞ্জীবের হাস্যরসের মধ্যে একটা জ্বালাও

অনুভব করা যায়। কী হওয়া উচিত আর কিসের ভান আমরা করছি—কিংবা আমরা কোথায় চলেছি আর কিভাবে চলেছি এই আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে, হাস্যরসের উৎস বারেবারেই তাঁর লেখনীতে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিংশ শতাব্দীর এই অন্তিম লগ্নে শ্রান্ত-ক্লান্ত-ক্ষতবিক্ষত ও জটিল আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতায় হাস্যরসের অভাব বড়ো বেশি চোখে পড়ে। এই শতাব্দীর শক্তিশালী লেখক সঞ্জীবের উপন্যাসপাঠকরা জানেন যে তাঁর হাস্যরসের মধ্যে এক গভীর বিষণ্ণতা লুকিয়ে আছে। সঞ্জীবের হাস্যরসাত্মক উপন্যাস তাই আমাদের হাসায়, কাঁদায়, ভাবায়।

বর্তমানে হাস্যরসাত্মক উপন্যাসের অভাবে উপন্যাস-কৃতির এক ভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি হতে চলেছে। ব্যঙ্গের জন্য, হাস্যকৌতুক সৃষ্টির জন্য যে অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন তার আজ একান্ত অভাব। জীবন ও জীবিকার দাবী মেটাতে মেটাতেই আমরা ক্লান্ত। হাস্যরসসৃষ্টির অবকাশ কোথায়?

মানু জানা

—